বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব

(১৯০১—১৯৫০)

অদীপ কুমার ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ-ডি (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব
(১৯০১—১৯৫০)

অদীপ কুমার ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ-ডি (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৯৬

মূল্য—৭৫·০০ টাকা

ভারতে মুদ্রিত
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ কর্তৃক
৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা—৭০০০১৯ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

॥ নিবেদন ॥

বিশ শতকের প্রথম ভাগের বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব নিরূপণ এই অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়।

গবেষণা-সন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে, লোকসমাজের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে লোকঐতিহ্যের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছি। প্রসঙ্গত লোকসমাজের সঙ্গে নগর সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নির্দেশ করেছি। সাহিত্যে লোকঐতিহ্যের অনিবার্য প্রভাব যে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ, তার সমর্থনে বিশ্বসাহিত্যে লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলনের কয়েকটি নিদর্শনও বিশ্লেষণ সহযোগে উপস্থিত করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ব-বিশ শতকীয় অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগ এবং উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতায় প্রতিবিম্বিত লোকঐতিহ্যের বহু বিচিত্র উপাদান-উপকরণ উল্লিখিত ও বিশ্লেষিত। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই এ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেছি। প্রাসঙ্গিকতা সূত্রে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্র-কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রেরণার বৈচিত্র্য ও বিপুলতাও এ অধ্যায়ে নির্দেশিত।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ শতকের প্রথম ভাগের বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলনের পটভূমি এবং প্রভাবসূত্র নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছি। এ সময়ের বিশিষ্ট কবিদের জীবন ও কাব্যচর্চা লোক-ঐতিহ্যের দ্বারা কতখানি নিয়ন্ত্রিত তাও দেখিয়েছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে, তৃতীয় অধ্যায়ে নির্দেশিত সূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এ কালপর্বে প্রকাশিত আলোচিত কবিগণের কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রেরণার ব্যাপকতা এ অধ্যায়ে প্রদর্শিত।

পঞ্চম অধ্যায়টি উপসংহার। বিশ শতকের প্রথম পর্বের কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্য সংশ্লেষের সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক পর্যালোচনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ব-বিশ শতকীয় কাব্য-কবিতার উদ্ধৃত চয়নে মোটামুটি কবিদের অনুসৃত বানান রীতিই রক্ষিত। অন্যত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান রীতি যথাসম্ভব অনুসৃত।

এই গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, জীবনের নানা ক্ষেত্রে যাঁর অভিভাবকত্ব আমার পরম প্রাপ্তি---সেই অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক ডঃ মানস মজুমদারকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান দিয়ে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ও ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক আমাকে তাঁদের কাছে চিরঋণী করে ফেলেছেন। এই অবসরে তাঁদের উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম করি।

প্রতিটি কর্মের নেপথ্যে একটা শক্তি সক্রিয় থাকে। এই গবেষণা-কর্ম সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে, অন্তরালে থেকে আমার জনক-জননী-জায়া-অগ্রজা এবং শ্রীমতী সুপ্রভা মজুমদার সেই শক্তি নিরন্তর জুগিয়েছেন। এই অনুপ্রেরণা লাভ প্রত্যেকেরই ঈর্ষণীয় বলে মনে করি। এছাড়া, আমার পূর্বতন কর্মস্থল মাথাভাঙ্গা কলেজের সহকর্মীদের শুভেচ্ছা ও উৎসাহদানের কথা অস্বীকারের উপায় নেই।

পরিশেষে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই অভিসন্দর্ভটি মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে যে সম্মান রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার দায়বদ্ধতা মুক্তকন্ঠে স্বীকার করছি।

বসিরহাট কলেজ
১৯।৩।৯৬

অদীপ ঘোষ

॥ বিষয় সূচী ॥

॥ নিবেদন ॥

প্রথম অধ্যায়

লোকঐতিহ্য ও সাহিত্য

ভূমিকা ঃ

বাংলা 'লোক' শব্দটির প্রচলিত অর্থ 'মানুষ' বা 'ব্যক্তি'[১]। 'জন-সাধারণ' অর্থেও 'লোক' শব্দের ব্যবহার অভিধানসম্মত[২]। কিন্তু বর্তমানে 'Folklore' বিদ্যার কল্যাণে 'লোক' শব্দটির অর্থ প্রসারিত। এই বিশেষ বিদ্যাটির আলোচনায় 'লোক' শব্দে ব্যক্তি-বিশেষকে বোঝায় না, বোঝায় সমজীবন-চর্যায় অভ্যস্ত অক্ষরজ্ঞানহীন বা স্বল্পাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন গোষ্ঠী-বদ্ধ মানুষকে। এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষজনের জীবন-চর্যার চলমান সুদীর্ঘ ইতিহাস আশ্রয়ে রচিত বিদ্যাই 'Folklore' নামে অভিহিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইংরাজী 'Folk' শব্দটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ অর্থ-প্রসারণ লক্ষণীয়। সাধারণত ইংরাজীতে 'Folk' শব্দটির অর্থ 'People'[৩]; কিন্তু London এর 'The Athenaeum' পত্রিকার ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট সংখ্যায় Ambrose Morton ছদ্মনামে William J. Thoms-এর লেখা একটি চিঠিতে 'Folk' শব্দটির অর্থান্তর ঘটলো। 'Folk' বলতে 'Thoms' অক্ষরজ্ঞানহীন কৃষক-সমাজকে বুঝিয়ে-ছিলেন। কালক্রমে নানা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে 'Folk' বলতে 'Folk-lore' বিদ্যায় আজ অক্ষরজ্ঞানহীন বা স্বল্পাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সংহত জন-গোষ্ঠীর মানুষকে বোঝায়।

এই গোষ্ঠীবদ্ধ সমজীবন-চর্চায় অভ্যস্ত লোকসাধারণকে নিয়েই লোক-সমাজ গঠিত। সাধারণ অর্থে, সমাজ বলতে যা বোঝায়, লোকসমাজের সঙ্গে তার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু গঠনগত দিক থেকে উভয় সমাজের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

সমাজ কি—এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, 'Society is a system of wages and procedures of authority mutual aid of many groupings and divisions, of controls, of human behaviour and of liberties. This ever-changing complex system we call Society.'[৪] লোকসমাজ সম্বন্ধেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য। তবে লোকসমাজের অন্যতম প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য সাধারণত অন্য কোন সমাজে দেখা যায় না।

সেগুলি হল,-প্রথমত, লোকসমাজ অক্ষরজ্ঞানহীন বা স্বল্পাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের নিয়েই গঠিত। দ্বিতীয়ত, এই সমাজের মানুষেরা সমধর্মী জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে এক অতি সুসংহত জনগোষ্ঠীরূপে প্রতিভাত হয়। এদিক থেকে আদিম সমাজের সঙ্গে লোকসমাজের সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। এই সংহতির জন্যই নগরসমাজের উদ্ভব ও বিপুল সমৃদ্ধি সত্ত্বেও লোকসমাজ তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজও টিকিয়ে রেখেছে। লোকসমাজের উদ্ভব আদৌ অর্বাচীন কালের ঘটনা নয়। বিশ্বের যে কোন লোকসমাজ সম্বন্ধে এ কথা খাটে। প্রকৃতপক্ষে, লোকসমাজের গর্ভেই নাগরিক সমাজের জন্ম। উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি এবং শ্রম বিভাজন মানব সমাজে 'শ্রেণী' সৃষ্টি করে অনিবার্য ভাবে নগরসমাজের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই সামাজিক পরিবর্তন, বিশেষ কোনো একদিনের ঘটনা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আদিম মানব-সমাজের এই বিভাজন ঘটেছে। সুতরাং লোকসমাজের একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বিদ্যমান, যার অমোঘ প্রভাব লোকসাধারণের দৈনন্দিন জীবনাচরণে পরিলক্ষিত হয়।

লোক-ঐতিহ্য ঃ

ইংরাজী 'Tradition' শব্দটির বাংলা ভাষায় গৃহীত অর্থ—'ঐতিহ্য' [সং-ইতিহ+(য) (স্বার্থে)]।[৫] Tradition শব্দটির মূল অর্থ 'Hand-over'[৬] অর্থাৎ 'হস্তান্তর'। সেদিক থেকে বলা যায়, সামগ্রিক জীবনাচরণের সার্বিক ক্রমপরম্পরাগত সমন্বিত রূপটিই ঐতিহ্য। 'Tradition'-কে 'অতীতের বিরাট ভাবসম্পদ' বলে T. S. Eliot মনে করতেন।[৭] তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঐতিহ্য শুধুমাত্র অতীত-সর্বস্ব নয়। 'Temporal' ও 'Timeless'[৮]-এর সমন্বয়ে ঐতিহ্যের সৃষ্টি।

তাই ঐতিহ্যে মানুষের জীবনাচরণের পূর্ণায়ত রূপটি বিধৃত—'........ Tradition involves all those habitual action, habits, and customs from the most significant religious rites to our conventional way of greeting a stranger, which represent the blood kinship of the same people living in the same place.'[৯]

সুতরাং সমাজস্থিত মানুষের সামগ্রিক জীবন-চর্যার সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির নিরন্তর স্রোতোধারায় ঐতিহ্যের স্থান অপরিহার্য। তা অতীতে আহৃত অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের সূত্রে ঐতিহ্য নানাবিধ সংযোজন ও বিয়োজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমানের

উপযোগী হয়ে ওঠে। এভাবে দেশ, সমাজ বা জনগোষ্ঠীর মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের পুরুষানুক্রমিক অপরিহার্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্যে বিধৃত।

লোকসমাজ সম্বন্ধেও এ সত্য প্রযোজ্য। লোকসমাজ প্রাকৃতিক নিয়মেই গতিশীল। তাই তার ঐতিহ্যও গতিময়। আপাতদৃষ্টিতে তাকে স্থবির মনে হলেও, নিত্য চলিষ্ণুতাই তার প্রাণধর্ম।

লোকঐতিহ্য বা 'Folk Tradition' ও 'Folklore' সমার্থক, কিনা তা নিয়ে লোকতত্ত্ববিদ মহলে মতান্তরের অন্ত নেই। এ কারণে আজ পর্যন্ত 'Folklore'-এর সর্বসম্মত বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণীত হয়নি। পাশ্চাত্যে 'Folklore' বলতে কিন্তু অধিকাংশ লোকতত্ত্ববিদ লোকসাধারণের সামগ্রিক জীবন-চর্যার সৃষ্টিশীল সমস্ত দিকই গ্রহণ করেছেন।

'Folklore'-এর সঠিক বাংলা অনুবাদ হল, 'সৃষ্টিশীল লোকবিদ্যা'। আমরা এই 'সৃষ্টিশীল লোকবিদ্যা'কেই প্রসারিত অর্থে 'লোকঐতিহ্য' রূপে গ্রহণ করেছি। সুতরাং লোকঐতিহ্যের স্বরূপ পরিস্ফুটনে লোক-তত্ত্ববিদদের 'Folklore' সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য স্মরণযোগ্য,—

(১) 'Folklore is the accumulated knowledge of a homogenious unsophisticated people',[১০] লক্ষণীয়, Folklore-এর উদ্ধৃত সংজ্ঞাটিতে লোকসাধারণের জ্ঞানসঞ্চয়ের দিক ও তাদের চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত।

(২) A. M. Espinosa-র 'Folklore' সংক্রান্ত একটি মন্তব্যেও লোকঐতিহ্যের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তাঁর মতে 'Folklore or popular knowledge is the accumulated store of what mankind has experienced, learned and practised across the ages as popular and traditional knowledge, as distinguished from so called scientific knowledge'[১১]—বলা বাহুল্য, এই মন্তব্যটিতেও জ্ঞান তথা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এছাড়া Maria Leach সম্পাদিত Standard Dictionary of Folklore, Mythology and legends (London, 1975) গ্রন্থে প্রদত্ত Folklore-এর আরো একাধিক সংজ্ঞায় উক্ত মতের সমর্থন মেলে।

Folklore-সংক্রান্ত এ সমস্ত মতামত বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা যায়, লোকসমাজের সামগ্রিক জীবনাচরণের পুরুষানুক্রমিক সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির গতিময় ইতিহাসই লোকঐতিহ্য।

লোকসমাজের জীবনাচরণের সামগ্রিক রূপটি বিধৃত থাকে ব'লে লোকঐতিহ্যের ক্ষেত্রটিও সুবিস্তৃত। তাই আলোচনার স্বার্থে এর শ্রেণী-বিভাগ প্রায় অপরিহার্য। কিন্তু শ্রেণীবিভাজন প্রসঙ্গে লোকতত্ত্ববিদদের মধ্যে তীব্র মতভেদ বর্তমান। সেই বিতর্কে প্রবেশ না করে লোকঐতিহ্যকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়। এই শ্রেণী-বিন্যাসকরণে আমাদের মূল লক্ষ্য, লোকসাধারণের জীবনাচরণের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরা।

লোক-ঐতিহ্যের শ্রেণীবিন্যাস ঃ
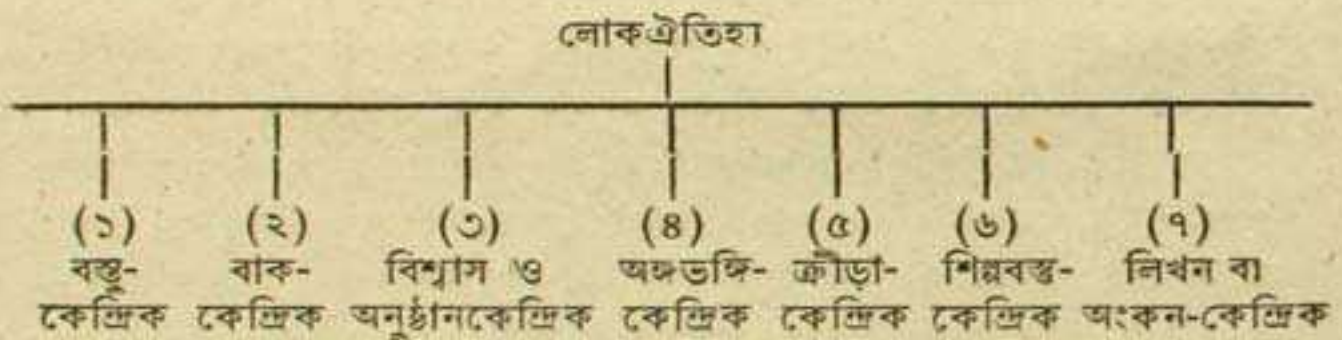
উদাহরণসহ লোকঐতিহ্যের সামগ্রিক পরিচয়টুকু পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

১। বস্তু-কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য ঃ

আদিম যুগ থেকেই মানুষের ব্যবহারিক জীবনে বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুকে কেন্দ্র করেই ভাবের সৃষ্টি ; বস্তুময় জগতে মানুষ প্রথমে বস্তু আশ্রয়ী, পরে ভাবনির্ভর। লোকসমাজের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

লোকসাধারণ কর্তৃক উদ্ভাবিত, প্রস্তুত ও ব্যবহৃত বস্তু-সম্ভার নিয়েই বস্তু-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের জগতটি গড়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, লোক-সমাজে ব্যবহৃত এ জাতীয় বহুসংখ্যক বস্তুই প্রয়োজনের তাগিদে নগর সমাজেও গৃহীত হয়েছে। বৃহত্তর অর্থে, লোকসমাজের সমস্ত কুটির-শিল্পজাত বস্তুই বস্তুকেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের পর্যায়ভুক্ত।[১২] ব্যবহারিক বিচারে এই পর্যায়ের অন্তর্গত বহুবিচিত্র বস্তু-সম্ভারকে নিম্নোক্ত উপ-পর্যায়ে ভাগ করা যায়—(১) খাদ্য ও পানীয় (২) পরিধান-প্রসাধন (৩) গৃহস্থালী দ্রব্য (৪) বৃত্তি-সরঞ্জাম (৫) যানবাহন (৬) বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি।

১। (১) খাদ্য-পানীয় :

"আমানি" থেকে শুরু করে "নলেন গুড়"–পিঠে-পুলি, মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়ে, নাড়ু ইত্যাদি বহু বিচিত্র খাদ্য-পানীয়াদির সমন্বয়ে লোকসমাজের 'ভাঁড়ার' ঘরটি কম সমৃদ্ধ নয়।

১। (২) পরিধান-প্রসাধন :

মানুষের জীবনে প্রয়োজনের তালিকায় অন্ন বা খাদ্যের পরেই বস্ত্র তথা পরিধানের গুরুত্ব স্বীকৃত। অবশ্য পরিধানের সঙ্গে সঙ্গে অলংকার ও সজ্জা-দ্রব্যাদিও এ উপ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, লোক-সমাজে ব্যবহৃত রকমারি 'শাড়ি', 'ঘাঘরা' ইত্যাদি পরিধান, 'নোলক', 'বেশর', 'খাড়ু' প্রভৃতি অলংকার, 'আলতা' 'সিঁদুর' প্রভৃতি প্রসাধনী উল্লেখযোগ্য।

১। (৩) গৃহস্থালী দ্রব্য :

গৃহ থাকলেই গৃহস্থালী দ্রব্য থাকে। লোকসমাজে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত গৃহস্থালী দ্রব্যের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। লোকসমাজে ব্যবহৃত অনেকগুলি গৃহস্থালী দ্রব্যই নগরগৃহেও লক্ষণীয়। 'হাড়ি-কড়া' থেকে শুরু করে 'কুলো', 'ঝুড়ি'–এসবই এ উপপর্যায়ভুক্ত।

১। (৪) বৃত্তি-সরঞ্জাম :

শ্রম-নির্ভর লোকসমাজে বৃত্তি-সরঞ্জামের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন-সংগ্রামে এগুলিই তাদের হাতিয়ার। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাজে বৃত্তির বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। আদিম যুগে অরণ্যচারী মানুষের একমাত্র বৃত্তি ছিল পশু শিকার। আর সে শিকার করা হত গাছের ডাল বা পাথর দিয়ে। কালক্রমে সেই গাছের ডাল ও পাথরের স্থান অধিকার করল বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদি। এভাবেই বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি-সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও বহুল বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'কাস্তে', 'লাঙল', 'তীর-ধনু', 'হাতুড়ি', 'ছেনি', মাছ ধরা 'জাল', কুমোরের 'চাক' ইত্যাদি নানাবিধ বৃত্তি-সরঞ্জাম উল্লেখ্য।

১। (৫) যান-বাহন ঃ

জলপথ ও স্থলপথে যাতায়াতের জন্য লোকসমাজে পৃথক পৃথক যানবাহন প্রচলিত। জলপথে ব্যবহৃত হয় নানা ধরনের 'নৌকা'। আর স্থলপথে 'পালকি', 'ডুলি', 'গোরুরগাড়ি' ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়।

১। (৬) বাদ্যযন্ত্র ঃ

লোকসমাজে মানস-বিনোদনের অন্যতম উপকরণ রূপে লৌকিক বাদ্যযন্ত্রগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লোকসাধারণের দৈনন্দিন কর্মক্লান্ত জীবনে এই বাদ্যযন্ত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেন আনন্দের প্রতীক।

লোকসাধারণ তার নিত্য ব্যবহার্য নানা বস্তু থেকেই এসব বাদ্য-যন্ত্রাদি প্রস্তুত করে। লাউয়ের খোল, বেল-নারিকেলের মালা, বাঁশ, কাঠ, নল, পাতা, মাটি, লোহা, পিতল, সুতো, তার, শিং, শঙ্খ প্রভৃতি লোকবাদ্যের বস্তু উপকরণ।[১৩]

বাদন-পদ্ধতি অনুসারে বাংলা লৌকিক বাদ্যযন্ত্রগুলি চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা-(১) তত (তারযুক্ত বাদ্য। যেমন, একতারা, দোতারা প্রভৃতি।); (২) শুষির (ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় এমন বাদ্য। বাঁশী, শাঁখ, শিঙ্গা ইত্যাদি)। (৩) ঘন (ধাতু নির্মিত বাদ্য, আঘাত-যোগে বাজানো হয়। যেমন, কাঁসর, করতাল, ঘন্টা ইত্যাদি)। (৪) আনদ্ধ (চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র; এটিও ঘা মেরে বাজানো হয়। যেমন, ঢাক, ঢোল, খোল ইত্যাদি)।

২। বাক-কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য ঃ

লোকসমাজ-সৃষ্ট ও লোকসমাজে বহুল প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, নাট্য, গীতি, গীতিকা, কথা, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-নাম, স্থান-নাম, লোক-ভাষার নানাদিক বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণভাবে অবশ্য বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্য বলতে 'লোকসাহিত্য'কেই বোঝায়।

'লোকসাহিত্য' অক্ষরজ্ঞানহীন বা স্বল্পাক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন জনগোষ্ঠির সৃষ্টি। মূলত তা মৌখিক সৃষ্টি; শ্রুতিনির্ভর ও স্মৃতিবাহিত। লোক-সমাজে সুপ্রচলিত অজস্র ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদির কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি-রচয়িতার সন্ধান মেলে না। কোন্ সুদূর অতীতকাল থেকে এগুলি

রচিত হতে হতে পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে বর্তমান যুগে এসে পৌঁছেছে, তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।

আসলে লোকসমাজে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কালক্রমে সমষ্টিতে পর্যবসিত। এ কারণেই ব্যক্তির বাক-কেন্দ্রিক সৃষ্টিও কালক্রমে সমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত হতে হতে বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যে পরিণত হয়। লোকসমাজের সুসংহতি, লিখনাভ্যাস ও ব্যক্তি-সচেতনতার অভাবই এর কারণ বলে মনে হয়।

সে যাই হোক, লোকসাহিত্যে সাধারণ লোকসমাজের সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রয়াস তার মূল্য ও গুরুত্ব কম নয়। লোকসাহিত্যই যে পরবর্তীকালের পরিশীলিত সাহিত্যের ভিত্তিভূমি, তাতেও সন্দেহ নেই।

সাহিত্য হ'ল 'সমাজ-দর্পণ'। লোকসাহিত্যও লোকসমাজের দর্পণ। পরন্তু 'লোকসাহিত্য কেবল সমাজের প্রতিফলনই ঘটায় না, তা জীবন্ত, তার প্রাণ আছে।'[১৪] আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাই ইতিহাসের বহু অজ্ঞাত অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। লোকসাধারণের সুদীর্ঘকালের আশা-আকাঙ্খা, সাফল্য-ব্যর্থতা, শোষণ-লাঞ্ছনার বহু বিচিত্র পরিচয় এ সাহিত্যে বিধৃত। আর এ কারণেই মার্কস, লেনিন, রবীন্দ্রনাথ, গর্কি প্রমুখ মনীষিগণ লোকসাহিত্যের বস্তুবাদী বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন, রাশিয়ান Cossack -দের লোকগীতি কিংবা জার্মানীর Silesian জেলার তন্তুবায় সমাজে প্রচলিত গীতিগুলির অন্তরস্থিত সংগ্রামী মনোভাবের সন্ধান পেয়ে মার্কস্ সেখানে সাধারণ মানুষের দিনযাপনের বাস্তব অর্থ সন্ধান করেছেন[১৫]। আবার লৌকিক ছড়ায় রবীন্দ্রনাথ 'পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসে অতিক্ষুদ্র এক ভগ্ন' অংশের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন[১৬]।

অন্যান্য দেশের মত বাংলার লোকসাহিত্যেও লোকসাধারণ ও লোকসমাজের বাস্তব রূপটি নানাভাবে প্রতিভাত। যেমন, 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'—এই লৌকিক প্রবাদটি বিশ্লেষণে দেখা যাবে, শাসক গোষ্ঠীর স্তাবকদের অতিরিক্ত গর্বোদ্ধতভাব ও লোকসাধারণের উপর অত্যাচারের প্রবণতা এখানে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পরিস্ফুট। বাংলার অজস্র লোককথার কাহিনীতে ক্ষুদ্র শক্তির কাছে বৃহৎ শক্তির পরাজয়, নিপীড়িত শ্রম-শ্রান্ত লোকসাধারণের অবরুদ্ধ মানসের মুক্তি-কামিতাই ব্যক্ত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'রাজা ও টুনটুনি' কিংবা 'কাক-চড়ুইয়ের' গল্প স্মরণযোগ্য।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যকে নিম্ন-লিখিত শ্রেণীতে বিন্যাস করছি।
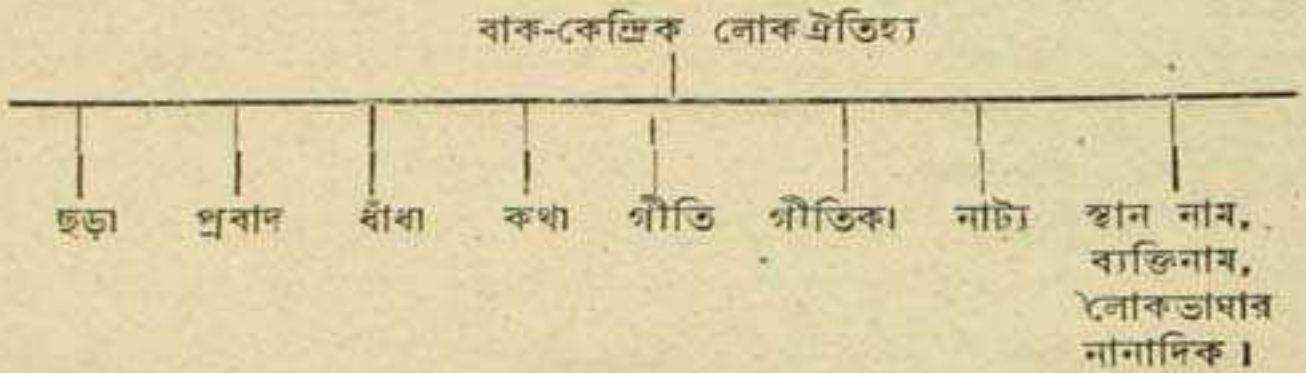
এখন বাংলার বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারার পরিচয় দেওয়া যাক।

২। (১) লোকছড়া (Rhyme) : ছড়া একটি অত্যন্ত লোকপ্রিয় সাহিত্য-শাখা। বৈচিত্র্য ও সংখ্যায় বাংলার লৌকিক ছড়ার ভাণ্ডারটি সুসমৃদ্ধ। কিন্তু ছড়ার সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতান্তরের অন্ত নেই। তবে ডঃ সুকুমার সেন প্রদত্ত ছড়ার সংজ্ঞাটির[১৭] যৌক্তিকতা অনেকেই স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, ছড়ার আদি রূপ মধ্যযুগে প্রচলিত 'মঙ্গল গান', 'পাঁচালি', 'যাত্রা', 'কথকতা'র অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ অংশে লভ্য। এই বিশেষ অংশগুলিই সাধারণ শ্রোতাকে আকর্ষণ করত। এছাড়া সে যুগের ছড়ার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে ডঃ সেন বলেছেন, "গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পরপর গ্রথিত—এই ছিল তখনকার ছড়ার বৈশিষ্ট্য। কালক্রমে এর অর্থ হল, চুটকো ছন্দময় রচনা। হিন্দী 'ফুট-কল' কবিতা আর সংস্কৃত চাণক্য (চানা ভাজার মতো) শ্লোক ছড়ারই সমনাম।" এ সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ করে ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'বাংলা ছড়ার ভূমিকা' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে ডঃ সেনের এই মন্তব্যের যাথার্থ প্রমাণ করেছেন।[১৮]

এছাড়া ডঃ ভৌমিক উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন দিক থেকে ছড়ার বৈশিষ্ট্য গুলির সুবিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ছড়া অতি সুচিন্তিত উদ্দেশ্যমূলক সম্পূর্ণ সৃষ্টি।[১৯]

ডঃ সেন ও ডঃ ভৌমিকের ছড়া-সম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, লোকসমাজে প্রচলিত 'মঙ্গলগান', পাঁচালি', 'যাত্রা'য় ব্যবহৃত

পরম্পরা-বিশিষ্ট, আবৃত্তিযোগ্য দ্রুততালের ছন্দের সরস রচনা বিশেষই লৌকিক ছড়া। লোকসাধারণের দৈনন্দিন জীবনাচরণের সঙ্গে লৌকিক ছড়ার অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য যোগ লক্ষণীয়। তার প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ্য, —অনাবৃষ্টির দিনে বৃষ্টি কামনা করে কৃষক ছড়া বলে, সংসারের সুখ-সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আয়োজিত নানা ব্রতানুষ্ঠানে লোকরমণীদের মুখে বিচিত্র ছড়া শোনা যায়। এছাড়া, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহোপলক্ষে এবং নানা উৎসব উপলক্ষেও লোকসমাজে ছড়ার ব্যবহার সুপ্রচলিত। শিশুকে কেন্দ্র করেও অজস্র লৌকিক ছড়া মেলে।

ডঃ ভৌমিকের অনুসরণে বাংলার লৌকিক ছড়াগুলিকে মূলত দুটি পর্যায়ে বিন্যাস করা যায়, (১) আনুষ্ঠানিক (২) অনানুষ্ঠানিক।

২। (১) [১] **আনুষ্ঠানিক ছড়া**ঃ লোকসমাজের নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, ব্রত পালনের ক্ষেত্রে ছড়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনেক লোকানুষ্ঠানই ছড়া ব্যতীত পালিত হয় না। যেমন—মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়া, ধান কাটার ছড়া ইত্যাদি।

২। (১) [২] **অনানুষ্ঠানিক ছড়া**ঃ অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ভুক্ত ছড়াগুলির মধ্যে শিশু-সম্পর্কিত ছড়াগুলিই প্রথমে স্মরণে আসে। শিশুর মনস্তত্ব, তার স্বপ্নলোক, তার প্রতি জননী ও আত্মীয়-স্বজনের গভীর বাৎসল্যের অনুভূতি এই শ্রেণীর ছড়াগুলিকে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ এক সর্বজনীন মাত্রা দান করেছে। ঐতিহাসিক ঘটনা, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, মানব-চরিত্র, ইত্যাদি আশ্রয়ে রচিত ছড়াগুলিও অনানুষ্ঠানিক ছড়া। সমাজ-ইতিহাস, সমকালীন নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত ছড়াগুলির ঐতিহাসিক সামাজিক মূল্য অনস্বীকার্য। যেমন, 'বাঘ ভালুকে নাই ভয়। ঢেঁকি দেখলে প্রাণ যায়'—ছড়াটিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের দৌরাত্ম্যের ইঙ্গিতপূর্ণ বাস্তব চিত্র মেলে।

ছড়ার সঙ্গে লোকসাহিত্যের প্রায় সব শাখারই কোন না কোনরকম যোগ লক্ষিত হয়। ছড়াধর্মী প্রবাদ বা ধাঁধা এর আঙ্গিকটির লোকপ্রিয়তারই প্রমাণ। কথা-আশ্রয়ী ছড়া যেমন দেখা যায়, তেমনি লোককথার মধ্যেও বিবিধ উদ্দেশ্যে ছড়ার ব্যবহার ঘটে থাকে।

২। (২) **লোক প্রবাদ (Folk-Proverb)**ঃ জগত, জীবন ও সমাজ-সম্পর্কিত লোকসমাজের দর্শন ও সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস রূপটি লৌকিক প্রবাদে বিধৃত। জার্মান ভাষায় প্রচলিত একটি প্রবাদে এ মন্তব্যের সমর্থন মেলে।

প্রবাদটি হল—"Proverbs are the wisdom of ages. W. C. Hazlitt-এর মতে প্রবাদ হল "An expression or combination of words conveying a truth to the mind by a figure periphrasis, antithesis or hyperbole"[২০]

বাংলার লৌকিক প্রবাদগুলিতেও লোকসমাজের বুদ্ধি-প্রাখর্য, জীবন-সম্পর্কিত সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও নীতিবোধ প্রতিফলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ (proverbial phrase) ও বিশিষ্টার্থক শব্দ-গুচ্ছ-ও (Idiom) লোকসমাজে সুপ্রচলিত। ব্যাপক অর্থে এগুলি প্রবাদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রবাদের সঙ্গে এগুলির বাহ্যরূপে পার্থক্য আছে। যেমন, প্রবাদে মোটামুটি ভাবের পূর্ণতা লক্ষণীয়, কিন্তু প্রবাদ-মূলক বাক্যাংশে ভাবের অসম্পূর্ণতা দেখা যায়। আবার বিশিষ্টার্থক শব্দ-গুচ্ছ, একাধিক শব্দের গুচ্ছ, পরিপূর্ণ বাক্য নয়। উদাহরণ সহযোগে এদের পারস্পরিক পার্থক্য পরিস্ফুট করা যেতে পারে। 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'—একটি আন্তর্জাতিক স্তরের প্রবাদ ; এখানে ভাবের পূর্ণতা লক্ষণীয়। কিন্তু 'তেলে বেগুনে জলে ওঠা'—এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশটিতে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি। আবার 'কেষ্ট-বিষ্টু' (গণ্যমান্য ব্যক্তি) 'গুড়ে বালি' (নিরাশ হওয়া) প্রভৃতি বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ অর্থ প্রকাশক।

ব্যঞ্জনাধর্মিতা ও সরসতার দিক থেকে প্রবাদ, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই আলো-চনার সুবিধার্থে আমরা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছকে প্রবাদ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করেছি।

ছড়ার মত প্রবাদও সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দের অভিমত হল,—'প্রবাদ-বাক্যের আদি স্রষ্টা ছিল সাধারণ মানুষ। যাহার সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতায় প্রথম প্রবাদের উপ-করণের, পরে প্রবাদের সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। যাহা পিতার বচন ছিল তাহা কালক্রমে পুত্রের সম্পত্তি হইল---।'[২১]

ছড়ার তুলনায় অর্বাচীন হলেও প্রবাদের প্রচলন খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ অব্দ থেকেই পাওয়া যায়। প্রমাণ-স্বরূপ প্রাচীন যুগের মিশরে গ্রথিত 'The book of the Dead' গ্রন্থ-ভুক্ত প্রবাদগুলি স্মর্তব্য। তবে কালের দিক থেকে ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত প্রবাদগুলিই সম্ভবত প্রাচীনতম প্রয়োগ-নিদর্শন।

লৌকিক প্রবাদের পর্যালোচনায় প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত, জগত-জীবন-সমাজ ও সংসারের অভিজ্ঞতা প্রসূত

সত্যোপলব্ধি প্রবাদগুলিতে বিধৃত। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ প্রবাদই কৌতুক রসে সিক্ত। এ কারণে এদের আবেদনে একটি সহজ ভঙ্গিও লক্ষণীয়। তৃতীয়ত, এদের সংক্ষিপ্ত ও wit-ধর্মী গঠনরীতি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

এছাড়া প্রবাদগুলির ব্যবহারিক মূল্যও অনস্বীকার্য। লোকসমাজের জীবন-চর্যায় প্রবাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। অনেক সময় সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতামণ্ডিত প্রবাদগুলি লোকজীবনকে নিয়ন্ত্রিতও করে। বিষয়-বৈচিত্র্যে বাংলার লৌকিক প্রবাদগুলি যথার্থই সমৃদ্ধ। মানবজীবনের দৈনন্দিন ও চিরন্তন উভয়দিকই প্রবাদে লভ্য।

আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে লৌকিক ছড়ার মত প্রবাদেও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক পরাধীনতা ও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতে তার অবরুদ্ধ মানসের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, অর্থই ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করে, অর্থহীন মানুষের দীর্ঘশ্বাস তাই প্রতিফলিত হয়েছে, 'কড়ি থাকলে মেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত'—প্রবাদটিতে।

২। (৩) লোকধাঁধা (Folk riddle) : ধাঁধা লোকসমাজের পরিণত মনের সৃষ্টি। বিশেষ কোনো সমস্যা-আশ্রয়ে ধাঁধা রচিত হয়। ধাঁধার মূল উদ্দেশ্য বুদ্ধির পরীক্ষা। লোকসাধারণের কল্পনা-শক্তির পরিচয়ও ধাঁধায় লভ্য। পারিবারিক জীবন, আত্মীয়-সম্পর্ক, গৃহস্থালী দ্রব্য, মনুষ্যদেহ, ইতর প্রাণী, নিসর্গ জগত ইত্যাদি ধাঁধার আশ্রয়। পরিচিত জগত ও পাত্র-পাত্রী কল্পনা-পুষ্ট ও সমস্যাযুক্ত হয়ে অপরিচয়ের বিস্ময়-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়। যাদুবিদ্যার সঙ্গেও লৌকিক ধাঁধার অন্তর্গূঢ় যোগ-সূত্র কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্বের সর্বত্রই ধাঁধা সুপ্রচলিত। শুধু বাংলার লোকসমাজেই নয়, নানা আচার অনুষ্ঠানে ধাঁধার ব্যবহার অন্যত্রও দেখা যায়। ছড়া ও প্রবাদের মতোই ধাঁধার সঠিক উদ্ভব-কাল নিরূপণ সম্ভব নয়। তবে এর উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি মূলত ধর্ম ও যাদুভিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান-নির্ভর।[২২]

লোকসমাজে প্রচলিত ধাঁধাগুলিতে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, প্রতিটি ধাঁধাতেই এক বা একাধিক সমস্যা উপস্থাপিত করে তার সমাধানের আহ্বান জানানো হয়। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধাঁধার সমস্যা সমাধানে নানাপ্রকার শর্তারোপ করা হয়। প্রসঙ্গত, প্রাচীন গ্রীসে স্ফিঙ্কসের-বহু প্রচলিত ধাঁধার গল্পটি মনে পড়ে। সেখানে দেখি, স্ফিঙ্কসের ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে না পেরে অনেকে প্রাণ

হারিয়েছে; অপরপক্ষে, ইদীপাস সেই ধাঁধাগুলির সঠিক উত্তর দিয়ে রাক্ষসীকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই ধাঁধার শর্তগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ বা সংকটজনক হয় না। নিছক আমোদ-সৃষ্টির জন্য বিশেষ কোন ব্যক্তিকে বোকা প্রতিপন্ন করতেও ধাঁধায় শর্তারোপ করা হয়। তৃতীয়ত, ধাঁধায় উল্লিখিত প্রহেলিকাধর্মী প্রশ্নের উত্তরদানে স্বাধীন-বিশ্লেষণের সুযোগ নেই, কারণ দীর্ঘদিন ধরে সে প্রশ্নের একটি নির্দিষ্ট উত্তর অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুতরাং যুক্তির বিচারে অন্য উত্তর যথার্থ হলেও তা গ্রাহ্য হয় না। চতুর্থত, ধাঁধার প্রশ্নটির উত্তর যত জটিলই হোক না কেন, তার উত্তরের সংকেত ঐ নির্দিষ্ট ধাঁধাটিতেই স্তরানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকে। আবার উত্তরদাতাকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াসও সেখানে দুর্লক্ষ নয়। উল্লেখযোগ্য, ধাঁধার সমস্যাটি রসের আধারে রূপকাবরণে শ্রোতার কাছে পরিবেশিত হয়। এ কারণে লোক-মানসে ধাঁধার আকর্ষণও বৃদ্ধি পায়।

২। (৪) লোককথা (Folk lore): স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে। কোন্ আদিম কাল থেকে যে গল্পের উদ্ভব তা নিরূপণ করা অসম্ভব। গল্পের মধ্যে মানুষ তার অস্তিত্ব, আশা-আকাঙ্খা, সমাজ ও জগতের একটি প্রতিরূপের সন্ধান পায়। যেখানে কোন সমস্যা তাকে জর্জরিত করে না। পরন্তু কল্পরাজ্যে মুক্ত বিচরণের আস্বাদ লাভ করা যায়। মূলত, এ কারণেই গল্পের আকর্ষণ বিশ্বজনীন।

যে কোন দেশের লোককথাতেই সে দেশের লোকসাধারণের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়। লোকসমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকরূপ পরিস্ফুটনে লোককথাগুলি যেন এক একটি অভ্রান্ত দলিল। বলা বাহুল্য, লোককথা পুরুষানুক্রমে লোকসমাজের মুখে মুখেই আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। লোককথার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, এর আন্তর্জাতিকতা। একই লোককাহিনী অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের লোকসমাজে প্রচলিত দেখা যায়। তাই বলা হয়, 'Tales are great travellers. Some stories have a distribution that is almost literally world-wide.[২৩]

বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের এই শাখাটি সুপ্রাচীনকাল থেকে নিত্য-সৃষ্টি, সংযোজন ও ব্যবহারের ফলে বিষয়-বৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। সাংস্কৃতিক মিশ্রণের এমন বিচিত্র দৃষ্টান্ত লোকসাহিত্যের অন্য কোন শাখায় দেখা যায় না।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লোককথার বিশ্লেষণে লোকসাধারণের সুদীর্ঘকালের জীবন-সংগ্রাম ও আশা-আকাঙ্খার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সমাজ, ইতিহাসের বহু অলিখিত অধ্যায় উন্মোচিত হতে পারে।

লোকসমাজে লিখিত ইতিহাসের অভাবহেতু আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে লোককথাগুলির সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে Paul Lafarg-এর 'Sketches of the History of primitive culture' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। 'Socialist Realism'-এর প্রবক্তা Maxim Gorky-র 'The Disintegration of personality'[২৪] প্রবন্ধেও লোককথার সামাজিক-ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিকটি আলোচিত হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রাম, আত্ম-প্রতিষ্ঠায় বাধা, সমাজের বৃহত্তর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শক্তির কাছে অনিবার্য পরাজয়ের নিত্য অভিজ্ঞতা থেকে লোকসমাজের মানস-মুক্তি ঘটেছে তার সৃষ্ট লোককথায়। তাই লোককথার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, অবাস্তবের বাস্তবায়ন।

লোককথাগুলির শ্রেণী-বিন্যাস নিয়েও মতানৈক্য বিদ্যমান। বিতর্কে না গিয়ে আমরা নিম্নলিখিতভাবে লোককথাগুলির শ্রেণী বিভাগ করছি,—(১) পুরাকথা, (২) রূপকথা, (৩) পশু-পাখি-কথা, (৪) ভূত-প্রেত-কথা, (৫) ইতি কথা, (৬) সমাজ-সংসার-কথা, (৭) অন্যান্য।

প্রসঙ্গত, Stith Thompson-এর নাম অবশ্য উল্লেখ্য। Thompson বিশ্বের লোককাহিনীগুলিকে Motif-গত বিচারে শ্রেণী-বিন্যাস করেছেন[২৫] যা অভিধানের মতোই আমাদের কাছে মূল্যবান।

এখন সংক্ষেপে বিভিন্ন শ্রেণীর লোককথার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

২। (৪) [১] **পুরাকথা :**—বিশ্বজগত সম্বন্ধে লোকসমাজের অসীম বিস্ময়ই পুরাকথার উৎস। পুরাকথায় কল্পনা-সহায়তায় বিশ্বজগতের বিচিত্র সৃষ্টি-রহস্য সমাধানের প্রয়াস লক্ষণীয়।

লোককথার এই শাখাটিই প্রাচীনতম বলে মনে হয়। বিশেষত, পুরাকথার অন্তর্গত সৃষ্টি-সংক্রান্ত কথায় এর ইঙ্গিত লভ্য। সমর্থন-স্বরূপ, বিশেষজ্ঞের অভিমত স্মরণযোগ্য, 'Myth might be regarded as the most basic method of the folk mind constructing an intentive explanation of the universe.'[২৬]

পুরাকথার পরিচয় দান সূত্রে ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত প্রদত্ত লোকপুরাণের সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, 'নিজেদের প্রাত্যহিক পরিবেশের-

অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বুদ্ধির আয়ত্তাতীত ঘটনা, বস্তু এবং বিষয়-গুলির কারণ খুঁজে বার করতে চেয়েছেন আদিকালের পূর্ব-পুরুষেরা এবং স্বভাবতই সহজাত সংস্কারে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস, দৈবনির্ভরতা ইত্যাদির সঙ্গে সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট করেছেন।[২৭]

প্রথম পর্বে পুরাকথায় মূলত সৃষ্টি-সংক্রান্ত কাহিনীই স্থানলাভ করেছে। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর বিষয়েও পরিবর্তন ঘটেছে; দৈব-সর্বস্বতা হ্রাস পেয়েছে। সৃষ্টি-জিজ্ঞাসা থেকে সরে এসে লোকসমাজ দেবদেবীর পাশাপাশি প্রকৃতি ও মানুষকে স্থান করে দিয়েছে।

২। (৪) [২] **রূপকথা:** বিশ্বের সবদেশের লোকসমাজেই রূপকথার জনপ্রিয়তা দেখা যায়। লোকসমাজের গণ্ডী ছাড়িয়ে নগর-সমাজের শিশুমহলেও তার আবেদন লক্ষণীয়। ইংরাজীতে যা 'fairy tale', সাধারণভাবে বাংলায় তাই রূপকথা নামে পরিচিত। কিন্তু সঠিক বিচারে 'রূপকথা' বলে চিহ্নিত গল্পগুলি 'fairy tale'-এর পর্যায়ে পড়ে না। কারণ 'fairy tale' হ'ল পরীর গল্প, যার সংখ্যা বাংলার লোকসাহিত্যে নিতান্তই সামান্য।

রূপকথা লোকসমাজের কল্পনার রাজ্যে বল্গাহীন গতির ফসল। লোকসাধারণের অবরুদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষা অসম্ভবের কল্পনারাজ্যে মুক্তি লাভ করে। সূক্ষভাবে লক্ষ্য করলে রূপকথার অন্তরেও বাস্তব কামনা-বাসনার ইঙ্গিত অনুভব করা যায়। একারণেই 'seven league boots'-এর রূপকথার অন্তরে Gorky মানুষের তীব্র গতিসম্পন্ন হবার স্বপ্ন লক্ষ্য করেছিলেন।[২৮]

অন্যান্য লোককথার তুলনায় রূপকথা আয়তনে সাধারণত দীর্ঘতর হয়। কাহিনী বিন্যাসেও কিছু জটিলতা লক্ষণীয়। একাধিক শাখা কাহিনী মূলকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রূপকথাকে আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও জটিল করে তোলে, কাহিনীর পটভূমি ও চরিত্রের ক্রিয়াকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব। সেদিক থেকে রূপকথা যেন স্বপ্ন-রাজ্য। যে রাজ্যের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য,—নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দুর্লভকে লাভ করা।

রূপকথার কাহিনী-বিন্যাসে একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসৃত হয়। Comedy-র মধ্য দিয়েই যার পরিণতি।

রূপকথার গঠনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করে A. H. Krappe বলেছেন, 'By fairy tale we mean a continued narrative, generally of a

certain length, practically always in prose, serious on the whole, though humour is by no means excluded, centring in one hero or heroine; usually poor and destitute at the start, who, after a series of adventures in which the supernatural element plays a conscious part, attains his goal and lives happy ever after'.[২৯]

২। (৪) [৩] পশু-পাখিকথা: পৃথিবীর সমস্ত আদিম সমাজেই পশু-পাখি-সংক্রান্ত বিচিত্র লোককথার সাক্ষাৎ মেলে। অরণ্যচারী মানুষের সঙ্গে জীবজগতের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের ইঙ্গিত এইসব লোককথায় লভ্য। লোকসমাজের সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসও পশু-পাখি-সংক্রান্ত লোককথায় প্রতিফলিত।

এ জাতীয় লোককথায় পশু-পাখিরাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের আচার-আচরণ মানবিকগুণসম্পন্ন; যদিও আকৃতিতে তারা পশু-পাখিই থাকে। লোককথায় পশু-পাখির এই ভূমিকা প্রসঙ্গে Thompson-এর বক্তব্য হল, "Animal play a large role in all popular tales, they appear in myths, specially those of primitive peoples. Where the culture hero often has animal form, though he may be conceived of as acting and thinking like a man or even, on occasion, of having human shape. This tendency toward ascribing human qualities to animals also appears when the tale is clearly not in the mythical cycle".[৩০]

এজাতীয় লোককথার মুখ্য উদ্দেশ্য,—উপদেশপ্রদান ও কৌতুকরস পরিবেশন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে পশু-পাখির চরিত্রের অবতারণা করা হলেও, এসব লোককথায় রূপকাশ্রয়ী সমাজচিত্রও দুর্লক্ষ নয়।

পশু-পাখি-সংক্রান্ত কোন কোন লোককথার উপসংহারে একটি নীতি বাক্য থাকে। এগুলিই পাশ্চাত্যে 'Fable'-ও বাংলায় 'নীতিকথা' নামে সুপরিচিত। ইংরাজীতে 'ঈশপের গল্প', সংস্কৃতে 'পঞ্চতন্ত্র' যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

২। (৪) [৪] ভূত-প্রেত-কথা: ভূত, প্রেত ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত চরিত্র-সম্বলিত লোককথাও বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত। এশ্রেণীর লোককথার মূল আকর্ষণ, অপ্রাকৃতের রহস্য-রোমাঞ্চ। ভূতের গল্প শুনতে শুধু শিশুরাই নয়, বয়স্ক মানুষেরাও যথেষ্ট আগ্রহী। কারণ মানুষের রহস্য-প্রিয়তার চিরন্তন প্রবণতাকে উজ্জীবিত করার উপাদান এসব লোককাহিনীতে বিধৃত।

ভূত-প্রেত-সংক্রান্ত লোককথাগুলির উৎসমূলে লোকসমাজের অশুভ শক্তিতে গভীর বিশ্বাস ও যাদুশক্তিতে আস্থা বিদ্যমান। অবশ্য অনেক সময় ভূত-প্রেতকে উপলক্ষ করে কৌতুক-সৃষ্টির প্রয়াসও এই সব লোক-কথায় মেলে। বিশেষত, ভূত-প্রেতের হাতে দুষ্ট বা নির্বোধ ব্যক্তির অপদস্থ হওয়ার কাহিনী আমাদের মনে হাস্যোদ্রেক করে।

২। (৪) [৫] ইতি কথা: লোকসমাজে সুপ্রচলিত ইতিহাস বা কিংবদন্তী-ভিত্তিক লোককথাগুলির স্বতন্ত্র মূল্য অনস্বীকার্য। এ শ্রেণীর লোককথাগুলির কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের ক্ষীণ যোগসূত্র থাকে। সুতরাং এদের ঐতিহাসিক মূল্য আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

সমকালীন বা সদ্য-অতীতের অতি জনপ্রিয় অথবা অতি কুখ্যাত ব্যক্তি লোকমুখে আলোচিত হতে হতে ক্রমে গল্পে পর্যবসিত হয়। এভাবে কালক্রমে কল্পনার রঙে-রসে বাস্তব ইতিহাস অলৌকিকতা পুষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে এ জাতীয় কাহিনীতে অতীত ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায় আবিষ্কারের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান।

২। (৪) [৬] সমাজ সংস্কার কথা: সমাজ-সংসার-সম্পর্কিত বহু কাহিনীও লোককথায় লভ্য। কৌতুক রস ও বাস্তবতাবোধ এ ধরণের লোককথার বিশেষত্ব। নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকলেও কাহিনীর আকর্ষণকে তা ক্ষুণ্ন করে না। লোকসমাজ ও সংসারের অতিপরিচিত ব্যক্তিরা এসব লোককথায় মুখ্যস্থান অধিকার করে। বোকা তাঁতি, ধূর্ত নাপিত, লোভী বামুন, দুষ্ট শাশুড়ী, বোকা জামাই প্রমুখ চরিত্র এসব কাহিনীর মুখ্য আকর্ষণ। বলা বাহুল্য, এশ্রেণীর লোককথাগুলিতে কখনও কখনও চোর-ডাকাতেরাও হানা দিয়েছে।

২। (৪) [৭] অন্যান্য: বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত লোক-কথা-গুলির মধ্যে ব্রতকথার স্বতন্ত্র সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য। কারন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য-গুলির উৎসভূমি এই ব্রতকথা। লোকসমাজে এগুলির ব্যবহারিক মূল্যও অপরিসীম। সংসারের মঙ্গল-কামনায় স্ত্রী-সমাজ যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন, তাদের কোনো কোনোটির সঙ্গে এসব ব্রতকথার নিবিড় যোগ লক্ষণীয়।

স্বভাবতই ব্রতকথাগুলির সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের উৎস মূলেই শুধু নয়, কাহিনীর সর্বাঙ্গে এবং পরিণতি ও প্রয়োগেও ধর্মের অমোঘ প্রভাব লক্ষণীয়।

গঠনগত দিক থেকে ব্রতকথাগুলি পুরাকথা ও রূপকথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। রূপকথার নায়ক যেমন নিজ দক্ষতা, বুদ্ধি ও সাহসের বলে অসাধ্য কর্ম সাধন করে, ব্রতকথাগুলিতেও তেমনি অসাধ্য সাধন ঘটে থাকে। তবে সেখানে নায়কের কৃতিত্বের তুলনায় দেবদেবীর অলৌকিক ক্ষমতাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কারণস্বরূপ বলা যায় যে, দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনই ব্রতকথাগুলির মূল লক্ষ্য। অনুমান, ব্রতকথাগুলি পুরা বা রূপকথাদির মত অত সুপ্রাচীন কালের নয়। কারণ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এসব ব্রতকথায় অপরিচয়ের কুয়াশা কাটিয়ে দেব-দেবীরা বহুলাংশে মানবিক হয়ে উঠেছেন। অপর পক্ষে, মানুষও কোন কোন ক্ষেত্রে দেব-দেবীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।

সামগ্রিক বিচারে বাংলার লোককথাগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন, অধিকাংশ লোককথায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাদু বিদ্যার প্রভাব সক্রিয়। সব লোককথার কাহিনীতেই সমাজ-বাস্তবতার প্রচ্ছন্ন চিত্র রূপকাবরণে বিদ্যমান। এছাড়া রস-আবেদনের দিক থেকেও বাংলার অজস্র লোককথা সর্বজনীনতার দাবী করতে পারে।

২। (৫) লোকগীতি (Folk-Song) : লোকসাধারণের নিত্য-কর্ম-ক্লান্ত জীবনে সাময়িক মুক্তির আস্বাদ নিয়ে আসে, তার নিজস্ব ভাব, সুর আর ভাষায়-গাওয়া গীতিগুলি। প্রাণের আবেগ-অনুভূতি উৎসারণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের প্রতিফলনও লোকগীতিতে ঘটে থাকে।

লোকগীতির সঠিক উদ্ভব-কাল নির্ণয় অসম্ভব। লোকসাধারণের স্মৃতির পথ বেয়ে লোকগীতিগুলি সুদীর্ঘকালব্যাপী লোকসমাজে প্রচলিত। বিশেষজ্ঞের মতে, 'They are learned by ear and transmitted in this fashion from generation to generation'.[৩১]

বিষয় ও সুর-বৈচিত্র্যে বাংলা লোকগীতির ভাণ্ডারটি বিপুল ঐশ্বর্যময়। তবে সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে, বিষয়গত দিক থেকে তা মূলত ধর্ম, শ্রম ও প্রেমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ। কারো কারো মতে, লোকগীতিগুলি সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ ও পর্যায়-বিন্যাস করলে লোকসমাজের শ্রেণী সংগ্রামরত চরিত্রটি পরিস্ফুট হতে পারে।[৩২]

বাংলার শ্রমগীতি ও সামাজিক-ঐতিহাসিক লোকগীতিগুলির ক্ষেত্রে এ মন্তব্যের যাথার্থ্য অনস্বীকার্য। শ্রমগীতিগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য শ্রম লাঘবের প্রয়াস-প্রসূত হলেও এ জাতীয় গীতিগুলি শ্রম-অবসন্ন মানুষের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রাম, সামাজিক-অর্থনৈতিক অত্যাচার ও শোষণেরও

পরিচয়বাহী। বাংলার 'সারি', 'ছাদ পেটার গান' প্রভৃতি শ্রমগীতির নিদর্শন।

আবার, সামাজিক-ঐতিহাসিক গীতিগুলির বিচার-বিশ্লেষণে লোক-সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটিও লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ের একাধিক গীতে সমাজ-ইতিহাসের সুরময় পদচারণা অনুভূত হয়। এছাড়া বাংলার লোকসমাজে 'ভাওয়াইয়া', 'ভাটিয়ালি' প্রভৃতি প্রেমগীতি ও 'বাউল', 'মুর্শিদা', 'মারফতী' ও দেহতত্বাশ্রয়ী প্রভৃতি অধ্যাত্ম গীতিগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বহু লোকগীতিই নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'ঘাটু', 'জারি', 'রামলীলার গান', 'হ্যাচোড়ার গান', 'বোলান', 'ভাদু', 'টুসু', 'ভাজো' প্রভৃতি গীতি এর দৃষ্টান্ত।

২। (৬) লোকগীতিকা (Folk Ballad) : বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে দীর্ঘায়ত গীতিই 'গীতিকা' নামে অভিহিত। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা ভাল, পাশ্চাত্যের Ballad জাতীয় রচনার সঙ্গে বাংলার লোকগীতিকাগুলির মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্যের Ballad বলতে বোঝায়, '—a short, traditional, impersonal narrative told in song, transmitted orally from generation to generation marked by its own peculiar structure and rhetoric and uninfluenced by literary convention'.[৩৩]

কিন্তু বাংলায় 'লোকগীতিকা' বলে অভিহিত রচনাগুলি আদৌ 'Short' নয়। এছাড়া, পাশ্চাত্য লোকগীতিকাগুলির কাহিনী-বিন্যাসে যে তীব্র পরিণতিমুখিনতা দেখা যায়, বাংলা লোকগীতিকায় সে শর্ত রক্ষিত হয় নি। সেগুলিতে নানা ঘটনা মূল কাহিনীর অনুষঙ্গরূপে স্থান লাভ করেছে। বাংলার অধিকাংশ লোকগীতিকাই মিলনান্তক। কিন্তু পাশ্চাত্য লোকগীতিকাগুলি মূলত বিয়োগান্তক।

ভৌগোলিক পার্থক্য, জীবনাচরণগত প্রভেদ ইত্যাদি এই বৈসাদৃশ্যের মূল কারণ, যা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। এ কারণে ইংরাজী Ballad-এর অনুসরণে বাংলার লোকসমাজ-সৃষ্ট আখ্যানমূলক, সুর সহযোগে গেয়, দীর্ঘায়ত রচনা বিশেষকে 'লোকগীতিকা' বলা হয়।

বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের এই শাখাটির উদ্ভবকাল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—'It is by no means primitive or barbaric ; rather it is the product of accomplished and often literary conscious poets'.[৩৪]

বাংলার লোকসমাজে সম্ভবত মধ্যযুগেই লোকগীতিকার উদ্ভব। সাধারণভাবে বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত এই 'Ballad' জাতীয় রচনাগুলিতে বিবৃতিধর্মিতা, নাট্য-ধর্মিতা, গীতিধর্মিতা লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, সুর থাকলেও এধরণের রচনায় কাহিনীই মুখ্য আকর্ষণ।

বাংলার 'ব্যালাড সাহিত্যে' প্রেম কাহিনীরই প্রাধান্য। আবার ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কাহিনীও রয়েছে। বাংলার 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'আয়নাবিবি' প্রভৃতি প্রেমমূলক লোকগীতিকার নিদর্শন, আর 'নাথগীতিকা'-গুলি ধর্মসম্পৃক্ত। অবশ্য বিশেষজ্ঞের মতে, 'নাথগীতিকার' অন্তর্গত 'মীননাথ-গোরক্ষনাথ' ও 'গোপীচন্দ্র-ময়নামতী' কাহিনীর মানবিক আবেদনই প্রধান।[৩৫] তাঁর মতে, দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যই শেষোক্ত শ্রেণীর গীতিকায় পরিস্ফুট।[৩৬]

ইতিহাসের কালচক্রে লোকসমাজও অনিবার্যভাবে আবর্তিত। তাই ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রাদি লোকজীবনকেও প্রভাবিত করে। সুখেরই হোক বা দুঃখেরই হোক, সেই অভিজ্ঞতা লোকমানসে গভীর আলোড়ন তোলে। ইতিহাস-আশ্রয়ী কয়েকটি ব্যালাড-ধর্মী রচনায় সেই অভিজ্ঞতাই কল্পনা-সম্পৃক্ত হয়ে প্রকাশিত। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ আমলে আসামে মণিরাম দেওয়ানের ফাঁসির ঘটনা অবলম্বনে রচিত 'লোকগীতিকার' উল্লেখ করা যায়। এছাড়া 'সোনাবিবি', 'রাজা মহীপাল', 'দস্যু কেনারামের পালা', 'দেওয়ান ঈশাখা' প্রভৃতি রচনা এ শ্রেণীভুক্ত।

২। (৭) **লোকনাট্য (Folk-drama) :** লোকনাট্য লোকসাধারণের অবসর বিনোদন ও লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ রূপেও লোকনাট্য অভিনীত হয়। এটি মুখ্যত বাক ও অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিক অনুকৃতি-মূলক শিল্প।[৩৭] লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই লোকনাট্যও বাস্তব জীবন-নিরপেক্ষ নয়।

লোকনাট্য লোকঐতিহ্যের সৃষ্টিময় স্রোতোধারা থেকেই উদ্ভূত। এর সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষকের ধারণা,—'যাদু-অনুষ্ঠান, উৎসব-অনুষ্ঠান, ক্রীড়া-অনুষ্ঠান ইত্যাদি হ'ল লোকনাট্যের সম্ভাব্য উৎস'।[৩৮] তাঁর মতে, নানা যাদু-ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠানে কামনা-বাসনার সূত্র ধরে নাট্য-ধর্মী অনুকৃতিমূলকতাই লোকনাট্যের উদ্ভব মূলে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। এছাড়া কোন কোন লোকক্রীড়া-সংশ্লিষ্ট নাট্যধর্মী ছড়াও লোকনাট্যের একটি সম্ভাব্য উদ্ভব-উৎস। উল্লেখযোগ্য, বহু প্রচীন কাল থেকেই লোকনৃত্যে নাটকীয় উপাদানের ব্যবহার দেখা যায়।[৩৯] শুধু তাই

নয়, লোকসমাজে প্রচলিত লোকগীতি ও লোককথাতেও নাট্য-উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

বাংলার লোকনাট্যগুলির বিষয়বস্তুকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,--(১) পৌরাণিক, (২) সামাজিক। একালে অবশ্য সামাজিক বিষয়-বস্তুরই প্রাধান্য। স্বভাবতই সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির নানাদিক এগুলিতে প্রতিফলিত। সামাজিক পালাগুলিতে সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থার নানাতর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংগতি সরস কৌতুক অথবা [তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে সমালোচিত।

পৌরাণিক পালাগুলি পুরাণ ও লোকপুরাণ অবলম্বনে রচিত। উদাহরণস্বরূপ--'কুশান', 'শিবযাত্রা', 'বিষহরি', 'বনবিবির পালা' প্রভৃতি লোকনাট্য-পালার উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, পুরাণাশ্রিত লোকনাট্য-পালাগুলিতে গৃহীত পৌরাণিক কাহিনীগুলি প্রায় লোকপুরাণের মতই লোকসমাজের নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে।

সামাজিক লোকনাট্য-পালার দৃষ্টান্তরূপে 'আলকাপ', 'খাসপাঁচালী', 'খন', 'হালুয়া-হালুয়ানীর' পালা প্রভৃতির নাম করা যায়।

লোকসাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখার উপাদানই লোকনাট্যে লভ্য। যেমন, ছড়া, গীতি, ধাঁধা, প্রবাদ, কথা ইত্যাদি প্রয়োজনানুসারে লোকনাট্যে অঙ্গীভূত। এছাড়া অংকন-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অন্তর্গত 'মুখোস'ও কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। লোকনাট্য পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য,--এর জাঁকজমকহীনতা। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট লোকসমাজে লোকনাট্য একটি গুরুত্ব-পূর্ণ গণসংযোগ মাধ্যম। এ কারণে বিভিন্ন দেশে লোকনাট্যের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস দেখা যায়।

২। (৮) **লোকভাষার নানাদিক :** যে কোন দেশের লোকসমাজে ব্যবহৃত ভাষা ও বাকভঙ্গিতে তার স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। বাংলার লোক-সমাজ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

শিষ্ট বাংলা ভাষার পাশাপাশি লোকভাষার স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনে আমরা শব্দ-বিকৃতি (যেমন, 'দুধের ফেনি' : ফেনা:) সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ (যেমন, 'উলামেলা' : নাচানাচি :, 'আঁকবাঁক'), সন্ধি-সমাস (যেমন, 'দখিনদ্বারী' : দক্ষিণমুখো দরজা, 'ঘি-কলসী' : 'ঘিয়ের কলসী :), শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ (যেমন, জনে জনে,' ডিমডিস'), বিশেষ বিশেষ সংখ্যার গুরুত্ব (যেমন, 'এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান--' ইত্যাদি), স্থান-ব্যক্তি-ইতর প্রাণীর নামের বিশেষত্ব (যেমন,

'ছিরিপুর' 'বেওনা ফুল', দাঁচী'), উপমা রূপকাদির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি লক্ষ করতে পারি।

৩। বিশ্বাস-অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য ঃ

বহুবিচিত্র লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকপ্রথা, লোকাচার, লোক-উৎসব, লোক-অনুষ্ঠান, লোক-চিকিৎসা প্রভৃতি এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বাংলার লোকসমাজের সুপ্রাচীন বহুবিধ বিশ্বাস-সংস্কার লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যাবে, অধিকাংশ বিশ্বাস-সংস্কারের মূলে ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যাদুবিদ্যার প্রভাবও প্রায় সমপরিমাণে সক্রিয়। যাদুবিদ্যার প্রভাব শুধু বাংলার লোকসমাজেই প্রতিফলিত নয়, তা বিশ্বজনীন। নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে তো বটেই, শারীরিক সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখতেও লোকসমাজে যাদু-ক্রিয়ার কার্যকারিতা স্বীকৃত।

৩। (১) **লোকবিশ্বাস (Folk belief)** : মানবসমাজের আদিম স্তরে বিশ্ব-জগতের অনেক কিছুই মানুষের বোধাতীত ছিল। সৃষ্টি-রহস্যের কার্যকারণ-সম্পর্ক ছিল অজ্ঞাত। স্বভাবতই প্রাচীনকালের মানুষেরা সহজাত কল্পনার বলে বিশ্বসৃষ্টির নানা ব্যাপারে মন-গড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় নিল।

নানাবিধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে বহুবিচিত্র সংস্কারের স্মরস্থ হ'ল। ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে বহুবিধ বিশ্বাস-সংস্কারের অনুগত হ'ল। এ সমস্ত বিশ্বাস-সংস্কার কালক্রমে লোকঐতিহ্যে পরিণত হল।

লোকবিশ্বাস মূলত দুই শ্রেণীর,—শুভ-আশ্রয়ী ও অশুভ-আশ্রয়ী। নানা জীবজন্তু, প্রকৃতিজগত, অতি-প্রাকৃত জগত, গৃহস্থালী দ্রব্য, দেবদেবী ও মানুষকে আশ্রয় করে এসব শুভাশুভ বিশ্বাস-সংস্কার বিশ্বের সর্বত্রই প্রচলিত। যেমন, বিশেষ বর্ণের পেঁচা বাংলার লোকসমাজে অশুভ বলে বিশ্বাস করা হয়। এ বিশ্বাসের সঠিক উদ্ভব-কাল নির্ণয় অসম্ভব। আনুমানিক তিন হাজার বছরেরও পূর্বে ঋগ্বেদে এ বিশ্বাসের সমর্থন মেলে।[৪০] আবার শরীরের বিশেষ অঙ্গের স্পন্দন অনুভূত হওয়া শুভ-সূচক বলে লোকবিশ্বাস সুপ্রচলিত। কালিদাসের কালেও যে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ কবির 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এ লভ্য।

৩। (২) লোকসংস্কার (Folk-superstions) : ভাষাতত্ত্বে অপি-নিহিতির পরবর্তী স্তর যেমন অভিশ্রুতি, তেমনই লোকবিশ্বাসের পরবর্তী

স্তর লোকসংস্কার। লোকবিশ্বাস যখন লোকমানসের গণ্ডী অতিক্রম করে বাস্তব ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়, তখন সেই বিশ্বাস-সম্ভূত ক্রিয়াই 'লোকসংস্কার' নামে অভিহিত হয়। লোকসংস্কারের মূলে অশুভ শক্তির প্রকোপ থেকে মুক্তির প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে Herskovits-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'They are practices that are followed without conviction but with an uneasy feeling that it will do no harm to carry them out, if by chance we thus get on the good side of powers whose existence we may at times doubt.'[৪১]

লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে যাদুবিদ্যার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস থেকেই এই যাদুবিদ্যা-সংশ্লিষ্ট সংস্কারের উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন।[৪২]

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের ভেদরেখাটি অনেক সময়েই এত সূক্ষ্ম যে, এদের প্রভেদ নির্ণয় প্রায়শই দুরূহ হয়ে ওঠে। লোকবিশ্বাস হ'ল মানসিক ব্যাপার, আর লোকসংস্কার হ'ল ব্যবহারিক কার্যকারিতা। যেমন, বাংলার লোকসমাজে অতিপ্রচলিত একটি লোকবিশ্বাস, যাত্রাকালে হাঁচি পড়া অশুভজনক, আর এ বিশ্বাস থেকেই যাত্রাকালে হাঁচি পড়লে সাময়িক ভাবে যাত্রা স্থগিত রাখার লোকসংস্কারের উদ্ভব।

উল্লেখযোগ্য, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার বিশ্বের সমস্ত লোকসমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও এক লোকসমাজের সঙ্গে অন্য লোকসমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য এমন কী বৈপরীত্যও দেখা যায়। অথচ প্রতিটি লোকসমাজই তার পালিত বিশ্বাস-সংস্কারগুলিকে পবিত্র ব্যাপার বলে মনে করে। কিন্তু এক লোকসমাজের কাছে অন্য লোকসমাজের বিশ্বাস-সংস্কার অনেক সময় 'কুসংস্কার' রূপে প্রতিভাত হয়।

৩। (৩) যাদুবিদ্যা (Magic): শুভাশুভ নানা বিশ্বাস-সংস্কার-সম্পৃক্ত লোকজীবনে যাদুবিদ্যার প্রভাব অবিসংবাদিত। শুধু বাংলার লোকসমাজেই নয়, যাদুবিদ্যার প্রভাব বিশ্বজনীন। Stayt-এর মতে যাদুবিদ্যার উৎসমূলে আছে, 'The belief that every object, animate or inanimate possesses a kinetic power for good or evil.'[৪৩]

ধর্মের সঙ্গে যাদুবিদ্যার যোগ আদিকাল থেকেই। আদিমযুগে যাদুক্রিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। একালেও লোক-সমাজের বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠানে যাদুবিদ্যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,—'প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত

শক্তিকে বশ করার আকাঙ্খা থেকেই যাদুর উদ্ভব।....অমঙ্গল ও অশুভের প্রতি মানসিক ভয় আর দুর্বলতা আদিম মানুষকে যাদুনির্ভর করেছে....[৪৪]।

Sir James Frazer যাদুবিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, (১) Imitative (Homoeopathic) (২) Contagious [৪৫] বাংলায় এদের যথাক্রমে 'অনুকরণাত্মক' বা 'সাদৃশ্য ধর্মী' এবং 'সংক্রামক' বলা যায়। শত্রুর প্রতিমূর্তি তৈরী করে তাকে নানা ভাবে আঘাত বা ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় ফ্রেজার Imitative-যাদুর প্রভাব দেখেছিলেন। বলা বাহুল্য, শত্রুর ক্ষতি বা ধ্বংস কামনাই এ প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।

আবার বিশেষ ব্যক্তিকে বশীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিটির চুল, নখ, কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিশেষ মন্ত্রপাঠ বা ক্রিয়ানুষ্ঠান 'সংক্রামক' বা Contagious-যাদুবিদ্যার উদাহরণ।

শুভ-অশুভ বিচারেও যাদুবিদ্যাকে দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হ'ল 'Black magic' অর্থাৎ 'অশুভকর' বা 'কৃষ্ণ' যাদু, আর দ্বিতীয়টি হ'ল, 'White magic' অর্থাৎ 'শুভকর' বা 'শুক্ল' যাদু। এ দুই যাদুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদের মন্তব্য,

'Magic is often divided into' 'Black' and 'White', the first being of evil intent, the second beneficent'.[৪৬]

গর্ভজাত শিশুর সুরক্ষার্থে কিংবা প্রসব-যন্ত্রণা লাঘব করতে গর্ভবতী রমণীকে কেন্দ্র করে নানাবিধ যাদুক্রিয়া 'White magic'-এর নিদর্শন। আবার 'মারণ-উচাটন' ইত্যাদি Black magic-এর দৃষ্টান্ত।

Thurston আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে যাদুবিদ্যাকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। একটি 'তত্ত্বগত যাদুবিদ্যা' (Theoretical) অপরটি 'ফলিত যাদুবিদ্যা'[৪৭] (Applied)।

'প্রাকৃতিক বিধান' অনুযায়ী বিশ্বের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, —এ বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত নানা তত্ত্ব ও পদ্ধতি হ'ল তত্ত্বগত যাদু-বিদ্যা ; আর সেই তত্ত্ব ও পদ্ধতি যখন কার্যত প্রয়োগ করা হয় তখন তারা ফলিত যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিশ্লেষণে দেখা যাবে, যাদুবিদ্যার এই বিবিধ বিভাজন কিন্তু পরস্পর বিরোধী নয়, পরন্তু একে অপরের পরিপূরক।

৩। (৪) লোকপ্রথা (Folk custom) : সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সমাজে

প্রচলিত রীতিবিশেষকে 'প্রথা' বলা যায়। সংহত লোকসমাজেও বিভিন্ন প্রথার প্রচলন আছে। এসব লোকপ্রথার উদ্ভবমূলে অন্যান্য কারণের সঙ্গে সঙ্গে লোকবিশ্বাস ও যাদুবিদ্যার প্রভাব দুর্লক্ষ নয়। যেমন, ব্যক্তির জীবনবৃত্তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ঘটনা জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকসমাজে বিচিত্র প্রথা প্রচলিত।

৩। (৫) লোকাচার (Folk rite) : লোকসমাজে প্রচলিত প্রথাগুলির অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ হ'ল বহুবিচিত্র লোকাচার। যেমন, 'বিবাহ' প্রথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত 'গায়ে-হলুদ', 'বরবরণ', 'বধূবরণের' বিবিধ লোকাচার বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত। অবশ্য লোকসাধারণের দৈনন্দিন জীবনাচরণের সঙ্গে বহুবিচিত্র লোকাচারের প্রথা-নিরপেক্ষ যোগ ও দুর্লক্ষ নয়।

৩। (৬) লোক অনুষ্ঠান (Folk ritual) : লোকসমাজে সুপ্রচলিত আচারগুলির সংশ্লিষ্ট 'ক্রিয়াকর্ম'-কে 'লোকানুষ্ঠান' আখ্যা দেওয়া চলে। বৃহত্তর অর্থে, লোক উৎসবগুলিও লোকানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে সেগুলিকে আমরা পৃথক পর্যায়-ভুক্ত করেছি। লোকসাধারণ কর্তৃক পালিত এইসব লোকানুষ্ঠানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম ও যাদুবিশ্বাস প্রভাবিত।

৩। (৭) লোক উৎসব (Folk festival) : লোকসমাজে উৎসবের বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। লোক উৎসবগুলিতে লোকসমাজের সংহত রূপটি প্রতিভাত হয়। লোকঐতিহ্যের এ পর্যায়েও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভূমিকা সর্বাধিক সক্রিয়। লোকাচার ও লোকউৎসব লোকসমাজের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাই লোকসমাজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এগুলিতে ধরা পড়েছে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে, এসব উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে লোকসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপকাবরণে বিধৃত। এ কারণেই লোকসমাজে প্রচলিত উৎসবগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিরন্ন কৃষকদের শস্য-ব্যাকুলতা আভাসিত হয়েছে। এছাড়া এসব উৎসবানুষ্ঠানের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। এগুলি দৈনন্দিন শ্রমভারে ন্যুব্জ, দারিদ্র-ক্লিষ্ট লোকসাধারণের মানস-মুক্তির উৎস।

লৌকিক আচার-উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—(১) জীবনবৃত্ত-কেন্দ্রিক ও (২) বর্ষবৃত্ত-কেন্দ্রিক।

৩। (৭) (১) জীবন বৃত্ত-কেন্দ্রিক লোক উৎসবাদি : মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু যেন একটি বৃত্তেরই পূর্ণ রূপ। জন্ম থেকে যে পথ চলা

শুরু হয়, তা বিবাহ, সন্তানোৎপাদনাদির মধ্য দিয়ে মৃত্যুতে এসে সমাপ্তি লাভ করে। মানুষ মারা যায়, কিন্তু জীবনের স্রোতোধারা চিরপ্রবহমান।

সন্তান-লাভের প্রক্রিয়ায় যেমন জৈব কামনা বিদ্যমান, তেমনি একই সঙ্গে সেখানে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার তাগিদও লক্ষণীয়। সন্তানের গর্ভাগমন থেকে শুরু করে তার জন্মের পরেও বহুবিধ লোকাচার ও লোকানুষ্ঠান সুপ্রচলিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ শ্রেণীর কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের বাস্তব উপোযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু লোকসমাজ সম্পূর্ণ ভিন্নতর বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব অনুষ্ঠানাদি পালন করে। যেমন, গর্ভবতী নারীকে কেন্দ্র করে সাধ-ভক্ষণের রীতিটির বাস্তব উপ-যোগিতা আছে। শারীর-বিদ্যা অনুসারে গর্ভের সাত মাস কাল শিশুর পূর্ণতার তৃতীয় ও শেষ স্তর। এসময় শিশুর ও জননীর শারীরিক পুষ্টির অত্যন্ত প্রয়োজন। সেদিক থেকে সন্তানবতী নারীর 'সাধ' অনুসারে তাকে নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য-খাওয়ানোর অনুষ্ঠানের সার্থকতা আছে। লোকসমাজ অবশ্য একটি বিশেষ লোকবিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে এ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। লোকবিশ্বাসটি হ'ল, গর্ভবতীর সাধ পূর্ণ না হলে সন্তান লোভী ও অসংযমী হয়। উল্লেখযোগ্য, ন' মাস কালেও গর্ভবতী নারীকে কেন্দ্র করে 'সাধভক্ষণ' অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। এরকমই 'ষষ্ঠীপূজা', 'অন্নপ্রাশন', বিবাহাদি প্রভৃতি জীবন-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত।

জীবন-বৃত্ত-ভুক্ত আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে যাদুবিদ্যার অমোঘ প্রভাব লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বিবাহ-সংক্রান্ত একটি লোকাচারের উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বিবাহানুষ্ঠানে প্রযুক্ত 'চোর-পানি' ('চুরপানি') নামক জল-তোলার একটি স্ত্রী-আচারে দেখি, জলের উপর পুরুষ কর্তৃক কোনো লৌহাস্ত্র দিয়ে যোগচিহ্ন এঁকে অপদেবতা দূরীকরণের পর সধবা নারী কর্তৃক সেই জল পাত্রে ভরে নেওয়া হয়।[৪৮] অপদেবতা দূরীকরণের প্রক্রিয়াটি স্পষ্টতই যাদুবিদ্যার প্রভাব প্রসূত।

৩। (৭) [২] বর্ষবৃত্ত-কেন্দ্রিক লোকউৎসব—অনুষ্ঠান : বাংলার বারো মাসে অজস্র পার্বণের মেলা বাঙালীর আনন্দমুখিনতারই পরিচায়ক। কর্ম-ক্লান্ত জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্খায় বাংলার লোকসাধারণ পুরুষানুক্রমে আজও এসব উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে চলেছে। আগেই বলেছি, লোকউৎসবগুলি লোকসমাজের সংহতির পরিচায়ক। বছরের বিশেষ

বিশেষ দিনে উৎসব উপলক্ষে লোকসাধারণ উৎসব প্রাঙ্গণে সম্মিলিত হয়। এর ফলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটি সুদৃঢ় হয়।

বাংলার লোকসমাজে প্রতি বছরই চক্রাবর্তনসূত্রে বছরের প্রথম দিনের 'নববর্ষ' উৎসব থেকে বছরের শেষ দিনে চৈত্র-সংক্রান্তির 'গাজন' উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে। এর মধ্যকাল পর্বে আছে, 'রথযাত্রা', 'মনসা-পুজা', 'পাট পুজা', 'দোল', 'নবান্ন প্রভৃতি অজস্র লোকউৎসব।

উল্লেখযোগ্য, বাংলার লোকসমাজের উৎসব-অনুষ্ঠানের সবগুলিই কিন্তু 'জাতীয় উৎসব' নয়। এর কারণ, বাংলার মিশ্র সংস্কৃতি। বাংলার লোকসমাজ অঞ্চলগত ও সম্প্রদায়গত নানাভাবে বিভক্ত। স্বভাবতই লোকসংস্কৃতিও তার প্রভাবপুষ্ট। বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত লোক-উৎসবগুলির সুদীর্ঘ তালিকায় উক্ত মন্তব্যের সমর্থন মেলে।

বাংলার স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত অজস্র ব্রতানুষ্ঠানও আলোচ্য পর্যায়-ভুক্ত। পার্থিব মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনায় এসব ব্রতানুষ্ঠান হয়ে থাকে। কুমারীরা মনের মত স্বামী লাভের উদ্দেশ্যে, বিবাহিতা রমণীরা স্বামীর ও সন্তানের শুভ কামনায় নানা ধরণের ব্রতানুষ্ঠান পালন করেন। এ সমস্ত ব্রতপালনের মূলে ধর্মীয় বিশ্বাস ক্রিয়াশীল। ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানে স্ত্রী-সমাজের শিল্প-কুশলতা, সৌন্দর্য ও শুচিতা বোধের পরিচয়ও বিদ্যমান। ব্রতের আলপনায় এই শিল্প কুশলতা ও সৌন্দর্যবোধের সাক্ষাৎ মেলে। বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত ব্রতগুলির মধ্যে 'পুণ্যিপুকুর', 'ভাঁজো', 'সেঁজুতি', 'ইতু', 'নাটাই', 'তুষু, 'মাঘমণ্ডল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বর্ষবৃত্তানুসারী লোকউৎসবগুলিতেও যাদুবিদ্যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তা উৎসব-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। বিষ্ণুপুরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত 'মনসার ঝাঁপান -এ জ্যান্ত সাপের মিছিল[৪৯] লোক-উৎসবে যাদুক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব-প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত ; আবার 'পুণ্যি-পুকুর' ব্রতের বৃষ্টি-আনয়নের জন্য উঠোনে ছোট গর্ত খুঁড়ে তুলসী অথবা বেল-ডাল পুঁতে পূর্বমুখী হয়ে মন্ত্র সহযোগে জল-ঢালার লোকাচারটিতে Sympathetic magic -এর প্রভাব লক্ষণীয়।

৩. (৮) লোকচিকিৎসা (Folk medicine) : চিকিৎসা-ব্যাপারে লোকসমাজ বহুক্ষেত্রে ঐতিহ্যানুসারী। কোনো কোনো লোকচিকিৎসা যাদুবিদ্যা-নির্ভর। আবার কোনো কোনো স্থলে দ্রব্যগুণের কার্যকারিতাও অনস্বীকার্য। সুতরাং লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি বস্তুনির্ভর, অন্যটি যাদুনির্ভর। প্রথমটির উপাদান,

মূলত তৃণগুল্মাদি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত পারিপার্শ্বিক জগত থেকে বস্তু-সহায়তায় গড়ে ওঠা লোকচিকিৎসার এ পদ্ধতিই পরবর্তী-কালের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার সূতিকাগার।

বস্তুনির্ভর লোকচিকিৎসার দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাশির জন্য আদার রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খাওয়া, অজীর্ণ রোগের জন্য রোজ সকালে আখের গুড়ের সঙ্গে পোড়া বেল খাওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ লোক-ঔষধের নাম করা যায়।

পাশাপাশি, আর এক প্রকার লৌকিক চিকিৎসা-পদ্ধতি লোকসমাজে প্রচলিত, যাতে প্রত্যক্ষত কোনো ওষুধের ব্যবহার নেই। এগুলি যাদু-ক্রিয়া-নির্ভর। Alan Dundes -এর ভাষায় এগুলি 'Occult' নামে অভিহিত।[৫০] এ শ্রেণীর লৌকিক চিকিৎসায় জীবজন্তুর নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাটি, লোহা ইত্যাদি বিচিত্র বস্তুর রহস্যময় ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন, জলপড়া, চালপড়া, ধুলোপড়া প্রভৃতি। এগুলির সঙ্গে যাদু-ক্রিয়ামূলক মন্ত্রের যোগ অপরিহার্য।

৪। অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিক লোক ঐতিহ্য ঃ

সবাক মানুষ আনন্দ-উপভোগের উদ্দেশ্যে ও কখনও কখনও বক্তব্য পরিস্ফুটনে শুধু বাক নয়, অঙ্গ-ভঙ্গিকেও আশ্রয় করে। লোকনৃত্য এর সেরা উদাহরণ, যা লোকসমাজের শিল্প সঞ্চয়েরও[৫১] অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়া, মনের ভাব-প্রকাশক কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ-ভঙ্গিও এই পর্যায়ভুক্ত।

৪। (১) **লোকনৃত্য ঃ** আদিম যুগ থেকেই নৃত্যে মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত। তবে আদিম যুগের নৃত্যের সঙ্গে লোকনৃত্যের ও ধ্রুপদীনৃত্যের বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। সেদিক থেকে আদিম নৃত্য (Primitive Dance) ও নাগরিক নৃত্যের (Civilised Dance) মধ্য-বর্তী স্তরে লোকনৃত্যকে স্থাপন করা যায়। এ প্রসঙ্গে 'The wonderful world of Dance' গ্রন্থে Haskell-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে— 'The distinction is that primitive dance is communal and segregrated by sex whereas folk dance is characterized by couples dancing with partners of the opposite sex'.

আবার অভিধানে বলা হয়েছে,—

Folk dance is communal reaction in movement patterns to life's crucial cycles'.[৫২]

বাংলার লোকনৃত্যে নারী-পুরুষের জুড়ি অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলবদ্ধ নৃত্যই দেখা যায়। এখানে নাগরিক নৃত্যের পরিশীলিত শাস্ত্রানুগ ধ্রুপদী কৌশল প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। একই সঙ্গে আদিম নৃত্যের উদ্দামতাও এখানে পরিলক্ষিত হয় না। সহজ প্রাণের সরল স্বাভাবিক ছন্দই লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য।

বাংলার লোকনৃত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চোখে পড়ে। কোনো কোনো লোকনৃত্যের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ঘটে থাকে। যেমন, 'বাউল' নাচে একতারা, 'কীর্তন' নাচে খোল-করতাল, ইত্যাদি। কয়েকটি ক্ষেত্রে 'হাততালি' বাদ্যযন্ত্রের স্থান গ্রহণ করে। যেমন, 'জারি' বা 'ডালা' নৃত্য।

কোনো কোনো লোকনৃত্য নাট্য-উপাদান সমন্বিত। প্রকৃতি, পুরাণ ও বাস্তব জগতের নানা ঘটনার অনুকরণ লোকনৃত্যে লভ্য। যে কোন দেশের লোকনৃত্য সম্বন্ধেই এ সত্য প্রযোজ্য। ইটালিয়ান লোকনৃত্য 'Tarantulla', দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার 'Hopi'-দের 'সর্পনৃত্য' ইত্যাদি তার নিদর্শন। বাংলার 'মেছেনী', 'রায়বেঁশে', 'বুড়োবুড়ি', 'ছৌ' প্রভৃতি লোকনৃত্য প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য।

লোকনৃত্য ও ধর্ম ও যাদুবিদ্যার প্রভাব-সমন্বিত। প্রকৃতপক্ষে, লোকনৃত্যগুলি মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই উদ্‌ভূত ও পরিবেশিত। পরবর্তীকালে কোনো কোনো লোকনৃত্য অবশ্য ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্র লাভ করেছে। কোনো কোনো লোকনৃত্য আবার কৌতুকরসাত্মক।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলার লোকনৃত্যে বাংলার লোকসাধা-রণের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের অনুকৃতি জীবনের বস্তুরূপ ও শিল্পরূপের সমন্বয় ঘটিয়েছে।

৪। (২) অন্যান্য অঙ্গভঙ্গি : শারীরিক নানা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি অবলম্বনেও লোকসাধারণ মনের নানা বিচিত্র ভাব প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রেও তার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। যেমন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বা প্রার্থনার শারীরিক ভঙ্গিটি এক এক লোকসমাজে এক এক রকম।

৫। ক্রীড়া-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্য :

শরীরচর্চা ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বের সর্বত্রই খেলাধুলা প্রচলিত। যে কোনো সমাজেই খেলাধুলার উপযোগিতা ও আবেদন

সর্বজনস্বীকৃত। শিশুর জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষজ্ঞের মতে, 'It contributes substantially to physical, social and psychological growth and development of the individual.'[৫৩]

যথার্থই, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিক থেকে শিশুকে বলিষ্ঠভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

শুধু শরীর-মনের বিকাশের ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় চরিত্র গঠনেও খেলাধুলা অপরিহার্য। খেলাধুলায় জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলনও ঘটে। এ সত্য প্রথম উপলব্ধি করেন Joseph Strutt. বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত খেলাগুলি সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।

লৌকিক ক্রীড়াগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, 'আদিমতার স্বীকরণ'। অর্থাৎ, লোকসমাজে প্রচলিত খেলাগুলিতে আদিম সমাজের বাস্তব চিত্র প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। সুদূর অতীতে একদিন যা ছিল জীবিকা, আত্মরক্ষার-উপায়, কালের বিবর্তনে তার ব্যবহারিক মূল্য প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু এতদিনের সম্পর্ক সহজে ছিন্ন করা যায় না। ফলত, জীবনযাপনের নিত্যপ্রয়োজনীয়ের তালিকা থেকে পরিত্যক্ত হয়েও সেই সব জীবিকাদি অবসর যাপনের কিংবা শিশুর খেলায় রূপান্তরিত হল। যেমন, 'কুমীর-ডাঙ্গা' খেলাটি বিপদসঙ্কুল জীবন-যাপনের ঐতিহ্যবাহী। আবার, 'হাডুডু' খেলায় আদিম মানবগোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সংঘাত ও সংগ্রামী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। লৌকিক ক্রীড়ার জগতেও লোকসাধারণের ধর্ম ও যাদুবিশ্বাস প্রভাব-সঞ্চারী। বাংলার লোকসমাজে বহু ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে নানাবিধ ক্রীড়ার প্রচলন আছে। যেমন, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাতে 'কড়ি খেলা', ঈদ উপলক্ষে 'চামড়ি', প্রভৃতি। যাদুবিদ্যার প্রভাবের নিদর্শন-স্বরূপ 'কাদামাটি'[৫৪] নামক লৌকিক ক্রীড়াটি উল্লেখযোগ্য। অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি-কামনায় কাদামাটি মেখে গড়াগড়ি খাওয়া বস্তুত পক্ষে যাদুবিশ্বাসেরই নিদর্শন।

কয়েকটি খেলায় নাটকীয় উপাদানের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে ডঃ মানস মজুমদার 'গাছতুয়া গাছহুয়া' খেলার উল্লেখ করেছেন।[৫৫] ছড়া ভিত্তিক আরো কোনো কোনো খেলায় অনুরূপ উপাদান মেলে। যেমন, 'চাষী ও চাষী-বৌ', 'বুড়ো-বুড়ি' খেলা প্রভৃতি।

লৌকিক ক্রীড়াগুলির শ্রেণী বিভাগ-করণেও মতানৈক্য বিদ্যমান। তবে স্থানগত বিচারে লৌকিক ক্রীড়াগুলিকে মূলত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, (১) গৃহ-আশ্রয়ী (indoor) ও (২) বহির্মুখী (outdoor)

'আগডুম-বাগডুম', 'বাঘবন্দী', 'ঘোলঘুঁটি', 'কড়ি', প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ, 'হাডুডু', 'এক্কা-দোক্কা', 'কানামাছি', 'লুকোচুরি', 'লাঠি' ইত্যাদি।

৬। শিল্পবস্তু-কেন্দ্রিক লোক ঐতিহ্য ঃ

নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু আশ্রয়ে লোকসাধারণের শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার মধ্যেও শিল্প-সৃষ্টির এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

লৌকিক শিল্পবস্তুর উদ্ভবের পেছনে প্রয়োজন ও সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে ধর্ম ও যাদুবিশ্বাসের প্রভাব বিদ্যমান। যেমন, নদীমাতৃক বাংলার প্রধান লোকযান 'নৌকা'-র গলুই নির্মাণে বিভিন্ন পশুপাখির যে রূপ অনুকৃত হয়, তার মূলে যাদুর প্রভাব সক্রিয়।[৩৬] অতীতকালে বিনিময়-মাধ্যম হিসাবে কড়ি-র ব্যবহার ছিল। লোকসমাজে কড়ি তাই ঐশ্বর্যের প্রতীক। ঐশ্বর্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে কড়ির এই ধর্মবিশ্বাসগত যোগটুকু চোখে পড়ে 'কড়ির ঝাঁপিতে'।

বেত, বাঁশ, শোলা, কাঠ, মাটি, কাঁসা, পেতল নির্মিত বহুবিধ বস্তু-আশ্রয়ে লোকসমাজের শিল্প-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের ভাণ্ডারটি সুসমৃদ্ধ। ব্যবহারিক গুরুত্ববিচারে শিল্পবস্তুগুলিকে আমরা দুটি শ্রেণীতে চিহ্নিত করতে পারি, (১) নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পবস্তু, (২) মনোরঞ্জনী শিল্পবস্তু।

৬। (১) নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পবস্তু : দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নানা বস্তুকে কেন্দ্র করে শিল্পসৃষ্টিই ঐ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। যেমন—বাংলার সুবিখ্যাত নকশী কাঁথা, আসন, নানা তৈজসপত্র, ময়ূর-পঙ্খী নৌকাদি, বিচিত্র কারুকার্য খচিত পালক, ইত্যাদি।

৬। (২) মনোরঞ্জনী শিল্পবস্তু : এ শ্রেণীর শিল্পবস্তুর সঙ্গে নিত্য-প্রয়োজনীয়তার তেমন যোগ নেই। নানা উৎসব, ক্রীড়া কিংবা শুধুমাত্র গৃহসজ্জাকরনের উদ্দেশ্যেই এগুলির সৃষ্টি। যেমন, বাঁশ, কড়ি, মাটির ফুলদানি, কড়ির ফুল, মালা, কাঠ বা মাটির পুতুল ইত্যাদি।

৭। লিখন বা অঙ্কন-কেন্দ্রিক লোক ঐতিহ্য ঃ

লোকসাধারণের বাস্তব ও সৌন্দর্য চেতনার অপূর্ব প্রতিফলন ঘটেছে অঙ্কন-কেন্দ্রিক সৃষ্টিতে। উৎসব-অনুষ্ঠান-সম্পৃক্ত বহু লোকাচারের সঙ্গেও

এগুলির সম্পর্ক রয়েছে। এখানেও ধর্ম ও যাদুবিশ্বাস ব্যাপক প্রভাব-সঞ্চারী। নানাবিধ প্রতীকের ব্যবহারে তার প্রমাণ পাই। লোকসমাজে সুপরিচিত 'মোটিফ' (Motif) এর ব্যবহার প্রাচুর্যও এখানে চোখে পড়ে।

দেওয়াল, পট, ঘট, সরা, পাখা, পিঁড়ে, এমন কি ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বহু বিচিত্র চিত্রাঙ্কন রীতি লোকসমাজে সুপ্রচলিত। এছাড়া ব্রত বা উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে আলপনা দেওয়া হয়, তা অঙ্কন-কে ক লোকঐতিহ্যেরই নিদর্শন।

পশু-পাখি, মাছ, গাছ, ফুল-ফল-পাতাযুক্ত বিচিত্র নকশাই শুধু নয়; ধর্মীয় বা পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীও অঙ্কন-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

শিল্প-উপাদান বাংলার লোকসমাজে চালের পিটুলি, তেল-সিঁদুর, হলুদ-বাটা, আটা, চন্দন, মেহেদী, গোবরগোলা জল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অঙ্কন-ব্যাপারে তুলির সাহায্য যেমন নেওয়া হয়, তেমনি তুলির অভাবে হাতের আঙুল দিয়ে কিংবা কঞ্চির আগায় তুলো বা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে অঙ্কন কর্ম সম্পাদিত হয়।

অঙ্কন-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যে লোকসমাজের শিল্পচেতনাই শুধু নয়, লোকসমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও অবরুদ্ধ মানসলোকের অস্পষ্ট রূপরেখাও মেলে। বলা বাহুল্য, এদিক থেকে 'পটচিত্র' বা 'সরাচিত্র' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সুপরিচিত পুরাণ-কথা ও সমাজ-প্রসঙ্গ যুগপৎ পটচিত্রে স্থানপ্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য, আধুনিক চিত্রকলায়ও 'পটচিত্র' ও সরাচিত্রে'-র প্রভাব লক্ষণীয়।

সাহিত্য ও লোকঐতিহ্য :

১। বস্তুকেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি ঃ

'রামায়ণ'-এর (আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে লিখিত)[৩৭] 'বালকাণ্ডে' বশিষ্ঠের আশ্রমে বিশ্বামিত্র সসৈন্য আতিথ্য গ্রহণ করলে কামদা শবলা বশিষ্ঠের নির্দেশানুসারে বিভিন্ন সুস্বাদু ভক্ষ্য সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে 'দই', 'পায়েস' প্রভৃতি লভ্য। Chaucer-এর (১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ 'Canterbury Tales' (রচনাকাল, আনুমানিক ১৩৮৭-৮৮ খ্রীঃ)-এ বিভিন্ন চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুটনে বস্তু-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের নানাবিধ উপাদান

ব্যবহৃত হয়েছে। E. Hemingway-র (১৮৯৯–১৯৬১ খ্রীঃ) The Old Man and the Sea',' (১৯৫২ খ্রীঃ) উপন্যাসে বুড়ো Santiago-র জীবন সংগ্রামের নিত্য সঙ্গী লোকযান নৌকা-র বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষণীয়। Mathew Arnold--এর (১৮২২--৮৮ খ্রীঃ) Thyrsis (New poems ১৮৬৯ খ্রীঃ) কবিতায় Cicilian রাখালের বর্ণনায় 'বাঁশি' প্রযুক্ত।

২। বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুসৃতি ঃ

জীবন ও জগত সম্পর্কে লোকসমাজের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা লিখিত সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্যক্তি-চরিত্র ও পরিবেশ-পরিস্ফুটনে এবং শিল্প-সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বের সব দেশের 'নাগরিক-সাহিত্যে' প্রবাদ অ-দৃষ্ট নয়। বহুবিচিত্র লৌকিক প্রবাদগুলির অন্তর্নিহিত চিরন্তন বাণীই এর কারণ।

Herodotus (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতক) এর "History" তে যুদ্ধেবিজয়ী Themistocles পরাজিত Andrián-দের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবী করে বলেছে, Athenian-দের প্রতি দুজন দেবতা অত্যন্ত অনুকূল। এরা হ'ল 'Persuation and Necessity' দুই গুণবাচক বিশেষ্যের দেবতায় পরিণতির মূলে আছে প্রচলিত লোকপ্রবাদটি,—'The two great gods, persuation and necessity.' তারও পূর্বে ঋগ্বেদ, বাইবেল প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রবাদের উল্লেখ মেলে। Shakespeare--এর (১৫৬৪--১৬১৬) বহু নাটকে যেমন বিচিত্র লৌকিক প্রবাদ গৃহীত হয়েছে, তেমনি তাঁর রচিত বহু পংক্তিও কালক্রমে লোকারণ্যে প্রবাদে পরিণত। তাঁর 'Merchant of Venice'-এ (১৫৯৭) Bassanio-এর সঠিক বাক্সো-নির্বাচন কালে একটি অতি জনপ্রিয় লোকপ্রবাদ প্রযুক্ত,— All that glitters is not gold উল্লেখযোগ্য, প্রবাদটির মূল রূপটি এখানে সামান্য পরিবর্তিত। Shakespeare মূল রূপটিই গ্রহণ করে-ছিলেন। সেখানে 'glitter' এর স্থানে ছিল 'glister'। জনপ্রিয় অভিনেতা Garric-এর 'glitter' উচ্চারণই কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'Hamlet' (১৬০০)-এ Rosencrantz-এর প্রতি Hamlet একটি লৌকিক প্রবাদের মাধ্যমে দর্শক বা পাঠকের কাছে প্রগল্‌ভোক্তজনের চরিত্রটি পরিস্ফুট করেছে এই বলে,—'..a knavish speech sleeps in foolish ear.' (IV/II/25),[৫৮] ; Charles Dickens-এর (১৮১২--১৮৭০ খ্রীঃ)

রচনাতেও একাধিক প্রবাদ-প্রয়োগের নিদর্শন মেলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'The Pickwick Papers'এ (১৮৩৬--৩৭) Sam Weller-এর একটি প্রবাদমূলক সংলাপ উল্লেখ করা যায়,--'Everyone is to his own taste, as the old woman said when she kissed the cow.'

প্রসঙ্গত Cervantes-এর (১৫৪৭—১৬১৬ খ্রীঃ) Don Quixote (১৬০৫—১৫) স্মরণীয়। এখানে Sancho Panza কথিত প্রতিটি গল্প একটি করে প্রবাদ সহযোগে শুরু হয়েছে।

বিশ্বের নানা দেশের সাহিত্যের নানা স্থানে ধাঁধা-ধর্মিতার অনুস্থিতি লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক ধাঁধাও সেখানে গৃহীত। সুপ্রাচীন কাল থেকেই শাস্ত্র ও সাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহার দেখা যায়। নিদর্শন স্বরূপ, ঋগ্বেদে প্রযুক্ত ধাঁধাগুলি (১-১৬৪, ৮-২৯) স্মরণীয়; 'Bible'-এর Old Testament-এর চতুর্দশ অধ্যায়ে একাধিক ধাঁধার উল্লেখ মেলে। 'মহাভারতে' (আনুমানিক ৩০০—২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে লিখিত)[৫৯] যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে ধর্মরূপী বকের প্রশ্নগুলিতে ধাঁধাধর্মিতা লক্ষণীয়, উল্লেখ্য, ধাঁধার শর্তারোপের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও এখানে গৃহীত (ধর্মরূপী বকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান করায় সহদেব-নকুল-অর্জুন-ভীমের মৃত্যু হয়েছে, আর জলপানের পূর্বে যুধিষ্ঠির প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে ধর্মের আশীর্বাদ লাভ করেছেন)। সংস্কৃত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর ধাঁধার প্রভাব স্বীকৃত। Shakespeare-এর 'The Merchant of Venice'-এ Portia লাভের প্রতিযোগিতায় ধাঁধার প্রভাব সক্রিয়। Goethe-র (১৭৪৯—১৮৩২) 'Faust' এ (১ম ও ২য় ভাগ যথাক্রমে ১৮০৮ ও ১৮৩২ খ্রীঃ-তে প্রকাশিত) Mephistopheles প্রদত্ত 'Golden Key'-র বৈশিষ্ট্য বর্ণণায় ধাঁধার প্রভাব স্পষ্ট।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই লিখিত সাহিত্যে লোককথার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'Illiad' (আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে লিখিত)[৬০] 'Odyssey'--(ঐ)[৬১] এবং 'মহাভারত-রামায়ণ' (আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে লিখিত)--এই চারটি আদি মহাকাব্যেরই ভিত্তিমূল লোককথা। প্রকৃতপক্ষে এগুলি লোকসমাজে সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত অজস্র লোক কথার সুষ্ঠু সামঞ্জস্যপূর্ণ সাহিত্যিক সংকলন। এই মহাকাব্যগুলিতে এমন অনেক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, যেগুলির কোনো কোনোটি বর্তমানেও স্বতন্ত্রভাবে লোকসমাজে সুপ্রচলিত। 'Odyssey'-র অন্তর্ভুক্ত 'Aeolus and his bag of winds', 'The Lotus-Eater', 'The visit of

the underworld', 'The Sirens', প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। Odyssey-র প্রায় ২২০০ পংক্তি জুড়ে এসব লোককথা মহাকাব্যিক মাত্রা লাভ করেছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে এগুলির সংযোজনে সংকলকদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব উপাখ্যান কাব্যের ভার-স্বরূপ হয়ে ওঠে নি; বলা বাহুল্য, মূল কাহিনীটিও লোকঐতিহ্য থেকেই গৃহীত।

অনুমান, 'রামায়ণ-মহাভারত'-এর কাহিনীও লিখিত হবার আগেই মৌখিক রূপে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে Winternitz-এর উক্তিটি স্মরণীয়,—

'Probably the Ramayana like Mahabharata only received a more or less, definite form when it was written down.[৬২]

এক সময় টিউটনিক-রা উত্তর জার্মানী ও স্ক্যান্দিনেভিয়ায় একত্রে বসবাস করত। তাদের সমাজে প্রচলিত লোককথা তথা লোকঐতিহ্যের প্রভাব Bewolf-এ (৬৭৫-৭২৫ খ্রীঃ) লক্ষণীয়। 'আরব্য রজনী', 'ঈশপের গল্প' সংস্কৃত সাহিত্যের 'কথাসরিৎ-সাগর', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'পঞ্চতন্ত্র' 'শুকসপ্ততি', 'জাতক কথা'-র অধিকাংশ কাহিনী-সংকলনে লোককথা গৃহীত। প্রাচীন হিব্রু লোকপুরাণের বহু কাহিনী Bible-এর Old Testament-এ লভ্য। শুধু তাই নয়, এই হিব্রু লোকপুরাণের সৃষ্টি-সংক্রান্ত আদিম মানব-মানবীর স্বর্গচ্যুতির কাহিনীকে এক অনন্য মাত্রা দান করলেন Milton (১৬০৮—১৬৭৪ খ্রীঃ)। তাঁর 'Paradise Lost'-এ (১৬৫৮—১৬৫৫)। Bible-এর ' Book of Genesis'-এ সন্নিবিষ্ট মাত্র কয়েক পাতার কাহিনীকে Milton তাঁর ধ্রুপদী ভঙ্গিমায় ১২টি সর্গে, ১০,০০০-এরও বেশী পংক্তিতে মহাকাব্যিক মাত্রা দান করেছেন। বৃহত্তর মানবচেতনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ Milton লোকসমাজের আশাহত মানসের বিলাপকে এ কাব্যে সার্বজনীন করে তুলেছেন, লোকপুরাকথারই আশ্রয়ে।

মধ্যযুগে প্রচলিত বহু লোককথা Chaucer-এর (১৩৪০—১৪০০ খ্রীঃ) The Canterbury Tales', (আনুমানিক, ১৩৮৭—৮৮ খ্রীঃ)-এ সন্নিবিষ্ট। নিদর্শন স্বরূপ, Knight কথিত প্রেমকাহিনী, Monk-এর জীবন কাহিনী, Straparola, Bessily প্রমুখের কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

রোমান্টিক যুগের কবিরাও লোকপুরাকথার প্রয়োগে কবিতায় নবতর মাত্রা যোজনা করেছেন।[৬৩] William Blake (১৭৫৭-১৮২৭ খ্রীঃ)-এর

'The Book of Urizen-এ (১৭৯৪ খ্রীঃ) সৃষ্টি-সংক্রান্ত পুরাকথার এক রহস্যময় রাজ্যের সন্ধান মেলে। Shelley-র (১৭৯২—১৮২২ খ্রীঃ) Myth-প্রিয়তা ইংরাজী সাহিত্যে সুবিখ্যাত। Romantic যুগের কবিদের মধ্যে কবিতায় পুরাণ প্রয়োগে তাঁরই সাফল্য সর্বাধিক। মানবপ্রেমের জয়গানে উদ্দীপ্ত Shelley-র 'Prometheus Unbound' (১৮১৯ খ্রীঃ)-এ সৃষ্টি-সংক্রান্ত লোককথার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। তবে এ প্রভাব পরোক্ষ, কারণ Shelley প্রত্যক্ষত, ঈস্কাইলাস-এর নাটক থেকেই তাঁর Prometheus কে নির্বাচন করেন। এছাড়া মেঘ, সূর্য প্রভৃতি প্রকৃতি-বিষয়ক লৌকিক পুরাকথার প্রয়োগে তাঁর বহু কবিতা সমৃদ্ধতর হয়েছে। Victor Hugo-র (১৮০২—১৮৮৫ খ্রীঃ) 'Adam and Eve' কবিতাটির বিষয় ও বর্ণনাতেও বিশ্ব-সৃষ্টি-সংক্রান্ত লোককথার সাক্ষাৎ মেলে। আবার Publo Neruda-র (১৯০৪—১৯৭৩ খ্রীঃ) 'Apogee of Celery কবিতায় শক্তি-সৃষ্টি-সংক্রান্ত স্পেনীয় লোককথা গৃহীত।

রূপকথার প্রভাবও আলোচ্য সাহিত্যে লক্ষণীয়। Shakespeare-এর A Midsummer Night's Dream (১৫৯৫ খ্রীঃ)-এ রূপকথার কল্প-রাজ্যের আধিপত্য। এ নাটকের Oberon, Titania, Cobweb, Moth, Mustard-seed প্রমুখ চরিত্রগুলি যেন পরীর দেশেরই বাসিন্দা বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে Jonathan Swift--এর 'Gulliver's Travel'-এর (১৭২৬ খ্রীঃ) Liliput, Borbidingman, Laputan ও Whin-whoms-রা স্মরণযোগ্য। রূপকথার রূপকল্পনার মধ্য দিয়ে কবি এখানে বাস্তব সমাজকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। Yeats-এর 'Song of fairies' (১৮৩৫ খ্রীঃ) গ্রন্থের বহু কবিতা Irish রূপকথা অবলম্বনে রচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,—Yeats নিজে আইরিশ রূপকথাগুলিকে দুই খণ্ডে সংকলিত করেন। 'The Celtic Twilight' (১৮৯৩ খ্রীঃ) গ্রন্থটি তাঁর এই লোকঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগের নিদর্শন। আবার Maxim Gorky (১৮৬৮—১৯৩৬ খ্রীঃ) রূপকথার অন্তরে ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। সে ইতিহাস সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখের। তাঁর মতে, রূপকথার অতিরঞ্জনের প্রাবল্যের মধ্যেও 'Flying Carpet' কিংবা 'Seven league Boots প্রভৃতি রূপকথাগুলিতে যথাক্রমে আকাশচারণা ও দ্রুত গমনের মত নানা

মানস-আকাঙ্খা সূচিত হয়েছে। এই মতাদর্শে বিশ্বাসী থেকেই তিনি ইটালীর সাধারণ মানুষের জীবন অবলম্বনে রচিত ছোট গল্পের একটি সংকলনের নাম দেন 'ইটালীর রূপকথা' (১৯০৬—১৯১৩ খ্রীঃ)।

লোকগীতি ও লোকগীতিকার প্রভাবও বহু স্থানে লভ্য। লোকগীতির ধুয়াপদের মত 'On mossy towers/on garden bed/A thousands flowers/their petals shed/In tearful showers/Round your loved head............পংক্তিগুলি Baudlaire--এর (১৮২১-১৮৬৭ খ্রীঃ) 'The Fountain' কবিতায় প্রতি স্তবকান্তে প্রযুক্ত হয়েছে। George Sand-এর (১৮০৪—১৮৭৬ খ্রীঃ) 'Love's choice' কবিতাটিতে গীতিকার সূক্ষ্ম প্রভাব বিদ্যমান। Lorca-র (১৮৯৮-১৯৩৬) 'Romancero Guitano'-য় (১৯২৯ খ্রীঃ) জিপসী-গীতিকার অনুস্মৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'The song of the horseman'-সম্বন্ধেও একথা খাটে। শুধু গীতিকাই নয়, তাঁর কাব্যে Andalusian লোকঐতিহ্যের বিচিত্র প্রভাবও অনস্বীকার্য। Hugh Miller-এর 'My school & school Masters'-এ Emerti-র বর্ণনায় কবি গীতিকার রূপরীতিটি গ্রহণ করেছেন।

৩। বিশ্বাস-অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি ঃ

কুমারী মেয়েদের কেন্দ্র করে ইংলণ্ডের লোকসমাজ ও নাগরিক সমাজ নির্বিশেষে ১৪ই ফেব্রুয়ারী St. Valentine's day নামক লোকউৎসব যে পালন করত, তার বিবরণ Chaucer এর The Parliament of Fowls-এ (১৩৭৭—৮২ খ্রীঃ) মেলে, 'Midsummer Night's Dream'-এ (১৫৯৬ খ্রীঃ) এই লোকউৎসব-সংশ্লিষ্ট লোকাচার ও বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষণীয়। তাঁর 'Twelfth Night'-এ (১৬০০ খ্রীঃ) ৬ই জানুয়ারী বিশেষ ভাবে প্রস্তুত কেকের ভোজের লোকাচারটি গৃহীত। এছাড়া 'Tempest-এ (১৬০০ খ্রীঃ) রয়েছে জনপ্রিয় লোকউৎসব 'Bartholomew Fair'-এর প্রসঙ্গ। 'Hamlet' (১৩০০ খ্রীঃ) নাটকের 'Hamlet'-এর বিষণ্ণতা অদূরবর্তী কালের একটি লোকউৎসবের উল্লেখে ঘোষিত। ঋতুকালীন ধর্মীয় উৎসব 'Hobby-horse' এর আনন্দ মুখরতা স্মরণ করে Hamlet দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

লোকবিশ্বাস-সংস্কারের জগতটিও বিশ্বসাহিত্যে অনুপস্থিত থাকে নি। 'King Henry the Fourth' (Shakespeare) নাটকের ১ম পর্বে Gadshill-এর সংলাপে ইংলণ্ডের প্রচলিত লোকবিশ্বাস প্রতিফলিত

হয়েছে,--'We steal as in a castle, Cocke-sure; we have the receipt of fern-seed, we walk invisible'. (Act II/Scene I-96).** আবার ডস্টয়ভস্কির (১৮২১—১৮৮১ খ্রীঃ) 'Crime and Punishment' (১৮৩৩ খ্রীঃ) উপন্যাসে পাপ-মুক্তির আশায় Raskolnikov-এর বালিশের নীচে 'বাইবেল' রেখে শোওয়া লোকসংস্কার প্রভাবিত।

যাদুবিদ্যার প্রভাব বিশ্বজনীন ও কালজয়ী। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থানে এই প্রভাব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা' গ্রন্থে সংকলিত বহু গল্পে স্পষ্টতই যাদুবিদ্যার মুখ্য ভূমিকা লক্ষণীয়। 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকায়' বিশেষ মুহূর্তে সিংহাসনে উৎকীর্ণ বত্রিশটি পুতুলের কথা বলা তার অন্যতম নিদর্শন।

'হর্ষচরিত'-এ বাণভট্ট (৭ম শতক) একাধিক যাদুবিশ্বাস ও অভিচারের উল্লেখ করেছেন। যেমন, রক্তমাখা চরু দেবতার উদ্দেশে দান, বাঁ দিক দিয়ে হরিণ যাওয়া দুর্লক্ষণ ইত্যাদি, ভূত তাড়াতে সর্ষে ব্যবহারের উল্লেখ 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' (বাণভট্ট) উভয়েই লভ্য।

Shakespeare-এর 'Macbeth' (১৬০৬ খ্রীঃ) নাটকে ডাইনীদের ক্রিয়াকর্মে রহস্যময় যাদুক্রিয়ার প্রভাব লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, এখানে ডাইনীরা সমগ্র কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে পরোক্ষ নিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। Milton-এর 'Samson Agonistes'-এর (১৬৭১ খ্রীঃ) Samson-এর শক্তির মূল উৎস তার মস্তকস্থিত কেশরাশি; এখানেও যাদুবিদ্যার প্রভাব বিদ্যমান। Goethe-র 'Faust'-এ-Mefistophelis -এর ক্রিয়াকর্মেও ব্যাপক যাদুময়তা লক্ষণীয়। Baudlaire-এর 'The Cat' কবিতায় যাদুময় লোকবিশ্বাসের অনুসরণে বিড়ালের চোখে কবি 'Magic spark' অনুভব করেছেন। বলা বাহুল্য, এইসব 'Black Magic'-এর প্রভাব। সেদিক থেকে 'Tempest'-এ White Magic-এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। Tennyson (১৮০৯—১৮৯২ খ্রীঃ)-এর 'The Lady of Shallot' কবিতাটিতে একই সঙ্গে গীতিকা, ও যাদুবিদ্যার প্রভাব সক্রিয়।

৪। অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুসৃতি ঃ

Victor Hugo-র (১৮০২—১৮৮৫ খ্রীঃ) 'Hunch back of Notredam'(১৮৩১ খ্রীঃ) উপন্যাসে Emerelda-র বেদেনীর নৃত্য

কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই নৃত্যের সূত্রেই সে শয়তান Clod-এর নজরে পড়েছে। আবার ধর্ম সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে গিয়ে Whitman ধর্মীয় লোকনৃত্যের ব্যবহার করেছেন,-- 'Helping the lama or brahmin as he trims the lamps of the idols,/Dancing yet through the streets in a phallic procession..' (Song of myself—Leaves of grass (১৮৫৫)

উপসংহার ঃ

নগর-জীবন লোকঐতিহ্য নিরপেক্ষ নয়। বস্তুগত ও মনোগত, উভয় ক্ষেত্রেই লোকজীবন-চর্যার বিচিত্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো কালের সাহিত্য চর্চাতেও এর প্রমাণ মিলবে। উৎপাদনী শক্তির বিপুল বিকাশ সত্ত্বেও মানুষ সম্পূর্ণত যন্ত্রনির্ভর নয়, যন্ত্রসহযোগে তার মনোলোকটিও নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। স্বভাবতই, নগর জীবনে লোকসমাজের যেমন একটি অপরিহার্য ভূমিকা থেকেই গেছে, তেমনি নাগরিক মানসলোকেও লোকঐতিহ্যের সুদীর্ঘ-কালীন অস্তিত্ব প্রায় সংস্কারে পরিণত, যার প্রভাব নগর সমাজের সাহিত্য-চর্চায় সঞ্চারিত। বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেও এ মন্তব্য দেশ-কাল নিরপেক্ষ সত্য।

পরবর্তী অধ্যায়ে পূর্ব-বিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব নির্দেশের প্রয়াসী হব।

উল্লেখপঞ্জী

১। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ) কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১১০৯—১০।

২। ঐ।

৩। The New Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language, Edited by V. S. Thatcher and others, Chicago, 1980 Edition. p. 339.

৪। R. M. Maciver and C. H. Page: Society and Introductory Analysis; London, 1971, p. 5.

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', পূর্বোক্ত (১ম ভাগ), পৃঃ ৩৮৯।

৬। The New Webster Encyclopedic Dictionary, Ibid. p. 885.

৭। সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত : টি, এস, এলিয়ট, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৯২।

৮। T. S. Eliot: Select Essays: London: 1934, p. 14.

৯। T. S. Eliot: Selected prose: Penguin, 1953, p, 20,

১০। Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends (S.D.F.M.L) Edited by Maria Leach and others, London, Edition, 1975 p. 398,

১১। Ibid, p, 399.

১২। ডঃ মযহারুল ইসলাম : ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন (২য় সংস্করণ), ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৮-১৯।

১৩। ডঃ ওয়াকিল আহমেদ : বাংলার লোকসংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৩১।

১৪। শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত 'বাংলা দেশের লোকঐতিহ্য' সংকলনভুক্ত ডঃ মযহারুল ইসলামের প্রবন্ধ,—'লোকসাহিত্যে জনজীবন ও প্রাণের স্পন্দন' : একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমীক্ষা, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৫।

১৫। Karl Marx and F. Engels, On Literature and Art, Moscow, 1976, p. 428-29, p. 433,

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ছেলে ভুলানো ছড়া', লোকসাহিত্য : রবীন্দ্ররচনাবলী : ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৭৫৩।

১৭। ডঃ ভবতারণ দত্ত সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ছড়া' গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ সুকুমার সেনের 'শিশুবেদ' প্রবন্ধ (কলকাতা, ভাদ্র), ১৩৭৭,

১৮। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক : বাংলা ছড়ার ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৭৯ পৃঃ ১-১০ দ্রষ্টব্য।

১৯। ঐ।

২০। Taylor and Whiting. A Dictionary of American proverbs and proverbial phrases

২১। ডঃ সুশীলকুমার দে (সম্পাদিত) : বাংলা প্রবাদ—২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃঃ২।

২২। আব্দুল হাফিজ : বাংলা দেশের লৌকিকঐতিহ্য, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৪২।

২৩। M. J. Herskovits : Cultural Anthropology. New Delhi 1974, p. 269.
২৪। Maxim Gorky: The Disintegration of personality, On Literature, Moscow. 1979. p. 81—118. See also p. 198—204.
২৫। Stith Thompson, Motif Index of Folk-Literature (1—6 Volumes), Bloomington. 1955—1957.
২৬। S. D. F. M. L. Ibid, p.
২৭। ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'লোকপুরাণ ও লোকসংস্কৃতি' : পুস্তক, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১।
২৮। M. Gorky : Soviet Literature; Address delivered to the first All-Union Congress of Soviet Writers. August 17, 1934.
২৯। Alexander H. Krappe: The Science of folklore, London, 1965, p. 1.
৩০। Stith Thompson : The Folktale, Newyork—1946 p. 6.
৩১। S. D. F. M. L. Ibid. p. 1033,
৩২। হেমাঙ্গ বিশ্বাস : লোকসঙ্গীত সমীক্ষা, বাংলা ও আসাম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ৫৮।
৩৩। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী : লোকসাহিত্য, (২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ), ঢাকা, পৃঃ ৪৯।
৩৪। S. D. F. M,L. p. 106.
৩৫। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ৩৭৯-৯১, দ্রষ্টব্য।
৩৬। ঐ, পৃঃ ৩৮৭-৮৯।
৩৭। ডঃ মানস মজুমদার : লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বাংলা লোকনাট্যের স্বরূপ বিচার : উৎস ও ক্রমবিকাশের সন্ধান, 'লোকশ্রুতি' (পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত) ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ৩৫।
৩৮। ঐ, পৃঃ৩৮।
৩৯। M. J. Herskovits : Ibid, p. 277—79.
৪০। ঋগ্বেদের ১০।১৬৫।৪ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।
৪১। M. J. Herskovits : Ibid, p, 221.
৪২। E. B. Tylor : Religion in Primitive Culture, (Ed. by P. Radin) : New York, 1959, p. 9—11,
৪৩। H. A. Stayt : The Bavenda ; London 1931, p. 262.
৪৪। ডঃ মানস মজুমদার : যাদুনির্ভর লোকজীবন : বাংলা সাহিত্য পত্রিকা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৯৮-১১১ দ্রষ্টব্য।
৪৫। J. S. Frazer : The Golden Bough : London, 1939, Vol. II. p. 11·
৪৬। M. J. Herskovits : Ibid, p. 226.
৪৭। E. Thurston : Omens and superstitions of southern India : New-York, 1912, p. 2.
৪৮। কামিনীকুমার রায় : হিন্দু বিবাহে লোকাচার, দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত 'বিবাহের লোকাচার' সংকলনভুক্ত, (২য় সংস্করণ) কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ৬৯।

৪৯। ডঃ দুলাল চৌধুরী : বাংলার লোকউৎসব, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৯২।
৫০। Alan Dundes : The study of Folklore: Englewood Cliffs N. J, 1965.
৫১। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ৩২।
৫২। S. D. F. M. L. p. 276.
৫৩। R. A. George : Recreation and Games.—গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য
৫৪। ডঃ ওয়াকিল আহমদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬৪।
৫৫। ডঃ মানস মজুমদার : লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বাংলা লোকনাট্যের স্বরূপ বিচার : উৎস ও ক্রমবিকাশের সন্ধান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১।
৫৬। বিস্তারিত আলোচনার জন্য, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'বিহঙ্গচারণা' গ্রন্থটি (কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ১৮৬-৯৩) দ্রষ্টব্য।
৫৭। Collins Concise Encyclopedia, New Delhi, 1977, p. 469.
৫৮। W. Shakespeare : Complete works: Ed. by W. J. Craig, New Delhi, 1977, p, 895.
৫৯। Collins Concise Encyclopedia, Ibid. p. 351.
৬০। Ibid, p. 282.
৬১। Ibid p. 414,
৬২। Winternitz : History of the Indian Literature 1927, Vol 1, p. 497.
৬৩। বিস্তারিত আলোচনার জন্য Paul A Cantor-এর 'Creature and creator,' Cambridge, 1984—গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।
৬৪। W. Shakespeare. Ibid. p. 415,

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব

(আদি পর্ব থেকে উনিশ শতক)

ভূমিকা

সব দেশের সবকালের সাহিত্য-চর্চায় লোকঐতিহ্য যে প্রভাব-সঞ্চারী, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। সেই সূত্রে এখন আদিযুগ থেকে পূর্ব-বিশ শতকীয় বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাক।

আদি ও মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সে যুগের বাংলার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। লোক-জীবননির্ভর সেই সমাজে নগর সভ্যতা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। উৎপাদনী শক্তির সীমাবদ্ধ বিকাশের ফলে লোক-সমাজ ও নগর সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কটি ছিল ঘনিষ্ঠতর, আদান-প্রদানের। শুধু ব্যবহারিক জীবনেই নয়, মধ্যযুগ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রেই অবশ্য অনুরূপ চিত্র মেলে। বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব (১০ম শতক) থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র (১৮শ শতক) পর্যন্ত এই সুবিস্তৃত কালপর্বে রচিত কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলনের প্রচুর দৃষ্টান্ত মেলে।

উনিশ শতক থেকে কিন্তু সমাজ-কাঠামোয় একটা রূপান্তর ঘটতে শুরু করল। উৎপাদনী শক্তির বিকাশ উৎপাদনী সম্পর্ককে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করল। নগর জীবন ও লোকজীবনের মধ্যে যার ফলে একটি সুস্পষ্ট ভেদরেখা চিহ্নিত হয়ে গেল। "পল্লী সভ্যতার ও কৃষি সভ্যতার বাতাবরণে মধ্যযুগের সামন্ত-জীবনে ভদ্র সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতিতে যে তফাৎ ঘটে নি,————সাম্রাজ্যবাদী শাসনে এ কালের বাঙালী সংস্কৃতিতে ও এখনকার লোকসংস্কৃতিতে"[১] তা ঘটল।

পাশাপাশি একথাও অনস্বীকার্য যে, ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান ভাণ্ডার ও ভাবজগতের সংস্পর্শে এসে বাঙালী এসময়েই বৃহত্তর জগতের

সন্ধান পেয়েছিল। তার অর্থ এই নয় যে, মোগলরাজত্বের শেষ পর্বের অন্ধকার-বিশৃঙখল, বিষ-তিক্ততাকে অতিক্রম করে বৃটিশ শাসনের সংস্পর্শে আসা মাত্রই বাঙালী জীবন এক নূতন আলোকময় জগতের সন্ধান পেয়েছিল। আসলে নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার গভীরতা, আধুনিকতা ও আত্মসচেতনতা আত্মস্থ করে বাঙালী উনিশ শতকে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। "ভারতীয় ব্রিটিশ ব্যক্তিত্বের সাহায্যে নয়,—ইংরেজি জ্ঞানজগত ও ভাব জগতের ঘন নিবিষ্ট চর্যার প্রভাবেই আধুনিক বাংলায় রেনেসাঁসের মুক্তিপথ প্রথম আলোকিত হয়েছিল উনিশ শতকে,"[২] মুর্শিদকুলি (শাসনকাল ১৭০৫—২৭) প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক শোষণের সুযোগ ঘটে গিয়েছিল। কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত প্রথা'য় (১৭৯৩) তা তীব্রতর হয়ে নগরজীবন থেকে লোকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও উনিশ শতকের ভাবলোকে ঐতিহাসিক আলোড়নের ফলে নগর-জীবন লোকজীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র সন্ধানে প্রয়াসী হয়। প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন ও স্বদেশপ্রীতির বশে এ যুগের কাব্য-কবিতার বহু ক্ষেত্রে লোকঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রয়াসও অনেক সময় কবিদের সনাতন লোকজীবনের সংস্পর্শে নিয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবেই 'পদ্য-লেখক' ঈশ্বরগুপ্ত স্মরণে আসেন।

এছাড়া দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোনো নাগরিক-সমাজই সম্পূর্ণভাবে লোকঐতিহ্য-বর্জিত হতে পারে না, কারণ তার জন্মের সঙ্গে লোকসমাজের নাড়ীর যোগ। এই সূত্রেও উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে লোকঐতিহ্যের অনুস্যূতি ঘটেছে।

লোকঐতিহ্যের প্রভাব

এখন বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে পূর্ব-বিশ শতকের কাব্য কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলনের কিছু দৃষ্টান্ত ক্রমপর্যায় অনুসারে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

১। বস্তু-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্যূতি ঃ

লোকঐতিহ্য-আশ্রিত খাদ্য-পানীয়, পরিধান-প্রসাধন, গৃহস্থালী দ্রব্য; যানবাহন, বৃত্তি-সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্রাদি বস্তু-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের

অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতা-সমূহ বস্তু-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের দ্বারা নানা ভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ। উদাহরণ যোগে তা দেখানো যেতে পারে।

১। (১) খাদ্য-পানীয়ঃ বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়'-এ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ভাতের উল্লেখ একাধিকবার লভ্য। যেমন,-'হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী' (৩৩সংখ্যক পদ : ঢেন্টণপাদ)[৩]-এর সাধারণ অর্থ—'হাঁড়িতে ভাত নাই (অথচ) 'নিত্য প্রতিবেশী'। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের চিত্র রচনায় কবির সমাজ সচেতনতা অনস্বীকার্য। ধর্মীয় গূঢ় সাধনতত্ত্বের কথাই এখানে বাস্তব সমাজ চিত্রের রূপকাশ্রিত। উল্লেখযোগ্য, গূঢ়ার্থে 'ভাত' এখানে সংবৃতি বোধচিত্তের রূপকার্থে প্রযুক্ত।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (বড়ু চণ্ডীদাস)-এ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর শব্দে নিজের মানসিক আকুলতা বোঝাতে রাধা বলেছেন, 'বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রন্ধন'। রন্ধন প্রণালীতে তাঁর ভুল হয়ে গেছে, 'অম্বলবাঞ্জনে মোঁ বেশোআর দিলোঁ / সাকে দিলোঁ কানা সোঁঅা পানী। / তা শুনিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ/ ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআঁ।'[৪] শুধু তাই নয়, 'ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোল খেপিলোঁ। বিনি জলে চড়াইলোঁ চাউল।' উল্লিখিত 'অম্বল', 'বেশোআর' (ঝাল-বাটনা); 'সাক' 'নিমঝোল' এসবই লোকখাদ্য তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সুগভীর ও অনিবার্য আকর্ষণ প্রকাশে রন্ধনশালাচিত্রণেও লোকখাদ্যাদির উপস্থাপনায় মনস্তত্ত্বকুশল কবি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

'কবিকঙ্কণচণ্ডীতে' 'হর-পার্ব্বতী'-র কলহ-বর্ণনায় প্রসঙ্গত বহু বিচিত্র লোক খাদ্য-সামগ্রী উল্লিখিত। যেমন, 'সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর', 'ফুলবড়ি', 'গোটা কাসুন্দি'[৫] ইত্যাদি। লক্ষণীয়, কলহ-প্রসঙ্গে এসব লোকখাদ্যের অবতারণায় সাধারণ মানুষের নিতান্ত সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকটিই প্রতিভাত। কালকেতুর ভোজন-পর্বেও মুকুন্দ চক্রবর্তী নানা খাদ্যসম্ভার সাজিয়েছেন। সেখানে 'সাত হাঁড়ি আমানি', 'চারি হাঁড়ি খুদজাও', 'লাউ' মিশ্রিত 'ছয় হাঁড়ি মসুর', 'সার কচু মিশাইয়া করঞ্জ আমড়া', 'এক হাঁড়ি দধি' ইত্যাদি মেলে। খাদ্যের এই পরিমাণ-বিপুলতা প্রবল পরাক্রমশালী কালকেতুর ভোজন-ক্ষমতার পরিচয়বাহী। এ কাব্যের বণিক খণ্ডে এক স্থানে ধনপতির নির্দেশানুক্রমে রন্ধনশালায় পত্নী খুল্লনাকে বহু বিচিত্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে দেখা যায়। সেখানেও 'সুক্তা' ব্যঞ্জনের

উল্লেখ আছে; এছাড়া আছে, 'নটেশাকে ফুলবড়ি', 'চিঙ্গড়ী-কাঁটালবীচি দিয়া', 'তৈলেতে বেথুয়া পাক'; এখানেই রন্ধনকর্ম শেষ হয় নি,--"দুগ্ধেলাউ', 'মাছের ঝোল', 'আম্র' সহযোগে 'শোল মাছ', 'ক্ষীর',। 'কলা-বড়া', 'মুগসাউলি' প্রভৃতি বিচিত্র লোকখাদ্য সম্ভারের সাক্ষাৎও মেলে। অন্যত্র, গোপালের 'ননী' চুরি করে খাওয়ার অপরাধে জননী যশোদা 'ছান্দন ডোরে' তাঁকে বেঁধে রাখলে, তিনি বলেন--'অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননী খায় কত মা / হইয়া কেবা বান্ধে করে।' (শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ : বলরাম দাস), আবার উমা কৈলাস থেকে ফিরে এলে মা মেনকা এগিয়ে গিয়ে বলেন, 'যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি, মা ধর, দিব বদন-কমলে' (আগমনীর পদ : মহেন্দ্র লাল খান), এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের কাব্য-কবিতায় মেলে।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে কালুডোমের মদ্যপানাসক্তির কথা পাই। দেবতাদের সাক্ষাৎ পেতে সে স্বর্গে যেতে প্রস্তুত, যদি স্বর্গে গেলে মদ্য মাংস পাওয়া যায়। স্বর্গে তা পাওয়া যাবে না শুনে কালুর মন্তব্য, '..দেব দেবে মোর কিবা কাজ। /মদ্য মাংস না পেলে মাথায় পড়ে বাজ।'[৬] (ধর্ম-মঙ্গল : মাণিকরাম গাঙ্গুলী ১৮ শতক)-এ মন্তব্য যথার্থই কালু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটক। মন্তব্যটি তাঁর বাস্তব জীবনানুরাগের প্রবলতাই প্রমাণ করে।

উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতাতেও বহু বিচিত্র লোকখাদ্য-পানীয়ের উল্লেখ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের 'পৌষড়ার গীত' কবিতাটি স্মরণযোগ্য। কবিতাটিতে বাংলার ঐতিহ্যময় 'পিঠে-পুলির' উল্লেখ মেলে; যেমন,--'আস্কে পিঠে', 'ভাজাপুলি', 'পায়েস', 'নূতন গুড়' ইত্যাদি। এছাড়া 'ভেটকি মাছে কুমড়ো বড়ি'-র ব্যঞ্জনও সেখানে বাদ পড়ে নি। এসব লোকখাদ্যাদি কবিতার ব্যঙ্গরসকে গাঢ়তা দান করেছে।

অন্যত্র বঙ্গনারীদের স্নেহ-কোমল হৃদয়ের বর্ণনা সূত্রে দেখি, 'পরম করুণ জননীর মত, / ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি' [নারীবন্দনা : বঙ্গ-সুন্দরী : (১৮৭০)--বিহারীলাল (১৮৩৫—১৮৯৪)]; নারীর বিচিত্র রূপের প্রকাশ করতে গিয়ে কবি সুরেন্দ্রনাথ দুগ্ধজাত কয়েকটি লোক-খাদ্যকে উপমা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, 'এক দুগ্ধে দধি, তক্র, ঘৃত, নবনীত / নানা উপাদেয় যথা হয়,— / এক নারী নানা রূপে করে বিরচিত / সংসারের সুখ সমুদয়'। [উপহার : মহিলা : (১৮৮০) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮)], এই 'নবনী' (ননী) চাঁদের উপমান হিসেবেও

গৃহীত,--'নবনীর সর ছাঁকা / সুন্দর শরৎরাকা / তরুণ প্রভাতে কি রে কোমল অমন?' (শিশুর হাসি : বিবিধ কবিতা : হেমচন্দ্র ১৮৩৮--১৯০৩)। এছাড়া, বাঙালী চরিত্রের নানাবিধ দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষ-সূত্রেও লোকখাদ্য গৃহীত,--'----আমার মত ঝোল ভাত রাটী যত / ধীর শান্ত স্থির সহীয়ান' [খিদিরপুর দাঁত ভাঙ্গা কাব্য : কবিতাবলী : (১৮৭০--৮০) : ঐ] 'ঝোল-ভাত' এখানে বাঙালী জাতির নিরীহ, নির্বিরোধী চরিত্রের ইঙ্গিতবাহী। আবার অসম্ভব ব্যাপার বোঝাতে বিসদৃশ বস্তুর সহাবস্থান ঘটানো হয়েছে। সেই সূত্রে দেখি, 'কড়িতে কি জোটে মান বড়িতে খিচুড়ি / গুড়েতে কি খাজা হয় এক আঙ্গুলে তুড়ি' (সাবাস হুজুগ আজব শহরে : ঐ : ঐ)। বলা বাহুল্য, বড়িতে খিচুড়ি দেওয়া হয় না। গুড় নয়, চিনি দিয়ে সাধারণত 'খাজা' প্রস্তুত হয় এবং 'তুড়ি' বাজাতে কমপক্ষে দু'টি আঙ্গুলের প্রয়োজন হয়। অন্যত্র দেখি, স্বামীর কর্মস্থল বহু দূর দেশে। পূজোর ছুটি শেষে স্বামী যখন কর্মস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন স্ত্রী প্রবাসী স্বামীর সঙ্গে নানা খাদ্যদ্রব্যাদিও দিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে লোকখাদ্যাদিও আছে। সেখানে 'সোনামুগ সরুচাল', 'গুড়ের পাটালি', 'আমসত্ত্ব-আমচুর' ইত্যাদি লোকখাদ্য স্ত্রী-র প্রেম-মমতার ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে।

১। (২) পরিধান-প্রসাধন : মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অন্ন তথা খাদ্যের পরেই বস্ত্র তথা পরিধানের প্রয়োজন সর্বাধিক। জীবনের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। সেই সূত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নানা সূত্রে পরিধান-প্রসাধন-সজ্জা দ্রব্যাদি গৃহীত হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ দেখি, সীতার বিবাহোপলক্ষে সখীগণ সীতাকে 'পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে।'[৭] আবার 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র 'বণিক খণ্ডে' ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহের পূর্বে প্রথমা পত্নী লহনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য 'পাট শাড়ী' উপহার দিয়েছে।

শুধু পোশাকাদি-ই নয়, লোক-অলঙ্কারাদিও নানা স্থানে লভ্য। 'চর্যা-চর্যবিনিশ্চয়'-এর একটি পদে দেখি,--'কানেট চোর নিল কাগই মাগঅই'[৮] (২ সংপদ : কুক্কুরী পাদ) অর্থাৎ 'কানেট' নিল চোরে কোথা গিয়ে মাগে। 'কানেট' হল কর্ণাভরণ, যা এখানে সহজানন্দের রূপকার্থে গৃহীত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' 'দানখণ্ডে' 'নন্দের বালা'-র (শ্রীকৃষ্ণ) বর্ণনায়, 'পা এ মগর খাড়ু হাতে বলয়া / মাথে ঝোড়া চুলা ----' দেখা যায়।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে' বিবাহোদ্যতা সীতার 'দুই বাহু শঙ্খেতে শোভে বিলক্ষণ'। হিন্দু রমণীর সাধব্য চিহ্ন-স্বরূপ বলয়াকৃতি শাঁখার উল্লেখ। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-তে শিশু কালকেতুর 'কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল', 'ব্যাধসুত'-র কানে 'স্ফটিক কুণ্ডল'-ই বাস্তবানুগ।

প্রসাধনীর মধ্যে মূলত 'সিঁদুর', 'আলতা', 'চন্দন' ইত্যাদিই গৃহীত। সীতার বিবাহের পূর্বলগ্নে সখীরা সীতাকে 'কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দুর' (রামায়ণ : কৃত্তিবাস) পরিয়ে দিয়েছে; অন্যত্র, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনা সূত্রে বাসু ঘোষের (১৬ শতক) একটি পদে 'চন্দন-তিলক' প্রযুক্ত, একই সূত্রে কৃষ্ণদাসের লেখনীতে 'চন্দন-লেপিতে অঙ্গ তিলক সুঠাম' (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ১৬ শতক) শ্রীচৈতন্যের ভাবঘন মূর্তিটিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'অন্নদামঙ্গল'-এ (ভারতচন্দ্র) দেবী ভবানী ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় আরোহণ করে তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আলতা ধুইবে পদ কোথা থুই বল'; বলা বাহুল্য, এ সবই দেবীর ছলনা।

প্রসঙ্গত, উনিশ শতকের কাব্য-কবিতার কথাও ভাবা যেতে পারে। বিহারীলাল তাঁর 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের 'বিজয়' অংশে বন্ধু পূর্ণচন্দ্রের উদার, সহানুভূতিশীল চরিত্রের ছবি এঁকেছেন। একদিন পূর্ণচন্দ্র স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, 'একজন ডুবে ডুবে তীরে বেঁচে এল'। তখন তিনি 'পরিধান বস্ত্র তার করে দান / ছেঁড়া গামছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে' নিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮—১৯২০) অশোকতরুর ফুলের রঙে মুগ্ধ হয়ে শাড়ি সিঁদুরকে তার রঙের উপমান রূপে গ্রহণ করেছেন,—'কোন্ চির সধবার ব্রত-উদ্‌যাপনে / পাইলি বাসন্তী শাড়ি সিন্দুর বরণ' (অশোকতরু : অশোকগুচ্ছ—১৯০০)।

রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নে রূপকথার রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। নিদ্রিতা 'রাজবালা'-কে দেখতে পান, যার 'আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে / কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটে' (নিদ্রিতা : সোনার তরী ১৮৯৪)। লক্ষণীয়, আঁচলের সঙ্গে শ্রুতিসাম্য রক্ষার্থে কাঁচলি বা কাঁচুলি হয়েছে 'কাঁচল'। আবার 'কথা ও কাহিনী'-র (ঐ) 'হোরিখেলা' কবিতায় রাজস্থানী লোক-পোশাক 'পাগড়ি', ও 'ঘাগরা'-র উল্লেখ নাই।

১। (৩) গৃহস্থলী দ্রব্য : গৃহ থাকলেই গৃহস্থালী দ্রব্য থাকবে। সে কারণে বাংলা কাব্য-কবিতায় নানা সূত্রে গৃহস্থালী দ্রব্যাদির উল্লেখ লভ্য।

আপাতদৃষ্টিতে দারিদ্রপূর্ণ জীবনযাত্রার বর্ণনাসূত্রে দেখি, 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী' (৩৩ সংখ্যক পদ : ঢেণ্ঢণপাদ : ঐ) 'হাড়ীত' অর্থাৎ 'হাঁড়ি' 'স্বকায়' রূপের প্রতীকার্থে এখানে প্রযুক্ত, ভাত শূন্য হাঁড়ির উল্লেখে সে যুগের নিম্নশ্রেণীর মানুষের আর্থিক দুরবস্থার চিত্রটিই এখানে প্রতিভাত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ শ্রীরাধার রূপ-যৌবন বর্ণনা সূত্রে তাঁর গভীর নাভির উপমান রূপে 'তেলানী' গৃহীত, ('তেলানী'-বিশেষ ধরণের ছোটো হাঁড়ি)—'তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল'; আবার এই কাব্যেই তেলীর বর্ণনায়—'কান্ধে কুরুআঁ তেলী আগে জাএ' (ঐ) ('কুরুআ' হল তৈলাধার বিশেষ)। এছাড়া 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'-এ 'খাট-পালঙ্কি', 'শুন্য কলসী' প্রভৃতি গৃহস্থালী দ্রব্যের উল্লেখও লভ্য।

'কবিকঙ্কন চণ্ডী'-র 'আখেটিক' খণ্ডে কালকেতুর ভোজন-বর্ণনায় দেখি, 'সম্ভ্রমে ফুল্লরা দিল মাটিয়া পাথরা'। 'মাটিয়া পাথরা' হল মাটির পাত্র। উল্লেখ্য, কালকেতুর ভোজ্য বিপুল খাদ্যসম্ভার একটি 'মাটিয়া পাথরা'তেই নিশ্চয় পরিবেশিত হয় নি। তাই সেখানে 'হাঁড়ি', 'ঝুড়ি'-রও উল্লেখ মেলে।

এই কাব্যেরই 'বণিক খণ্ডে' 'সদাগরের জ্ঞাতিবন্ধুরা'-ও 'ঘটি' 'বাটি'-তে নানা বিচিত্র ব্যঞ্জনাদি ভোজন করেছে।

আবার দুরন্ত নিমাই-এর কীর্তিকলাপের অন্যতম হল, 'হাণ্ডি ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছুই না পায়' (আদিখণ্ড : শ্রীচৈতন্য ভাগবত : বৃন্দাবন দাস ১৬ শতক)—'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়ি' ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে শিশু নিমাই-এর শিশুসুলভ প্রতিশোধ গ্রহণের দিকটি সুন্দর পরিস্ফুট। কৃষ্ণদাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্যের ঘরে গিয়ে চুরি করে খাবার জন্য জননী নিমাইকে তিরস্কার করলে, 'শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হঞা ঘর ভিতর যাঞা / ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া' (আদিলীলাঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। এখানে তিরস্কৃত বালকের অভিমানমিশ্রিত ক্রোধ 'ভাণ্ডে' বা ভাঁড়ে বর্ষিত। মুন্সী আবুল করিম সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়'-এ (১৯১৭, ঢাকা) শিবের বর্ণনায় দেখি 'সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধের কাঁথা তাঁহার গলাত / ছাই, কাঁথা, ঝুলি কেনড়ি, হাতে নড়ি----'। এই 'ঝুলি', 'কাঁথা' গৃহস্থালী দ্রব্যেরই শ্রেণীভুক্ত।

উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতাতেও বহুবিধ গৃহস্থালী দ্রব্যের সাক্ষাৎ মেলে। ঈশ্বরগুপ্তের 'পৌষডার গীত' কবিতাতে 'ঘরে হাঁড়ি

ঠনঠনাস্তি'-তে দারিদ্র্যের দিকটিই সূচিত। আবার বাঙালী চরিত্রের প্রতি কটাক্ষসূত্রে হেমচন্দ্রের উক্তি, একদল বাঙালী কর্মে যাই হোক না কেন, তীব্র-তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপে তারা সুপট। কিন্তু 'গৃহিণী' 'ভাতের থালা' এনে দিলে 'দেহ-জ্বালা / তখনি সে হয় নিবারণ' (খিদিরপুর দাঁত ভাঙ্গা কাব্য : কবিতাবলী)। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর (১৮৫৮—১৯২৪) গ্রাম্য-চিত্র বর্ণনায় দেখি, 'খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে' (গ্রাম্য ছবি : অশ্রুকণা : ১৮৮৭)। 'গার্হস্থ্য' চিত্রাঙ্কনসূত্রে 'মাদুর'-ও (গার্হস্থ্য চিত্র : ঐ) দেখা যায়।

সুপথ বা সত্য পথের প্রতীকার্থে 'প্রদীপের' উল্লেখ ঘটে কামিনী রায়ের (১৮৬৪—১৯৩৩) কবিতায়, 'তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া, / তোমাদেরি হাত ধরি হোক অগ্রসর' (চাহিবে না ফিরে : আলো ও ছায়া—১৮৮৯) এখানে 'পাপী'র প্রতি আমাদের নৈতিক কর্তব্য কবি স্মরণ করিয়ে দেন। সেই সূত্রে 'পাপ' হল অন্ধকার, আর 'পুণ্য' বা সঠিক পথ স্বভাবতই আলো তথা প্রদীপের রূপকাশ্রয়ী। আবার 'পশ্চিমি মজুরে'-র মেয়ের বর্ণনায় নিতান্ত সাধারণভাবেই 'ঘটি-বাটি-থালা' গৃহীত,—'তাহাদেরই ছোটো মেয়ে / কত ঘষা মাজা / ঘটি বাটি থালা লয়ে' (দিদি : চৈতালি ১৮৯৬ রবীন্দ্রনাথ); অন্য একটি কবিতায় দেখি, পূজাবকাশ স্ব-গৃহে কাটিয়ে প্রবাসে কর্মরত স্বামীকে কাজে ফিরে যেতে হবে। তাই স্ত্রী প্রেম-মমতাবশত স্বামীর সঙ্গে নানা টুকি-টাকি জিনিস দিয়ে দেন, 'বিছানা-বাক্সের' সঙ্গে তাই সেখানে 'ঘট', 'হাঁড়ি', 'ভাণ্ড', 'শিশি কৌটা' (যেতে নাহি দিব : সোনারতরী : ঐ)-র সাক্ষাৎ মেলে।

১। (৪) যানবাহন : প্রাচীন ও মধ্যযুগে নদীমাতৃক বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান যান ছিল নৌকা। স্বভাবতই লোকজীবনেও এই নৌকিক যানটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই পর্বের কবিরাও তাঁদের কাব্যচর্চায় নৌকাকে সম্পূর্ণত উপেক্ষা করতে পারেন নি।

সমাজ সচেতন চর্যাকারগণ তাঁদের গুহ্য সাধনতত্ত্ব প্রচারার্থে একাধিক চর্যায় নৌকাকে রূপক রূপে গ্রহণ করেছেন। 'সোণে ভরিতী করুণা নাবী' (৮ সংপদ : কম্বলীপাদ : চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়)[৭], অর্থাৎ 'করুণা রূপ নৌকা সোনায় ভরা'—'নাবী' (নৌকা) এখানে সদ্‌গুরু প্রসাদের রূপক ; কখনও বা 'ইড়া' ও 'পিঙ্গলা'-র মধ্যবর্তী 'সরস্বতী'-র বৈশিষ্ট্যাদি বর্ণনা সূত্রে সিদ্ধাচার্য ডোম্বীপাদ নৌকাকে 'সরস্বতী'-র রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন,

—'গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাই'[১০] (১৪ সংপদ : ডোম্বীপাদ : ঐ) অর্থাৎ 'গঙ্গা যমুনার মধ্যে নৌকা বহে যায়'। কখনও তা কায়ার রূপক, 'নৌবাহী নৌকা টাগু অগুনে'[১১] (৩৮ সংপদ : সরহপাদ : ঐ) অর্থাৎ নৌবাহী নৌকা গুণের দ্বারা টানে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ নৌকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার জন্য বড়ায়ির পরামর্শে নৌকার বন্দোবস্ত করেছেন, 'খলাপাড়া' সুরগঠী দিল সব নাএ'[১২]—এই সূত্রে নৌকা-নির্মাণের বর্ণনাও এখানে মেলে।

সেযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌকার ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর বাণিজ্য যাত্রা-প্রসঙ্গে বিচিত্র ধরণের 'নৌকা'-র সাক্ষাৎ মেলে। চাঁদ সদাগর (মনসামঙ্গল) ও ধনপতির (চণ্ডীমঙ্গল) বাণিজ্য যাত্রা-সূত্রে বিচিত্র আকৃতির নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ের শিল্প-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের পর্যায়ে নৌকার এই গঠনগত বৈচিত্র্য-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ধনপতির সিংহল যাত্রাকালে দেখি, 'নৌকায় চড়িল করি শিবের স্মরণ' (কবিকঙ্কণচণ্ডী), 'মনসা-মঙ্গল'-এ মনসার কোপদৃষ্টিতে চাঁদ সদাগরের 'সপ্তডিঙ্গা' জলমগ্ন হয়েছে; ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ দেবী অন্নপূর্ণা ছদ্মবেশে ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় চড়েছেন। দেবীর পাদস্পর্শে দরিদ্র ঈশ্বরীর নৌকার সেঁউতি স্বর্ণময় হয়েছে।

এছাড়া 'স্থলযান' হিসাবে 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'-তে 'পাটের দোলা'-র উল্লেখ মেলে। সম্ভবত বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে লোকসমাজে এই পালকি জাতীয় লোকযানটি এক সময় বহুল ব্যবহৃত হতো। 'চণ্ডী-মঙ্গল'-এর ধনপতি বিয়ে করে 'চড়িয়া পাটের দোলা যায় নিজ গ্রাম' (কবিকঙ্কন চণ্ডী) উনিশ শতকের বাংলাকাব্য-কবিতাতেও নৌকার উল্লেখ-প্রাচুর্য লক্ষনীয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭—৮৭) 'কর্মদেবী' কাব্যে একাধিকবার নৌকার উল্লেখ আছে। বিহারীলালের 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গে গঙ্গার বর্ণনায়, '—গঙ্গা বহে কুলু কুলু, / যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু, / ধীরে ধীরে দোলে তরী, / ধীরে ধীরে বেয়ে যায়'—। 'নৌকা' অর্থেই এখানে 'তরী' প্রযুক্ত। গঙ্গার বর্ণনায় ভিন্ন ক্ষেত্রে 'ডিঙা-ভেলা'-র (গঙ্গা : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র) দেখা পাই। চর্যাপদে যেমন দেহের রূপকার্থে নৌকা কল্পিত, তেমনি উনিশ শতকের কবিতাতেও অনুরূপ রূপক-কল্পনা লভ্য, অনন্ত আশার বশবর্তী হয়ে কবি বলেন,

'আশা জলে দেহ-তরী দিব ভাসাইয়া' (কি করি : অবকাশ রঞ্জিনী : নবীনচন্দ্র সেন)। লক্ষণীয়, এখানেও তরী নৌকার স্থান অধিকার করেছে। কখনো বা ভগ্ন হৃদয়ের রূপকার্থে 'ভাঙা তরী' গৃহীত,—'হৃদয় যমুনায় ঐ ভাঙা তরী বাহি' [হৃদয় যমুনায় : দোলা : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯--১৯২৯)] ঐ একই কবিতায় প্রেমের রূপকরূপে 'ভেলা' ব্যবহৃত, 'সারা ঋতু সারা বেলা / ভাসাইয়া প্রেম ভেলা' (ঐ)। আবার গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের প্রকৃতি-বর্ণনা সূত্রে পাই, 'বহে যায় ডোঙাখানি ধীকি ধীকি, ধীক' [কেমন হইয়া গেছে প্রাণ : ভুল (১৮৮৭) অক্ষয় কুমার বড়াল--(১৮৩৫--১৯১৯)।[১৩]]

'কথা ও কাহিনী' (রবীন্দ্রনাথ) কাব্যগ্রন্থের 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় 'নৌকা'-র একটি বিশেষ ভূমিকা বর্তমান। নৌকা ডুবে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় মানত-ভঙ্গের দোষ বড় হয়ে উঠেছে। যার করুণ পরিণতি, মোক্ষদার বালক পুত্রের মৃত্যু; কখনো বা জন্ম-মৃত্যুর চিরন্তনতার দ্যোতনা এনেছে 'খেয়া নৌকা',--'খেয়া নৌকা পারাপার করে নদী স্রোতে,/ কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে' (খেয়া : চৈতালি : ঐ),--জীবন এবং মৃত্যু বৃহত্তর জীবনেরই এক একটি অংশ বিশেষ। 'খেয়া নৌকা' পারাপারের মধ্য দিয়ে কবি সেই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন।

১। (৫) বৃত্তি-সরঞ্জাম : চর্যাপদে বর্ণিত সমাজটি মূলত কৃষাণ, তাঁতী, ধুনুরী, মাঝি, নট-কাপালিক, ব্যাধ প্রভৃতি 'নিম্ন শ্রেণীর' মানুষজন নিয়েই গঠিত। সিদ্ধাচার্য চর্যাকারগণ তাঁদের গুহ্য সাধনতত্ত্ব প্রচারার্থে সেই সমাজকেই রূপক-উপাদান রূপে গ্রহণ করেছিলেন। স্বভাবতই সেই সমাজের বৃত্তিসরঞ্জামাদিও বিভিন্ন চর্যায় একই সূত্রে গৃহীত হয়েছে। যেমন, 'কেড়ুআল' (বৈঠা) সাধন পথের সঠিক নির্দেশক রূপে প্রযুক্ত, 'কেড়ুয়াল নাহি কে, কি বাহবক পারঅ'[১৪] (৮ সংপদ : কম্বলীপাদ : চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) অর্থাৎ 'বৈঠা বিনা কে কিভাবে বাহিতে পারে।' অন্যত্র, 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা'[১৫] (১০ সংপদ : কাহ্নপাদ : ঐ)— অর্থাৎ 'ডোম্বী বিকোয় তাঁত, আবরণকারী চ্যাঙারি নয়।' 'তান্তি' (তাঁত) এখানে অবিদ্যার সূচক।

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এ গো-পালন, দুগ্ধ-দধির বিক্রয়-বৃত্তির উল্লেখ মেলে। দুধ-দই বিক্রয় করেই গোপ-জাতিকে জীবন নির্বাহ করতে হত। সে যুগে মেয়েরাও হাটে গিয়ে তা বিক্রি করত। এর প্রমাণ এ কাব্যের বহু-স্থানে মেলে। 'দধি-দুধ পসার সজাঈ'—শ্রীরাধার হাটে যাবার চিত্র

এ কাব্যের 'তাম্বুল খণ্ডে' পাওয়া যায়। কুম্ভকারের বৃত্তি-সংশ্লিষ্ট 'চুলী'র উল্লেখও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ উপমা-সূত্রে গৃহীত,—'মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী।' কৃষ্ণের গো-পালন-বৃত্তির পরিচয় এ কাব্যের নানা স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। 'তাম্বুল খণ্ডে' দেখি, রাধাকে পথে হারিয়ে বড়াই নানা স্থানে সন্ধান করতে করতে ল'গুড়' (গো-তাড়ন যষ্টি / পাঁচনী) হাতে নাতি 'কাহ্নঞি'-কে দেখতে পেয়েছে। 'দেখিল লগুড় করে পাতিআ কাহ্নঞি।' 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ কালকেতুর শিকার-প্রসঙ্গে শিকারবৃত্তির সরঞ্জাম 'টাঙ্গি' গৃহীত হয়েছে, 'খর টাঙ্গি দিয়া বীর কাটে করিশুণ্ড' (কবিকঙ্কন চণ্ডী) জগজ্জীবন ঘোষালের (১৭ শতক) 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যের কৃষি-চিত্রে পাই কৃষি সরঞ্জামের উল্লেখ,—'হাল বহে শিব কৌতুক বড় রঙ্গে।'

পরবর্তী কালের কাব্য-কবিতায়ও বৃত্তি-সরঞ্জামাদির প্রয়োগ একেবারে বিরল নয়। সমকালীন যুগের অস্থিরতা, অন্যায়-অত্যাচার দেখে কবি লিখলেন, 'ওরে রে কৃষক কাল, কি করিছে তব হাল / জঞ্জাল-জঙ্গল বৃদ্ধি পায়' [পদ্মিনীর উপাখ্যান : (১৮৫৮) রঙ্গলাল (১৮২৭—৮৭)] এখানে 'কাল' অর্থাৎ মহাকাল কৃষকের রূপকে গৃহীত হওয়ায়, মহাকালের হাতিয়ার হিসাবে কৃষি-বৃত্তি-সরঞ্জাম 'হাল'—এর অবতারণা করা হ'ল. শিকার বৃত্তির সরঞ্জাম 'জাল'-ও কবিতায় প্রযুক্ত, তবে তৎসম ভাষায়,— 'আনায় মাঝারে বাঘ পাইলে কি কভু / ছাড়ে রে কিরাত তারে ?. . . .' [৬ষ্ঠ সর্গ 'মেঘনাদবধ কাব্য' : মধুসূদন (১৮২৪—৭৩)] 'আনায়' (পশু-পাখি শিকারের জাল) শব্দটির প্রয়োগ এখানে রাঘব পক্ষের ও সমগ্র দেবকুলের গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিতবাহী। এছাড়া 'আনায়' এখানে একই সঙ্গে অমিত শক্তিমান মেঘনাদের অসহায়তা ও দুর্ভাগ্যের সূচকও ; কারণ বাঘের সঙ্গে মেঘনাদের সাদৃশ্য কল্পিত।

আবার রূপকার্থে বিহারীলাল শিকার-বৃত্তির একটি অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন, 'ব্যাধেরা বাঁশীর তানে / হরিণে ভুলায়ে আনে / অলক্ষেতে বাণ হানে / হৃদি বিদারণ' (সঙ্গীত শতক ১৮৬২)।

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র রূপকধর্মী কবিতাগুলির একটিতে রূপকার্থে লাঙলের ব্যবহার চোখে পড়ে। মানুষের জীবনে কর্মই প্রধান। সমাজে কর্মের নিরিখেই তার মূল্য নিরূপণ হয়। 'অকর্মার বিভ্রাট' কবিতাটিতে 'লাঙলে'র রূপকে এই সত্যই বিধৃত। 'লাঙলের' মূল্য যে তার 'ফলা'র জন্য, তা সে প্রথমে বোঝে নি। সে চায় নিষ্কর্ম, অলস জীবন ; কিন্তু যখন 'ফলাখানা টুটে গেল', তখন লাঙলও হয়ে পড়ল মূল্যহীন।

তাই চাষা ঠিক করল, তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। তখন 'হল' বলে, 'খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে'। এছাড়া গ্রাম্য দৃশ্য বর্ণনায় মৎস্যজীবীদের জালের উল্লেখ মেলে; '……তীরে শুকাইছে জাল। জলে ভাসিতেছে তরী' (বসুন্ধরা : সোনার তরী : রবীন্দ্রনাথ)।

১। (৬) বাদ্যযন্ত্র: লোকসমাজের নানাবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গরূপে বাদ্যযন্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও বাদ্যযন্ত্রের স্থান সর্বজনবিদিত। চর্যাপদের যুগেও নৃত্য-গীতের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। চর্যাকারেরা তাঁদের রচিত পদে নানা বাদ্যযন্ত্রের অর্থপূর্ণ প্রয়োগ করেছেন। একাধিক চর্যায় 'একতারা' 'হেরুকবীণা', 'ডমরু', 'ডমরুলি', 'মাদল', 'বাঁশী' ইত্যাদির উল্লেখ মেলে। যেমন, করুণার রূপকার্থে 'ডমরুলি' (ছোট ডমরু) গৃহীত,—'অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ'[১৬] (৩০ সংপদ :আর্যদেব : চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) অর্থাৎ 'আশ্চর্য করুণা ডমরু বাজে' ; আবার 'মাদলা' (মাদল) নির্বাণের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে,—'ভব নিব্বাণে পড়হ মাদলা' (১৯ সংপদ : কৃষ্ণপাদ : ঐ) অর্থাৎ 'ভব নির্বাণে মাদল পড়ল (বাজল)।

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এর এবং বৈষ্ণব পদাবলীর নায়ক বংশীধর শ্রীকৃষ্ণ ; সুতরাং সেই সূত্রে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' বহু স্থলে ও বহু বৈষ্ণব পদে বাঁশীর উল্লেখ মেলে। শুধু তাই নয়, উভয়ত্রই বাঁশী রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' একটি খণ্ডের নাম-ই 'বংশীখণ্ড'। এ খণ্ডের সুবিখ্যাত পংক্তিগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 'কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে। / কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।। / আকুল শরীর মোর বে আকুল মন। / বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন'।। বাঁশীর সুমধুর ধ্বনি ও দয়িত শ্রীকৃষ্ণ এখানে দয়িতা শ্রীরাধার কাছে অভিন্ন আত্মায় পরিণত হয়ে রাধার অন্তরকে ব্যাকুল করে তুলেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ 'করতাল-মৃদঙ্গ'-এর ব্যবহারও মেলে। ষোল শত গোপী নিয়ে রাধা যমুনার ঘাটে গেলে 'তা দেখিয়াঁ কাহাঞি পাতিল নাটে / খনে করতাল খনে বাজএ মৃদঙ্গ'। রাধা এবং সখিগণ তা মহানন্দে উপভোগ করেছেন।

'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এ[১৭] দশরথের বিবাহ-বর্ণনায় নানা বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই সূত্রে 'পাখোয়াজ পঞ্চাশ সহস্র পরিমাণ', 'তিন কোটি শিঙ্গা', 'শতকোটি শঙ্খ আর ঘন্টা জান', 'সহস্র কোটি সানাই বাজে ডম্প কোটি কোটি', 'ত্রিশ সহস্র দামামা', 'জয়ঢোল' ইত্যাদি

বহু বিচিত্র লোক-বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়; এই কাব্যেই রাবণের যুদ্ধ-যাত্রার বর্ণনায় আরও বিচিত্র লোকবাদ্যযন্ত্রাদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেখানে দেখি 'এক লক্ষ দগড়', 'দুই লক্ষ করতাল। / দুই সহস্র ঘন্টা বাজে, মৃদঙ্গ বিশাল॥ / ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে, তিন লক্ষ কাড়া। / চারি লক্ষ জয়ঢাক, ছয় লক্ষ পড়া॥ / বাজিল চৌরাশি লক্ষ শঙ্খ আর বীণে। / তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সনে॥ / ঢেমচা খেমচা বাজে দুই লক্ষ ঢোল। / তিন লক্ষ পাখোয়াজ, বিস্তর মাদল॥ / জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প। / পাখোয়াজ তবলা বাজে ত্রিভুবন কম্প।' লক্ষণীয়, উভয়ত্রই এত বিচিত্র লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের মূল লক্ষ্য কিন্তু ঐশ্বর্যময়তার সৃষ্টি; 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ হরগৌরীর বিবাহোপলক্ষে-ও নানা বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ ঘটেছে। 'দুন্দুভি বাজনা', 'খমক বেণুবীণা মৃদঙ্গ ভেরী নানা / বাদ্যেতে হইল কোলাহল' (কবিকঙ্কণচণ্ডী)। অন্যত্র, দারিদ্র্যতাড়িত শিব গৌরীর সঙ্গে কলহ করে যখন দেশান্তরে যেতে উদ্যত হয়েছেন, তখন সঙ্গে 'শিঙ্গা' ও 'ডমরু' (ঐ) নিতে কিন্তু তিনি বিস্মৃত হন নি। 'মনসামঙ্গল'-এ বেহুলা-লখীন্দরের বিবাহ-বর্ণনাতেও লোকবাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাই, 'মধুর মাদল বাজে কড়া গড়া সানী। / কাঁসর সুন্দর বাজে হরি হরি ধ্বনি'॥[১৮] (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : ১৭ শতক); 'অনুদামঙ্গল'-এ মহাদেবের দক্ষালয়ে যাত্রাকালে 'শিঙ্গা ঘোর বাজে' (ভারতচন্দ্র)। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী যেমন 'বাঁশী', শিবের তেমনি 'শিঙ্গা-ডমরু।'

উনিশ শতকের কাব্য-কবিতাতেও বাদ্যযন্ত্রের বিপুল সমাবেশ। পরিহাস প্রিয় কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'তপসে মাছ' কবিতাটির কথা স্মরণ করা যাক। উত্তরের লোক তপসে মাছের গুণ না জানায় পরিহাসপ্রবণ কবির উক্তি, 'ভাটি গাঙ' ছেড়ে যদি তপ্‌সে 'উজানের পথে' চলে, তবে 'শাঁক-ঘন্টা' বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে'। এখানে 'শাঁক-ঘন্টা' বাজানো অভ্যর্থনারই ইঙ্গিতবাহী। আবার ধর্মচারণাসূত্রেও লোকবাদ্যযন্ত্রাদির উল্লেখ লভ্য,'----কেন দেবালয়ে / বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘন্টা ঘটা রোলে' (দশরথের প্রতি কেকয়ীর পত্র : বীরাঙ্গনা : মধুসুদন)। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারায় দশরথের অধর্মাচরণে ক্ষুব্ধ কেকয়ীর মনে হয়েছে, দেবালয়ে এই সব বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি তথা পূজা-অর্চনাদি নিতান্তই প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিক থেকে এই সব বাদ্যযন্ত্রাদি পূজা-অর্চনা তথা ধর্মাচরণের সূচক হয়ে উঠেছে; অন্যত্র,

'বীণা বাঁশী মৃদঙ্গ মন্দিরা' (৬ষ্ঠ সর্গ : মেঘনাদবধ কাব্য : ঐ) বাজিয়ে প্রমীলা লঙ্কাপুরে সখীসহ প্রবেশ করেছেন। আবার নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯) বাঁশীকে দেখেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক হিসেবে। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান, তাই 'বাঁশী বিশ্বকন্ঠে বাজে অবিরল' (৫ম সর্গ : প্রভাস : ১৮৯৬); কোথাও বা অতীতচারণা-সূত্রে শঙ্খের ব্যবহার হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর (১৮৫৪—১৯৩০) কবিতায় মেলে,--'হায়রে কোথা সে সন্ধ্যা?' যে সন্ধ্যার কালে / ----'বাজাত গম্ভীর শঙ্খ মঙ্গলের ধ্বনি' (জন্মভূমি : দুঃখসঙ্গিনী :)। লোকসমাজে 'শঙ্খ' শুভসূচক বাদ্যযন্ত্র। কবিতাটিতেও শঙ্খ 'মঙ্গলের ধ্বনি'; শিশুর অকাল-মৃত্যুতে কবি মানকুমারী বসুর (১৮৬৩—১৯৪৩) মনে হয়েছে, 'বীণা বাঁশি সব বেসুরা বাজিল' (অতিথি : কনকাঞ্জলি) 'বীণা-বাঁশি'র 'বেসুরা' বাজা বিষণ্ণতারই সূচক; মেঘগর্জনের ধ্বনিরূপচিত্রণে লোক-বাদ্যযন্ত্রাদির ব্যবহার গিরীন্দ্র মোহিনীর কবিতায়,—'গুরু গুরু গুরু মৃদঙ্গ বোলনী / সরসা বরষা আওল অবনী' (স্বাগত : সিন্ধুগাথা); বাল্যস্মৃতি রোমন্থনেও বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব, 'পড়িছে মনেতে পূজার আরতি / ঢাকঢোল কাড়াদল' (বাল্যস্মৃতি : আভাষ ১৮৯০ : ঐ), কখনো 'কাঁসর-ঘন্টা'র ধ্বনি সন্ধ্যার সূচক হয়ে উঠেছে। কারণ সন্ধ্যা-কালে মন্দিরে সন্ধ্যারতিতে নিত্য কাঁসর-ঘন্টা বাজে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাই দেখি, যখন 'দিনের আলো নিবে এল সুয্যি ডোবে ডোবে' তখন 'মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা বাজল ঢং ঢং' (বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর : কড়ি ও কোমল ১৮৮৬)। অলস অবসর যাপনের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে বাঁশি। '....সারাদিন বাজাইলি বাঁশি' (এবার ফিরাও মোরে : চিত্রা ১৮৯৬ : ঐ) পরবর্তী চরণটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, '....কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ জনে,-....' 'শঙ্খ' এখানে জাগ-রণের আহ্বায়ক, মানব-আত্মার উদ্বোধক।

২। বাককেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি :

লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য-ধারায় সুপ্রচলিত ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গীতি, কথা, ভাষাগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

২। (১) ছড়া :—'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে শিশু শ্রীমন্তকে ভোলাতে জননী খুল্লনা একটি ছড়া ব্যবহার করেছেন। ছড়াটি হল,'........

আয়রে বাছা আয়। / কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন ধন চায়....'। ছড়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, এক স্নেহময়ী জননীর অপূর্ব পুত্র-বৎসল রূপ; শিশু পুত্রকে শান্ত করতে জননী সবরকম অসাধ্য কর্মসাধনেই প্রস্তুত। ছড়াটি সম্ভবত কোনো লৌকিক ছড়ারই পরিমার্জিত রূপ।[১৯] অন্তত ডঃ সুকুমার সেন তাই মনে করেন। তাঁর ধারণা, একালে লোক-সমাজে প্রচলিত 'আয় আয় চাঁদামামা' ছড়াটিরই প্রাচীন কোনো রূপ মুকুন্দ চক্রবর্তীর সমসাময়িক লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ মুকুন্দ-রামের কাব্যে সমকালে প্রচলিত লৌকিক ছড়াটি একটি নির্দিষ্ট লিখিত রূপ লাভ করলেও মুখে মুখে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজও তার লৌকিক রূপটি একেবারে বিনষ্ট হয় নি।[২০] আবার দ্বিজরামদেবের (১৭ শতক) 'অভয়ামঙ্গল'-[২১]এ একটি ছড়ার সাহায্যে যাদুশক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। খুল্লনাকে বিবাহ করলে ধনপতি লহনাকে অবহেলা করবে—এ আশঙ্কার কথা লহনা তার সখী 'সতী দ্বিজের রমণী'কে জানিয়েছে। 'সতী দ্বিজের রমণী' এর উত্তরে তাকে যাদুশক্তি-প্রয়োগের আশ্বাস দিয়েছে; ছড়ার মাধ্যমে যাদুশক্তির অমোঘ কার্যকারিতার কথা জানিয়েছে সে,—'আগ্না হোতে গুণ জান / ঝাটে আন জোট পান / সৈয়ার নামে পানে দেম খিলি / সৈইআ হই যাইব দাস থাকিব তোহ্মার পাশ / বলিতে নারিব মুখ মেলি / চালে চালে ভ্রমি চাহাঅ / চাল চাটি যথাএ পাঅ / সতার গএর মলা মাখি / ডাকডাকিনী সভা জানি / উড়ি যাএ পক্ষী আনি / এ বলি উড়াইতে পারি পাখি....' ইত্যাদি। লক্ষণীয়, ছড়ার ছন্দের আবরণে যাদুবিদ্যার এক রহস্যময় কৃষ্ণজগত এখানে ফুটে উঠেছে।

আঠারো শতকের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল[২২] কাব্যে একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া আছে। ছড়াটি ঐন্দ্রজালিক, মন্ত্রধর্মী। শিশু লাউসেনকে চুরি করতে এসে ইন্দা মেটে এই মন্ত্রধর্মী ছড়া প্রয়োগ করে নগরবাসীকে ঘুম পাড়িয়েছে,..'জাগ-জাগ-জাগ মাটি কাজে লাগে মোর / ময়না নগর জুড়ে লাগ্ নিদ্রা ঘোর' বলা বাহুল্য, এটিও Black magic-ভুক্ত।

পদ্যলেখক ঈশ্বর গুপ্তের মনের ঝোঁক ছিল গ্রাম্য ছড়া ও ছড়ার ছন্দের উপর। ছড়ারীতির প্রয়োগে তাঁর রঙ্গব্যঙ্গাশ্রয়ী কবিতাসমূহ রীতিমতো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। যেমন, বিধবাবিবাহ বিরোধী কবিতায়, 'অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা' (দুর্ভিক্ষ গীত ২ : কবিতা সংগ্রহ)। 'আয় রৌদ্র হেনে ছাগল দেব মেনে' এই লৌকিক ছড়াটির ছন্দ অনুসরণে কবি লিখেছেন, 'এই হাত ছাড়য়ে, গোপ

বুক চাড়য়ে....' (কবিতা সংগ্রহ)। আবার সুপ্রচলিত "আমার কথাটি ফুরোল। নটে গাছটি মুড়োল" ছড়াটির শেষাংশের ছন্দানুস্মৃতির উদাহরণ,-'নোড়বো না তো নোড়বো মুখে / পোড়বো রুকে চোড়বো বুকে' (— ঐ); প্রসঙ্গত, লৌকিক ছড়াটির প্রশ্নমূলক অংশটি স্মরণযোগ্য, 'গরুতে কেন খায় / কেন রে গরু খাস? / রাখাল কেন চরায় না? / কেন রে রাখাল চরাস না?..' ইত্যাদি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী' (১৮০০-১৮৮০)-র একাধিক কবিতায় ছড়ার ছন্দের অনুরণন শ্রুতিগম্য। উদাহরণ-স্বরূপ, 'সাবাস হুজুগ আজব শহরে' ও 'নেভার নেভার' কবিতার উল্লেখ করা যায়। মিউনিসিপাল ভোটের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে, 'সাবাস হুজগ আজব শহরে' (কবিতাবলী) কবিতাটিতে কবি বলেছেন, 'পীরবক্স, রামগোবিন্দ নব্য ভোটের যত। / ফ্রানচাইসের ফ জানে না হয় বুদ্ধিহত॥ / সারা-রাত্রি বসে জাগে ভোটের রগড়ে। / হদ্দ তরিবৎ পায় মশার কামড়ে॥' ছেলে ভুলোনো ছড়ায় শিশুকে ভোলানোর যে প্রয়াস, তাও কোনো কোনো কবির কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর (১৮৫৮-১৯২৪) একটি কবিতায়, 'আয় আয় চাঁদ চায় টিপ দিয়ে যা'—এই সুপরিচিত লৌকিক ছড়াটির স্মরণেই লিখিত হয়েছে, 'চাই আকাশের চাঁদ কপালের টিপ তোর' (চোর : শিখা : ১৮৯৬)।

আলোচ্য কালপর্বে লেখা রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) বহু কবিতায় ছড়ারীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) কাব্য-গ্রন্থের 'পত্র' কবিতাটিতে ছড়ার ছন্দের প্রভাব দুর্লক্ষ নয়, যেমন, 'এখানে যে বাস করা দায় ভন্‌ভনানির বাজারে / প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হটগোলের মাঝারে, / কানে যখন তালা ধরে উঠি যখন হাঁপিয়ে / কোথায় পালাই কোথায় পালাই জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।.......'; 'ক্ষণিকা'-র (১৯০০) 'সুখ দুঃখ' কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—'বসেছে আজ রথের তলায় / স্নানযাত্রার মেলা / সকাল থেকে বাদল হল, / ফুরিয়ে এল বেলা।' এছাড়াও এই কালপর্বে রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছড়ার ছন্দের প্রয়োগ করেছেন।

২। (২) **প্রবাদ:** বাংলা কাব্য-কবিতায় লৌকিক প্রবাদ-প্রয়োগের অজস্রতা বিস্ময়কর। চর্যাপদে কয়েকটি প্রবাদের সন্ধান মেলে, যেগুলি সম্ভবত লোকঐতিহ্যজাত। যেমন, 'চিত্ত হরিণ' নিজ 'অবিদ্যা' ও 'মাৎসর্য দোষে সকলের বদ্ধবৈরী'—এই তত্ত্ব প্রকাশার্থে সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ

সমকালে প্রচলিত একটি লৌকিক প্রবাদকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন,'—অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'[২৩] (৬ সংখ্যক পদ), অর্থাৎ নিজের মাংসই হরিণের শত্রু। প্রবাদটি পরবর্তীকালের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'কবিকঙ্কণচণ্ডী' ইত্যাদি কাব্যেও ঈষৎ পরিবর্তিতাকারে ব্যবহৃত। যেমন, 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' রাধার অসাধারণ রূপযৌবনে-আকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে রাধাকে পীড়ন করলে, নিজের রূপ যৌবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ 'সুন্দরী' রাধার বিলাপোক্তি স্মরণযোগ্য—'চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী। / নিজ মাসেঁ জগতের বৈরী' (দানখণ্ড)। একই সূত্রে সামান্য পরিবর্তিত রূপে একাধিকবার লৌকিক প্রবাদটি একাব্যে ব্যবহৃত। যেমন, 'আপনা গাএর মাসে হরিণা বিকলী' (ঐ)। এছাড়া, চর্যাপদে এমন তিনটি প্রবাদ পাই, যেগুলি আজও বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত। যেমন 'বরসুণগোহালী / কি সো দুঠ্য বলন্দেঁ'[২৪] (৩৯ সংখ্যক পদ : সরহ-পাদ) অর্থাৎ,—'বরং শূন্য গোয়াল ভালো / কি হবে মোর দুষ্ট বলদে'। 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো'—সুপরিচিত এই প্রবাদের যে প্রাচীন রূপটি প্রাচীন যুগের বাংলায় প্রচলিত ছিল, মনে হয়, চর্যাকার তা গ্রহণ করেছেন। এরকম আর একটি প্রবাদ হল—'হাথেরে কঙ্কণ মা লেউ দাপণ' (৩২ সংখ্যক পদ : ঐ), অর্থাৎ 'ওরে হাতে (তোর) কাঁকণ, দপণ নিস না'। সুপরিচিত 'হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা' প্রবাদটি এস্থানে স্মরণযোগ্য। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এও লৌকিক বহু প্রবাদের প্রয়োগ লভ্য। 'দানখণ্ডে' বালিকা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নানাভাবে উত্যক্ত। কিন্তু প্রতিকারের শক্তি নেই। শ্রীরাধার কণ্ঠে তাই স্বীয় দুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপোক্তি—'ললাট লিখিত বিধি খণ্ডন না জাএ' অর্থাৎ কপালের লিখন খণ্ডন করা বা এড়ানো যায় না। 'অদৃষ্টের ফল ; কে খণ্ডাবে বল,'—এই লৌকিক প্রবাদটি এখানে প্রত্যক্ষত প্রভাব-সঞ্চারী। 'রাধাবিরহ' খণ্ডে বিরহ-জর্জরিতা শ্রীরাধার উক্তি বিশেষ প্রবাদ-আশ্রয়ী, 'কাটিল ঘাএত লেম্বু রসদেহ কত' সুপরিচিত লোকপ্রবাদ 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে'-র কথা স্মরণে আসে।

'কৃত্তিবাসী রামায়ণে' ব্যবহৃত বহু প্রবাদের উৎস লোকসমাজ। রামের রাজ্যাভিষেকের দিন সমস্ত রাজ্য জুড়ে আনন্দ-উৎসবের সমারোহ। কিন্তু অভিষেকের পূর্ব-লগ্নে দশরথ কৈকেয়ীর অসম্ভব দাবীর কথা শুনে মুষড়ে পড়লেন। প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থে সে দাবী তাঁকে পূরণ করতেই হবে। এমন অসহায় মুহূর্তে তিনি আত্ম-সমালোচনা করেছেন। বুঝেছেন, স্ত্রীর

প্রতি দুর্বলতাই তাঁর এই বিপর্যয়ের কারণ। বলেছেন, 'স্ত্রী-বশ যে জন হয় তার সর্বনাশ।'[২৫] অন্যত্র, রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত রাবণের বিলাপোক্তিও লৌকিক প্রবাদকে অবলম্বন করেছে, 'এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি / একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি'।[২৬]

আবার 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে'—এই সুপ্রচলিত লৌকিক-প্রবাদটি 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-তে সুপ্রযুক্ত। সুন্দরী রমণী বেশে চণ্ডীকে দেখে বিভ্রান্ত ও শঙ্কাতুরা ফুল্লরা স্বামী কালকেতুর প্রতি তার অন্তরের ক্ষোভ ও অভিমানবশত 'চণ্ডীর গোধিকারূপ ধারণ অংশে' এ প্রবাদটি প্রয়োগ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে'-ও উক্ত প্রবাদের সাক্ষাৎ মেলে।

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র পূর্বোক্ত অংশে আর একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ ব্যবহৃত। উচ্চবংশের ধনবতী অপূর্ব সুন্দরী-কে স্ত্রী-রূপে কল্পনা করা যে 'আখেটি-নন্দনের' পক্ষে ধৃষ্টতা, পতিব্রতা ফুল্লরা সেকথা স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সপত্নী-ভীতা ফুল্লরার কন্ঠে স্বামীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ধ্বনিত হয়েছে,—'বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।[২৭] বলা বাহুল্য, এর ভিত্তি 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' এই সুপ্রচলিত লৌকিক প্রবাদটি। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-র (১৭ শতক) মনসামঙ্গলে মনসার প্রতি চাঁদের উক্তিতে এই প্রবাদটি সামান্য পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত—'বামন হৈয়া চাহ ধরিতে আকাশ।' প্রবাদটিতে মনসাকে পূজাদানে অনিচ্ছুক চাঁদের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা এবং চাঁদের পূজা প্রত্যাশিনী মনসার আকাঙ্খার হাস্য-করতাটুকু পরিস্ফুট।

মনসামঙ্গলের আর এক প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্তের (১৫ শতক) 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে দেখি, 'হাসান-হুসেনে'র সহকারী 'খোনকার'-কে সরাসরি শাস্তিদানে অপারগ রাখালেরা তাকে সুকৌশলে জব্দ করেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না'—এই লৌকিক প্রবাদটি কাব্যের আধারে সামান্য রূপান্তর লাভ করেছে, 'উর্দ্ধ আঙুলে কভু বাহির না হয় ঘি।'

'কাশীদাসী' মহাভারতেও[২৮] (১৭ শতক) একাধিক প্রবাদ সুপ্রযুক্ত। যেমন, 'রোগের শেষ, শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ রাখতে নেই'—এই সুপ্রচলিত প্রবাদটির অনুসরণে 'ব্যাধি-অগ্নি-রিপু-ঋণ একই সমান' প্রবাদের প্রয়োগ।

ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও প্রবাদ-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দুর্লক্ষ নয়। যেমন, 'পুত্র বিনা গৃহ যেন পদ্ম পত্রে জল।'

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এও[২৯] প্রবাদের বহুল প্রয়োগ লভ্য। শিবের দারিদ্র্য ও বার্ধক্য বর্ণনাসূত্রে সুপরিচিত প্রবাদের মার্জিত প্রয়োগ দেখা যায়। 'বুড়া-বয়সের ধর্ম ধরে হয় রোগ' প্রবাদটির ভিত্তিমূলে রয়েছে 'বুড়ো হলে ভীমরতি হয়' লৌকিক প্রবাদটি।

সাধক কবি রামপ্রসাদ-ও (১৮ শতক) তাঁর একাধিক শাক্তপদে সুপ্রচলিত প্রবাদসমূহের প্রয়োগ করেছেন। যেমন,—'অবু তবু গিরি সুতা পড়লে শুনলে দুটি ভাতি / ওরে জান না কি ডাকের কথা ; না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি'।

বহু বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ-ও তাঁর একাধিক পদে প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন, 'আমি কি মা-র **আটাশে** ছেলে', কিংবা '....মা বলে ডাকি এমনি আমার **বুকের পাটা**' ইত্যাদি।

উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতাতেও লৌকিকপ্রবাদ-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

'ঢেঁকি স্বর্গ গেলেও ধান ভানে'—এ প্রবাদটির অনুসরণে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫–১৯১৮) লিখেছেন, 'পুণ্য পদাঘাতে তার ঢেঁকি স্বর্গে উঠে/সরলা গৃহস্থ-বধূ অই চিঁড়া কুটে' (চিঁড়াকুটা : ফুলরেণু : ১৮৯৬), 'ফুলরেণু' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার নাম 'শাঁখের করাত', কবিতা-নামে বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের (Idiom) প্রয়োগ লক্ষণীয়।

চারদিকে ক্রমবর্ধমান অসাধুতায় ক্ষুব্ধ বিহারীলালের অসন্তোষটুকু 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২)-এর ৬২ সংখ্যক কাব্যসঙ্গীতে প্রবাদ-সহায়তায় ব্যক্ত হয়,—'কে জানে কে ছোট, বড় ঠক বাছতে গাঁ উজর'। আর প্রকৃতির তাণ্ডবে দরিদ্র মানুষের বিপর্যয় বর্ণনাসূত্রে প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার ঘটে তাঁর 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০) কাব্যে—'কাল তারা জানিত না স্বপনে কখন, / উঠিয়াছে অন্নজল চিরকাল তরে'। 'উঠিয়াছে অন্ন-জল'—এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশ 'মৃত্যু হয়েছে'—অর্থেই গৃহীত।

আবার, মধুসূদনের (১৮২৫–১৮৭৩) 'মেঘনাদবধ কাব্যের' 'কে বা রোধে প্রাক্তনের গতি' বা 'লিখিল বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল' প্রভৃতি পংক্তিতে যেন 'কপালের লিখন খণ্ডান যায় না'—প্রবাদেরই প্রতিধ্বনি।

'কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না' এই সত্যটুকুই যেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪–১৯০৭) স্মরণ করিয়ে দেন,—'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে' পংক্তিতে (সদ্‌ভাবশতক :)। মানকুমারী বসুর (১৮৬৩–১৯৪৩) : 'ভিখারিণী' কবিতায় (কাব্য কুসুমাঞ্জলি : ১৮৯৩) অনাথা ভিখারিণীর

দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণা সূত্রে প্রবাদ ব্যবহৃত হয়, 'ভাগাবানে তাড়াতাড়ি মরে / অভাগারে যমে ভয় করে।'

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র (১৮৯৯) 'নম্রতা' কবিতার মূল কেন্দ্রে রয়েছে একটি লোকপ্রবাদ,—'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দর'। সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে দেখা যাবে, বহু সাহিত্যিক প্রবাদেরই ভিত্তি লোকপ্রবাদ।

২। (৩) ধাঁধা : বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়'-এর চর্যাগুলি ধাঁধামূলক রচনা। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই লৌকিক ধাঁধার আঙ্গিকাশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন।

ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন,'......চর্যায় এমন শব্দ ও উপমা উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার আছে যাহার দুইটি করিয়া অর্থ—একটি সাধারণের জানা, অপর অর্থটি চর্যাকর্তাদের সাধনার পারিভাষিক, যেন তাঁহাদেরই প্রাইভেট কোড'।[৩০] লৌকিক ধাঁধার গঠনগত অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ধাঁধায় উল্লিখিত প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যে দুঃসাধ্য, তা ধাঁধাটিতেই বহু ক্ষেত্রে ঘোষিত হয়। এর উত্তরদাতা যে এক বিরল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, অনেক সময় তা-ও জানিয়ে দেওয়া হয়। চর্যাপদের ২ সংখ্যক পদে কুকুরী পাদও লৌকিক ধাঁধার এই গঠন বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করেছেন। লৌকিক ধাঁধার মতনই পদটির একেবারে অন্তিমে ঘোষণা করেছেন, 'কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইউ' অর্থাৎ 'কোটির মাঝে একজন মাত্র এর অর্থ সম্যক উপলব্ধিতে সক্ষম'।[৩১] আবার চর্যাপদের ৪১ সংখ্যক পদে-ও ধাঁধারীতি অনুসৃত, 'বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া। বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা'[৩২] (ভুসুকুপাদ)। যার সাধারণ অর্থ, 'বন্ধ্যাপুত্র যেমন খেলে বহুবিধ খেলা, / বালুকার তেলে, শশকের শিঙে, পুষ্পিত আকাশে'; আপাতদৃষ্টিতে উদ্ধৃত অংশটির বক্তব্য চূড়ান্ত অসংগত মনে হলেও তৎকালীন বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের কাছে এর ভিন্নতর, গূঢ় অর্থ প্রতিভাত ছিল। বলা বাহুল্য, চর্যাকার এখানে সংসারের অনুৎপন্ন স্বভাবের ইঙ্গিত পরিস্ফুটনে এ অসংগতির চিত্র রচনা করেছেন।

মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যে কবির জন্মকাল বা গ্রন্থরচনার কাল-নির্দেশে ধাঁধার রূপরীতিটি অনুসৃত। যেমন,—'শাকে শীমে জড় হৈল যত শক হয় / তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়॥ / রসের উপরে রস তায় রস দেহ / এই শকে গীত হৈল লেখা করি নেহ'॥

(ধর্মমঙ্গল : রূপরাম চক্রবর্তী ১৭ শতক)। সুখময় মুখোপাধ্যায় এর সমাধান করেছেন ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২ খ্রীঃ।[৩৩]

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র বণিক খণ্ডে ব্যাধ কর্তৃক-ধৃত শুকপাখি রাজসভায় পনেরটি ধাঁধা পরিবেশন করেছে। রাজসভার পণ্ডিতগণ অবশ্য এর সবগুলিরই সমাধানে সক্ষম হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য, এগুলির মধ্যে একাধিক ধাঁধা বিশ্বের নানা দেশের লোকসমাজে সুপ্রচলিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, একটি ধাঁধার উল্লেখ করা যায়,—'বিধাতা নির্মিত ঘর নাহিক দুয়ার। / যোগেন্দ্র পুরুষ তায়' আছে নিরাহার।। / যখন পুরুষবর হয় বলবান। / বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান-'এর সমাধান—ডিম; ইউরোপে 'ডিম' সম্পর্কিত অনুরূপ লৌকিক ধাঁধা লভ্য [যেমন, 'A long white born/Two roofs on it / And no door at all' (Irish)]। বাংলার লোকসমাজেও 'ডিম' সম্পর্কিত একাধিক ধাঁধা সুপ্রচলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'একটুখানি ঘরে, চূণকাম করে'। 'কবি-কঙ্কণ চণ্ডী' থেকে উদ্ধৃত অংশটি এই ধাঁধাটিরই সাহিত্যিক রূপান্তর। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে ধাঁধার সবিশেষ ভূমিকা লক্ষণীয়। এ কাব্যে লাউসেনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তির শর্তরূপ তাকে গণিকা সুরিক্ষা কয়েকটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছে। ধাঁধাগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন-স্বরূপ উল্লেখ করা যাক, 'খায় সে সহস্র মুখে পাক নাহি পায়। / উদরে আহার ভরে অস্থিরে বেড়ায়।। / তার প্রহারের ঘায় পরিত্রাহি ডাকে। / আহারে উগরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে'। এর সমাধান 'মাকু'।

লৌকিক ধাঁধার অন্যতম যে বৈশিষ্ট্য শর্ত-আরোপ তা উপরি-উক্ত ধাঁধাটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। রামকৃষ্ণ রায়ের (১৭ শতক) 'শিবায়ন'[৩৪] কাব্যে পরিবেশিত ধাঁধাগুলিতেও শর্তারোপ দেখা যায়। 'শিবায়ন'-এর ধাঁধাগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। শিবের বিবাহোপলক্ষে ঋষি-পত্নীরা বাসরগৃহে তাঁকে কয়েকটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি ধাঁধার উল্লেখ করা যেতে পারে,—'অপূর্ব জালিয়ার জাল না পরশে জল। / বৃক্ষের উপরে নাম্বে নহে ফুল ফল।। / দেবতার প্রীতি তাহে পাইতে দুরাপ / রস মধ্যে ক্ষার নহে লবণের বাপ /'। এর উত্তর 'মধু'। উল্লেখযোগ্য, এখানেও ধাঁধার শর্ত আরোপিত,—'উত্তর না দিয়ে তুমি না করিবে কেলি'। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ধাঁধাগুলির উত্তরদানে শিব লৌকিক প্রথা অবলম্বন না করে ধাঁধার আধারে উত্তর দিয়েছেন। বিদগ্ধ রমণীদের উদ্দেশ্যে লৌকিক প্রথা অনুসরণ না করে দেবাদিদেব শিবের

এই অভিনব পদ্ধতিতে উত্তর দান শিবায়ন রচয়িতার সংগতি-বোধের পরিচায়ক।[৩০] এছাড়া, বাংলার লোকসমাজে ধাঁধার আচারগত উপযোগিতার দিকটিও বিবাহবাসরে তার প্রয়োগে সুপরিস্ফুট।

উনিশ শতকের কাব্য-কবিতায় ধাঁধার প্রভাব দুর্লক্ষ নয়। ঈশ্বর-গুপ্তের 'আনারস' কবিতার সূচনা আকর্ষণীয় একটি লৌকিক ধাঁধার আশ্রয়ে—'বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর / সোনার টোপর শোভে মাথার উপর'। সুপরিচিত লৌকিক ধাঁধাটি হ'ল 'বন হতে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে'। কবিতার এই পংক্তিগুচ্ছ অধিকতর কবিত্বমণ্ডিত। ঈশ্বরগুপ্তের 'তপসে মাছ' কবিতাটি বহুলাংশে ধাঁধার লক্ষণাক্রান্ত। তপসে মাছ-সংক্রান্ত কবিতা হলেও এখানে একবারও তার নামোল্লেখ নেই। অবশ্য 'ম্যাঙ্গোফিশ' শব্দটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া সর্বত্রই তাকে ধাঁধার মতো নানা রূপকাবরণ আভাসে উপস্থিত করা হয়েছে। যেমন, 'কষিত কনক কান্তি কমনীয় কায় / গাল ভরা গোঁপ দাড়ি তপস্বীর প্রায় / মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীড়ে / মোহন-মণির প্রভা ননীর শরীরে / পাখী নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা / সুমধুর ক্লিষ্ট রস সব অঙ্গে মাখা......' ইত্যাদি। হেমচন্দ্রের 'দেশলাইয়ের স্তব' কবিতাতেও এরীতি অনুসৃত। যেমন, 'নমামি গন্ধক গন্ধ মুণ্ডটি গোলালো / সর্বজাতি প্রিয় দেব গৃহ কর আলো / শান্ত সভ্য অতি ধীর চাপে যতক্ষণ / ধাপে উঠে চ'টে লাল—গৌরাঙ্গ যেমন'। (কবিতাবলী)। সমগ্র কবিতাটি ধাঁধাধর্মী, রহস্যময় ও আকর্ষণীয়। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর (১৮৫০-১৮৯৮) 'উদাসিনী' (১৮৭৪) কাব্যের ৮ম সর্গের হিমালয় বর্ণনার প্রথমাংশে ধাঁধার রূপরীতিই যেন অনুসৃত,—'একি রে অদ্ভুত সৃষ্টি / দেখে লাগে ভয় / হৃদয়ে শোণিত স্রোত স্তব্ধ হয়ে যায়, / ঊর্দ্ধে বা পশ্চিমে পূর্বে দিগন্ত প্রসরি, / অনন্তের প্রতিমূর্তি রয়েছে বিস্তারি'। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর (১৮৭৫) 'আত্মবিবরণী' (৩য় সর্গ) অংশে স্পষ্টতই লৌকিক ধাঁধার প্রভাব বিদ্যমান, —'ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর / গুণ-জ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির! / নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি, / সেই দেব নিকেতন আলো করে কবি'। এখানে ধাঁধার চাতুর্যময় রহস্য-সৃষ্টির প্রয়াসের অনুসরণেই যেন কবি তাঁর আত্মীয়-স্বজনাদির নাম-মালা পেশ করেছেন। যেমন, 'দেবনিকেতন' হলেন দেবেন্দ্রনাথ, 'গুণ-জ্যোতি' অর্থে গুণেন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'

কাব্যগ্রন্থভুক্ত 'স্তন' কবিতাটিতে ধাঁধার প্রভাব লক্ষণীয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত লৌকিকতা ত্যাগ করে অলৌকিক মহিমায় কবিতাটি উন্নীত।

২। (৪) কথা: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-কবিতায় জনপ্রিয় নানা লোককথার প্রভাব-প্রেরণা কম নয়। মধ্য-যুগের বাংলা কাব্য-কবিতা সম্বন্ধেও একথা সত্য। মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত বাংলার স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত ব্রতকথাকে ভিত্তি করেই উদ্ভূত। 'মনসা-চণ্ডী' প্রমুখ দেবদেবীগণের ব্রতকথা ভিত্তি করেই মধ্যযুগে 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডী মঙ্গল' প্রভৃতি মঙ্গল কাব্যের স্রোতো-ধারার উদ্ভব হয়।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই কৃষ্ণ-কথা নানা রূপে ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এর কাহিনীর বহু অংশ নানা লোক-পুরাণ তথা লোককথা অবলম্বনে রচিত। এ কাব্যের 'জন্মখণ্ড'-এ লোক-পুরাণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান, রাধা ও কৃষ্ণের জন্ম-কাহিনী যার উজ্জ্বল প্রমাণ।

কংসাসুরের অত্যাচারে সৃষ্টি বিপন্ন। তখন নারায়ণ-প্রদত্ত একটি শ্বেত ও একটি কৃষ্ণ কেশ থেকে সৃষ্টি-রক্ষার্থে যথাক্রমে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাহিনী লোকপুরাণানুগ। বলা বাহুল্য, Motif বিচারে এ কাহিনী Supernatural Birth Motif-এর পর্যায়ভুক্ত। আবার এই খণ্ডেই গৃহীত পূতনা-বধের কাহিনীতে Magic Motif ক্রিয়াশীল। সেখানে দেখি, পূতনার স্তনপানের ছলে 'কাহ্ন তাক সংহরিল'। 'শূন্য পুরাণ', 'মনসামঙ্গল', 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি মধ্যযুগের কাব্যে লোকপুরাণের প্রভাব-প্রেরণা সুস্পষ্ট। শূন্য পুরাণের প্রথমেই সৃষ্টি-সম্পর্কিত লোকপুরাণধর্মী কাহিনী পরিবেশিত। সেখানে শুধু সৃষ্টি-কর্তা ধর্মেরই সৃষ্টি কথা নয়, 'ত্রিকোণ', 'পৃথিবী', 'বসুমতী', 'বিষ্ণু', 'শিব' থেকে শুরু করে 'হাঁস', 'কূর্ম', 'কালকূটবিষ' প্রভৃতি নানা দেবতা-প্রাণী-প্রাকৃতিক সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় 'কথা'-ও মেলে। শূন্য পুরাণের কাহিনী-বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, তা লোকসমাজে সুপ্রচলিত কাহিনীরই একটি লিখিত রূপ মাত্র। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে'-ও লোকপুরাণ প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, দশরথের চার পুত্রের জন্মের মূল কারণ,—'মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ। / এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ।। / শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ। / এক অংশ হইলা নারায়ণ (আদিকাণ্ড)'।

সাপের বিষ কেমন করে এল, ঢোঁড়া সাপেরই বা বিষ নেই কেন ইত্যাদি লোকপুরাণ প্রসঙ্গের উল্লেখ 'মনসামঙ্গল'-এ মেলে। সাপেরা বিষ কেমন করে লাভ করল, ঢোঁড়া সাপের বিষ নেই কেন— ইত্যাদি লোকপুরাণ-প্রসঙ্গের উল্লেখ নানা 'মনসামঙ্গল' কাব্যে গৃহীত। সেখানে দেখি, সাপদের সভায় মনসা সমস্ত সাপকে বিষ বণ্টন করে দিলেন। কিন্তু সেই সভায় যোগ দিতে ঢোঁড়া সাপ দেরী করে ফেলল। এ দিকে বিষ-বণ্টন পর্ব শেষ। তখন সর্প দেবী বললেন, 'আপনার দোষে তোরা না আইলি আগে / বঞ্চিত হইলে বুঝি কালকূটী ভাগে'। (মনসামঙ্গল: কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—১৭ শতক)। স্পষ্টতই এখানে লোকপুরাণের অনুস্থতি।

'শূন্যপুরাণের' মতো 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও লোকপুরাণের বিশ্ব-সৃষ্টি কাহিনী অনুস্ত। এক্ষেত্রে উভয় কাব্যের কাহিনীগত পারস্পরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। শূন্যপুরাণের মতো এখানেও দেখি, 'ইচ্ছা হল প্রভু তে কারণে। / স্বজিলে উলুক পক্ষে ॥ / তাহার উপর শুনে করি ভর। / ভুমিলে ভুবন লক্ষে।[৩৬] (শ্রীধর্মমঙ্গল: মাণিক গাঙ্গুলী)। উলূকের জন্ম-কথা, সৃষ্টির আদি অবস্থার বর্ণনা ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল'-এও মেলে।

দ্বিজরাম দেবের 'অভয়ামঙ্গল'-এও বিশ্ব-সৃষ্টির বর্ণনা সন্নিবিষ্ট। "নিরঞ্জন সেই প্রভু আকাশ স্বরূপ। / অকস্মাৎ জন্মে এক বিরাট পুরুষ"[৩৭] ব'লে শুরু হয়ে 'ত্রি-দেবতা', 'রবি-শশী', 'স্বর্গমর্ত্য-রসাতল'-এর সৃষ্টি-কথা বর্ণিত হয়েছে। রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন'-এও বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব গৃহীত। অধিকন্তু, 'ভুজঙ্গ', 'বৃশ্চিক', পিপীলিকাদির বিষময়তার কারণ, তিক্ত কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষের সৃষ্টি-রহস্য-বর্ণনা লোকপুরাণকে স্মরণে আনে।

পশু-পাখি-সংক্রান্ত বিচিত্র লোককথাও আলোচ্য কাল-পর্বের কাব্য-সমূহে উপস্থাপিত। সেখানে দেখি, পশু-পাখিরা সবাক, নানা মানবিক গুণসম্পন্ন। বলা বাহুল্য, লোকসমাজে প্রচলিত পশু-পাখি-সংক্রান্ত লোক-কথাগুলিতেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

রামায়ণে বানর ও হনুমানের ভূমিকা এপ্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। স্বভা-বতই, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এও বানর ও হনুমানের অনুরূপ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, যা প্রকৃতপক্ষে লোকঐতিহ্যজাত। সেখানে নীতিকথা শোনাতে কুকুরও সবাক, 'রাজ ব্যবহারে কুক্কুর নোয়ায় মাথা। / জোড় হাতে স্তব করে বলে নীতিকথা'।[৩৮] একাব্যে 'শুকু-শারি', 'জটায়ু' প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ পাখিরা নানা মানবিক গুণ-সম্পন্ন।

মঙ্গলকাব্যগুলিতেও পশু-পাখি-সংক্রান্ত লোককথার অনুরূপ প্রভাব মেলে। 'ধর্মমঙ্গল'-এ দেখি রাজকুমার উলূকপাখিকে প্রহার করলে সে ধর্মের কাছে এসে স্পষ্ট মানবিক ভাষায় অভিযোগ করল,'......রায় হরিচন্দ্র নাম। / তাহার তনয় মোরে।। / বাটুল নির্ঘাত মারে...'[৩৯] (শ্রীধর্মমঙ্গল : মাণিক গাঙ্গুলী). একাব্যে 'কদম', 'বকুল', 'অশ্বত্থ গাছ' প্রত্যেকেই সবাক। তারা কুশল কামারকে ভয় দেখিয়ে বৃক্ষচ্ছেদনে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

'মনসামঙ্গলে'-এও পশুপাখি নানা অসাধ্য সাধন করেছে। লঙ্কা থেকে তেঁতুল আনবার দুঃসাধ্য কাজের দায়িত্ব নিয়ে 'লঙ্কারে যাইতে পান উঠাইল টিয়া' (মনসামঙ্গল : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ[৪০]), 'চণ্ডীমঙ্গল'-এও পশুর মানবিক আচরণ লক্ষণীয়, যা পশু-সংক্রান্ত লোককথারই প্রভাবপুষ্ট। চণ্ডীর কাছে নিপীড়িত পশুদের অসহায় আবেদনের চিত্রে কবিকঙ্কণ তৎকালীন সমাজের অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের অসহায় রূপটিই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'কবিকঙ্কণ চণ্ডীর' এই অংশে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস মুকুন্দরামের উদার মানবিকতার দিকটিও লক্ষ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি স্মরণ-যোগ্য, 'কবিকঙ্কণের মমত্ব মানুষ ছাড়িয়ে পশুজগত পর্যন্ত বিস্তৃত। চণ্ডীর কাছে পশুদের আক্ষেপ পশুজীবনের উপর মানবিকতার অলংকরণ নয়। তখনকার দিনের অহরহ জীব-হত্যায় নিতান্ত বিক্ষুব্ধ কবির আন্তরিক ক্রন্দনের পরিচয় বাহক'।[৪১]

'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'র সৈয়দ আলাওল-কৃত (১৭ শতক) অংশে 'দিব্য এক সারি পাখি' বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে লোরের অন্তরে ময়নার জন্য অনুতাপ সঞ্চার করেছে।[৪২]

রূপকথার জগত স্বপ্নময়, অসম্ভবের জগত। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের জগতটিও অনেকাংশেই অলৌকিক। তাই অলৌকিক রূপকথার জগতের প্রভাব-প্রতিফলন সেখানে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি।

নিঃসন্তান রাজার দৈবযোগে সন্তান লাভ রূপকথার অন্যতম সুপরিচিত কাহিনী। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এ দশরথের সন্তান-লাভের কাহিনীতে মূল রামায়ণ অনুসরণে রূপকথার দৈবযোগে সন্তান-লাভের ঘটনা বিদ্যমান। আবার সীতার পাতাল-প্রবেশের বর্ণনা-ও রূপকথার পাতালপুরীকে স্মরণে আনে। সীতাকে পাতালে নিয়ে যাবার জন্য,—'সে সপ্ত পাতাল হৈতে হৈল এক দ্বার / অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ সিংহাসন, / দশ দিক আলো

করে এ মর্ত্য ভুবন।.........[৪৩] ইত্যাদির বর্ণনায় এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, কবি-কল্পনায় পাতালে এক ঐশ্বর্যময় রাজ্যের অবস্থান ছিল, আর এই কল্পনা রূপকথারই প্রভাবপ্রসূত।

চণ্ডীমঙ্গলের 'বণিক' খণ্ডের 'লহনা-খুল্লনা' চরিত্রের পরিকল্পনা রূপ-কথার 'দুয়োরাণী-সুয়োরাণী'র প্রভাবজাত বলে মনে হয়। এ কাব্যের শ্রীমন্তের ভূমিকা রূপকথার দুঃসাহসী রাজপুত্রের মতো। 'মনসামঙ্গল'-এ চাঁদ-মনসার বিবাদ-নিষ্পত্তিতে বেহুলার সাফল্য রূপকথার কনিষ্ঠা পুত্র-বধূর কৃতিত্বকে স্মরণ করায়।

লোকঐতিহ্যের অন্তগত লোকইতিহাস-কথা বা কিংবদন্তী-ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতার নানা স্থানে গৃহীত হয়েছে।

'ধর্মমঙ্গল'-এর কাহিনীর ইছাই ঘোষকে অনেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করেন। 'ঐতিহাসিকদের কাছে তিনি 'ঢেক্করী'-র ঈশ্বর ঘোষ বলে খ্যাত। 'তিনি ঢেকুরের ইছাই ঘোষ এবং বর্ধমান জেলার গোপভূম রাজ্যের অন্যতম গোপরাজ বংশধর, উত্তর রাঢ়ের স্বাধীন সামন্ত রাজা।'[৪৪] উল্লেখযোগ্য, ১৮৩৩ সালের কিছু আগে দিনাজপুর জেলায় রামাগঞ্জ গ্রামে ঈশ্বর ঘোষের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, এই তাম্রশাসনের ভিত্তিতে বলা যায়, 'ঈশ্বর ঘোষ ১৮ শতকের এক সামন্ত রাজা, মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন।[৪৫] 'ধর্মমঙ্গল'-এর লাউসেন চরিত্রটিরও ঐতিহাসিকতায় অনেকে বিশ্বাসী।[৪৬] বর্ধমানের গোপভূমের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, যে স্থানীয় 'ত্রিষষ্টিগড' বা 'ঢেকুরে' লাউসেন ইছাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেখানে 'লাউসেন-কুণ্ড' নামে একটি কূপও আছে।[৪৭]

আবার মেদিনীপুরের 'ময়না'-র সঙ্গে কর্নসেনের রাজ্যের রাজধানী ময়নাপুরের ঐতিহাসিক যোগ বিদ্যমান বলে অনেকে মনে করেন।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, 'ধর্মমঙ্গলের' কয়েকটি চরিত্র ও হয়তো কিছু কাহিনীও লোকঐতিহ্যের অন্তর্গত ইতিহাস কথা বা কিংবদন্তীর প্রভাবজাত।

'গোরক্ষবিজয়'-এর গোরক্ষনাথ, মীননাথ প্রমুখ গুরুগণ ও 'ময়নামতী-গোপীচন্দ্র' বৃত্তের রাজা মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতী, গোপীচন্দ, অদুনা-পদুনার বাস্তব-অস্তিত্বে অনেকে আস্থাশীল।

'Asiatic Society' পত্রিকায় (১৮৯৮)—প্রকাশিত 'Antiquity of Rajasthan' প্রবন্ধে সর্বপ্রথম গোপীচন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি

বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রলিপি অনুসারে পরবর্তী-কালের অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ ও ঐতিহসিকেরা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বাংলার রাজা গোবিন্দচন্দ্রকেই পুঁথি সাহিত্যের গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র বলে মনে করেছেন[৪৮]।

চর্যাপদের একাধিক সিদ্ধাচার্যের সঙ্গে 'গোরক্ষবিজয়'-এর কাহিনীর একাধিক নাথগুরুর অভিন্নতার সমর্থনে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়'-এর (১৩৫৬ বিশ্বভারতী) ভূমিকায় ডঃ সুকুমার সেন কয়েকজন চর্যাকারের সঙ্গে 'গোর্খবিজয়'-এর মীননাথ, জালন্ধর, কানফা প্রমুখের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন (তাঁর মতে, মীননাথ হলেন লুইপা, জালন্ধর পা, কানফা হলেন যথাক্রমে হাড়িপা, কাহ্নপা)।

শুধু ব্যক্তি নয় 'গোখবিজয়'-এ বর্ণিত কাহিনীর 'ডাহকা' নগরের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মতে, দক্ষিণ রাঢ়ে বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমান্তে "ডাউকো গ্রামই সম্ভবত এই, ডাহকোনগর"।[৪৯]

শ্রীভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'য় (১৯৭৮ কলকাতা, পৃঃ ৫৭) বলেছেন, '......হাড়িপা, কানুপা, মীননাথ, গোরক্ষ-নাথ ইত্যাদি সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেই এঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল'। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমাণ করেছেন যে, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, ময়নামতী প্রমুখের জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই 'গোর্খবিজয়' বা 'ময়না-মতীর গান' জাতীয় তাঁদের সম্বলিত নানা কাহিনী সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে।[৫০] সুতরাং 'সর্বভারতীয়' ভাষাতেই প্রচলিত ঐতিহাসিক কিংবদন্তী ভিত্তি করেই 'গোর্খবিজয়'-এর গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর কাহিনী গড়ে উঠেছে—এমন অনুমান অমূলক নয়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'ভবানন্দ মজুমদার' পালায় দেখি, দিল্লীর বাদশাহ্ ভবানন্দ মজুমদারকে আটক করলে, ভূত-প্রেতগণ বিপুল উদ্যমে দিল্লী আক্রমণ করেছে, '—ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী। / গুহ্যক দানবদানা / ভৈরব রাক্ষস খোক্কস বোক্কস / সমরে দিলেক হানা' (অন্নদামঙ্গল)।[৫১]

উল্লেখযোগ্য, যুগের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য-সূত্রে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় অলৌকিকতার প্রভাব অবিসংবাদিত। এই প্রভাবের পথ ধরে লোকসমাজে সুপ্রচলিত বহুবিচিত্র অলৌকিক কথারও সাক্ষাৎ মেলে।

কিন্তু অলৌকিকতা প্রায় সব লোককথারই অন্যতম সাধারণ একটি উপাদান বলে এখানে 'অলৌকিক কথা' নামে লোককথার স্বতন্ত্র কোন শাখা-বিভাজন করা হয় নি।

উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতায় লোককথার প্রভাব-প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত একেবারে দুর্লভ নয়।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৪-১৯০৭) 'বিশ্বের শিল্পচাতুরী' (সদ্ভাব-শতক) কবিতাটিতে লোকপুরাণের প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিদ্যমান। সেখানে দেখি, 'শস্যের ক্ষেত্র' থেকে শুরু করে 'ময়ূর কলাপচয়'-এ সবেরই স্রষ্টা 'নাথ' (ঈশ্বর) বলে কল্পিত; হেমচন্দ্রের একাধিক কবিতায় সৃষ্টি সম্পর্কিত লোককথার প্রভাব প্রতিফলিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, 'কবিতাবলী' গ্রন্থের 'প্রলয়', 'গঙ্গার উৎপত্তি', 'মণিকর্ণিকা' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্মরণীয়, 'মণিকর্ণিকা'র প্রথমেই কবির স্বীকৃতি, 'কোন্‌কালে—এই কথা শুনি লোকমুখে। / শিব শিবা তপস্যায় ভ্রমিছেন বনে। ....' ইত্যাদি; 'দেবনিদ্রা' (সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী'তে সংকলিত, ১৩৬১) কবিতাটিতে লোকপুরাণের প্রভাব প্রত্যক্ষ-প্রতিফলিত। সেখানে দেখি, 'অবনী ত্যজিয়া' 'অমর আলয়ে' প্রবেশ করলে দেখা যাবে, 'বায়ু, হরি, হর, মরালবাহন, / দেখিবে ভাসিছে কারণ জলে'। ঐ কবিতারই অন্যত্র, 'জগৎ-স্বরূপ' নিয়ে যখন মহামতি মানবসন্তান চিন্তারত, তখনই 'আয়রে মানব সহসা অমনি-/ পূরিশূন্য দেশ হলো দৈবধ্বনি—' লোকসৃষ্টিকথাই আমাদের স্মরণে আনে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যের 'উপহার' অংশে লোকসৃষ্টিকথা অনুসরণে সমাজসৃষ্টি, সংসার-সৃষ্টি পশু-সৃষ্টির বর্ণনা মেলে।

উনিশ শতকের কাব্য-চর্চায় রূপকথাও কখনো কখনো প্রভাব-সঞ্চারী। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) সুবিখ্যাত রোমান্টিক রূপককাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কতকাংশে Edmund Spencer (১৫৫২? —১৫৯২)-এর রূপকথাধর্মী কাব্য The Faerie Queene-এর (১৫৯০) আদর্শে রচিত। কবি কল্পনাসুন্দরীকে লাভ করবার উদ্দেশ্যে যেভাবে স্বপ্নরাজ্যে যাত্রা করেছেন এবং পথের নানা বিচিত্র বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেছেন, তাতে রূপকথার প্রভাব-প্রতিফলন সেখানে দুর্লক্ষ নয়। বিশেষত ৩য় ও ৪র্থ সর্গের স্বপ্নরাজ্যের বর্ণনায় রূপকথারই জগত যেন ভিন্নতরভাবে উপস্থাপিত। আলোচ্য কালপর্বে রচিত রবীন্দ্র-কাব্যেও রূপকথার প্রভাব লক্ষণীয়। বিভিন্ন সূত্রে ও তাৎপর্যে নানা কবিতায় তা প্রযুক্ত।

শিশু মনের স্বপ্ন-কল্পনাময় জগতটির ছবি আঁকতে গিয়ে কবি রূপকথার রঙে-রসে সে ছবির ক্যানভাসটি ভরিয়ে তোলেন। যেমন, 'কোন সমুদ্রের কাছে / মায়াময় রাজ্য আছে, / সেথা উড়ে আসে পাখির ঝাঁকের মতো / কত মায়া, কত পরী, রূপকথা শত শত' [পুনর্মিলন : প্রভাতসংগীত : (১৮৮৩)]; আবার জ্যোৎস্নার অপরূপ সৌন্দর্য কবির অন্তরে আনে রূপকথার মায়াময় দ্যোতনা। তাঁর মনে হয়, 'অতি সুদূর পরীর দেশে / সেথান থেকে বাতাস এসে / কানের কাছে কাহিনী শুনায়।' [মাতাল : ছবিও গান (১৮৮৪)]। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে, বাংলার রূপকথার জগতের দুএকটি স্থানে যে পরীর সাক্ষাৎ মেলে, তা বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি নয়; তা পাশ্চাত্য এবং মুসলিম জগতে প্রচলিত রূপকথার প্রভাবজাত।

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে রূপকথার প্রভাব অধিকতর সক্রিয়। রূপকথাকে সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরে—স্মৃতির মধুর রসে কবিতা লেখার ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ইতঃপূর্বেই প্রকাশ করেছিলেন।[৫২] 'সোনার-তরী'-র 'বিম্ববতী' কবিতাটি এই ইচ্ছারই ফসল; বাংলাদেশের সুপরিচিত একটি রূপকথা কবিতাটির অবলম্বন। কবি রূপকথাটি তাঁর অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞার কাছ থেকে শুনেছিলেন।[৫৩] তবে কাহিনীটির সঙ্গে পাশ্চাত্যে প্রচলিত একটি অতি জনপ্রিয় রূপকথারও সাদৃশ্য মেলে। সুবিখ্যাত Snow White-এর কাহিনী ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে 'বিম্ববতী'-র কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবে পাশ্চাত্য কাহিনীটির সাত বামন সেখানে অনুপস্থিত। উল্লিখিত 'মায়াময় কণক দর্পণ'-এর উল্লেখ রূপকথার অলৌকিক আয়নাকেই স্মরণে আনে। বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত 'পুষ্পমালা'র রূপকথার অংশ-বিশেষ অবলম্বনে 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' (সোনার তরী) কবিতাটি রচিত। কবিতাটিতে রূপকথার প্রয়োগে কবি রোমান্টিক প্রেমের চিরসজীব জগতটির অপূর্ব দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। 'নিদ্রিতা'য় (ঐ) বাংলার সুপরিচিত রূপকথার পাতালপুরীর বন্দিনী রাজকন্যার কাহিনীর অনুরণন মেলে। বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর সম্পাদিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'-তে, 'ঘুমন্তপুরী' নামে যে রূপকথাটি সংগ্রহ করেন, তার সঙ্গে 'নিদ্রিতা' কবিতাটির বিষয়গত সাদৃশ্য বর্তমান। এখানেও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রূপকথার বিশেষ ভূমিকা। এছাড়া 'সুপ্তোত্থিতা' (ঐ), 'চুরি নিবারণ' (কণিকা) ইত্যাদি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রূপকথার নানা অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন।

ঐতিহাসিক লোককথা তথা নানা কিংবদন্তী অবলম্বনেও এ যুগের একাধিক কাব্য রচিত হয়েছে। যেমন, উড়িষ্যার লোকসমাজে সুপ্রচলিত রোমান্টিক কিংবদন্তী রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭–১৮৮৭) 'কাঞ্চী-কাবেরী' (১৮৭৯)। কাব্যের কাহিনীর ভিত্তিভূমি; নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭–১৯০৯) 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) কাব্যটি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত।

২। (৫) গীতি: লোকসাধারণের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লোকসংগীতে। স্মরণযোগ্য, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল মূলত গেয়। অনেকের মতে, লোকসঙ্গীত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের উৎসস্থল। আবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলনের অভাবে তা প্রত্যাবৃত হয়ে লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।[৩৪] এই তত্ত্বের আলোকে বলা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-কবিতায় লোকমানসের স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রকাশ-মাধ্যমটির প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া প্রায় অনিবার্যই ছিল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত 'নাটগীত' জাতীয় রচনা। এ প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে, এর 'পালাগুলি ঝুমুরের পালা হিসাবে সাজানো'।[৩৫]

যে কীর্তনের ভক্তি-রসস্রোতে চৈতন্য আপামর জনসাধারণকে রসাপ্লুত করেছিলেন, তার ভিত্তিভূমিটিও মূলত লোকঐতিহ্যাশ্রিত।

এ প্রসঙ্গে লোকসমাজে প্রচলিত 'বারমাসি' বা 'বারমাস্যা' গীতি অবশ্য আলোচ্য। ভারতীয় উপমহাদেশে সব আঞ্চলিক সাহিত্যেই বারো-মাসির প্রভাব লক্ষণীয়। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তিমনের যোগ বার-মাস্যায় লক্ষিত হয়। এর সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্রেরও সন্ধান মেলে। প্রাচীনযুগ থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে ঋতু পরিবর্তনের এই প্রভাব নানা সূত্রে আত্মপ্রকাশলাভ করেছে।[৩৬] বারমাস্যা-বর্জিত বাংলা কাব্য মধ্যযুগে নিতান্তই স্বল্প-সংখ্যক। মানবসমাজ ও সভ্যতা আদি যুগ থেকেই প্রকৃতি-নির্ভর। মাঠের ফসলের ওপর তার জীবন নির্ভরশীল। আর প্রকৃতি সুপ্রসন্ন হ'লে তবেই সেই ফসল ফলবে। সুতরাং প্রকৃতি নির্ভর সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানবসমাজ নানাভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিজের অবিচ্ছেদ্য যোগ অনুভব করেছে। জীবিকার তাগিদে, বিভিন্ন মাসের প্রকৃতিকে তাদের গানে ধরে রাখার প্রবণতা থেকেই বারমাস্যার সৃষ্টি।[৩৭] বারোমাস্যাগুলি প্রকৃতপক্ষে লোকসঙ্গীতেরই পর্যায়ভুক্ত। মধ্য-যুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় বারোমাস্যাগুলি মূলত লোকসমাজে সুপ্রচলিত

বারমাস্যারই অনুকৃতি বলে ডঃ মযহারুল ইসলাম তাঁর মত প্রকাশ করেছেন।[৩৮]

মধ্যযুগের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'শূন্যপুরাণ', 'বৈষ্ণবপদাবলী', 'গোরক্ষ বিজয়', 'চৈতন্য ভাগবত', 'শিবায়ন', 'অন্নদা-মঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে বারমাস্যা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর 'রাধাবিরহ' খণ্ডে বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার 'বরিষা চারিমাস'-এ তাঁর করুণ অবস্থাটি বারমাস্যার ঢঙে-ই বর্ণিত।

রামাই পণ্ডিতের (?) 'শূন্য পুরাণ'-এ 'রাশি নির্ণয়' প্রসঙ্গে বারমাস্যার রূপরীতিটি গৃহীত, কোন্ মাসে কোন্ রাশি। / চৈত্র মাস মীন রাশি।। / কোন্ মাসে কোন্ রাশি। / বৈশাখ মাস মেস রাশি।। /....' ইত্যাদি। লোচনদাসের (১৬ শতক) চৈতন্য-বিষয়ক একটি পদে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বারোমাসে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিচিত্র বিরহবেদনার রূপ ক্রমিকানুসারে বর্ণিত; সেখানে 'বৈশাখে বিষম ঝড়', 'জ্যৈষ্ঠে রসাল রস', 'আষাঢ়েতে রথযাত্রা', 'শ্রাবণে নূতন বন্যা' ইত্যাদি বিচিত্র পরিস্থিতিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-জর্জরিতা মূর্তিটি বারমাস্যার চালচিত্রে সুপরিস্ফুট। 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'-র 'ফুল্লরার বারমাস্যা' তো বাংলা সাহিত্যে সুবিখ্যাত। এখানে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন কঠোর জীবন-সংগ্রাম বাস্তব চিত্ররূপ লাভ করেছে। মুকুন্দ-প্রতিভার অসামান্য শিল্প সার্থকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, এই 'ফুল্লরার বারমাস্যা' অংশটি। লোকগীতির গঠনগত অন্যতম বৈশিষ্ট্য,—ধুয়াপদের ব্যবহার। গানের প্রতি স্তবকান্তে বিশেষ পংক্তি বা পংক্তির অংশ বিশেষের অবিকৃতভাবে পুনরাবৃত্তিই 'ধুয়াপদ' নামে অভিহিত। মধ্যযুগের কবিতায় বহু স্থানে এই ধুয়াপদ-ধর্মিতা নজরে পড়ে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল', ইত্যাদি নানা কাব্যের ভণিতাযুক্ত পংক্তির পুনরাবৃত্তি ধুয়াপদেরই প্রভাব-প্রসূত, মনে হয়। শুধু ভণিতাযুক্ত পংক্তি-ই নয়, অন্যান্য পংক্তির ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য সুলভ-দৃষ্ট। যেমন, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র 'ফুল্লরার বারমাস্যা' অংশে প্রতি মাসের দুঃখ-বর্ণনার শেষে সবিশেষণ বর্ণিত মাসটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনারম্ভে 'সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন', চরণটির অংশবিশেষ 'পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস' বর্ণনান্তে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। হয়তো গ্রীষ্মের দাবদাহের তীব্রতাকে তীব্রতর করে তোলাই এ জাতীয় প্রয়োগের গূঢ় উদ্দেশ্য।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ 'ভাটিয়ালি' গীতির প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। এখানে ভাটিয়ালি রাগের উল্লেখই শুধু নয়, বিষয়গত দিক দিয়েও 'ভাটিয়ালি'-র সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র নানা স্থানের বিষয়গত সাদৃশ্য কষ্ট-কল্পিত নয়। বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গের 'ভাটিয়ালি' গানের সঙ্গে এ কাব্যের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই।

মানুষ ও তার সমাজের বিবর্তনের মূলে শ্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাস্তবিক, সেক্ষেত্রে প্রকৃতির পরেই শ্রমের স্থান। শ্রমহীন জীবন অকল্পনীয়। মধ্যযুগের জীবনের রূপকার কবিগণের কাব্যেও কখনও কখনও শ্রমসঙ্গীত অনুরণিত হয়েছে। একাধিক 'মনসামঙ্গল'-এ 'সারি' গানের উল্লেখ মেলে। বিপ্রদাস পিপলাই-এর (১৫ শতক)-এ 'মনসা-বিজয়'-এ চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার বর্ণনাসূত্রে 'সারি' গানের উল্লেখ মেলে,—"পূজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদ দণ্ডধর / হরষিতে সারি গায় নায়েব নফর'। দ্বিজবংশী দাস-এর (১৭ শতক) 'পদ্মা পুরাণ'-এও অনুরূপ প্রসঙ্গে 'সারি' গানের উল্লেখ লভ্য, 'চৌদ্দ ডিঙ্গা বহিয়া যায়। / পাইক সবে সাইর গায়'। আবার শাক্ত পদাবলীর জনপ্রিয়তা মূলত যে 'মালসী' সুরের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তার উৎসভূমিটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত 'মালশ্রী' রাগেরই লৌকিক রূপ।[৫৯]

মধ্যযুগে রচিত অজস্র বৈষ্ণবগীতির উৎসমূলে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শন ও সাহিত্যে' গ্রন্থে লৌকিক প্রেম-গীতির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

এছাড়া এযুগের কাব্যে পাঁচালি গানেরও ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কাব্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূলত রাম পাঁচালী। ডঃ সুকুমার সেন স্পষ্টতই বলেছেন, 'কৃত্তিবাস গাহিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছিলেন, পড়িবার জন্য নহে'।[৬০]

আবার কবিগানের উৎসমূল বিচার-বিশ্লেষণ করে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, কবিগান মূলত ঝুমুর গীতির আশ্রয়ে ও প্রভাবে লালিত হয়েছিল।[৬১]

ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যচর্চায় লোকগীতির অনিবার্য প্রভাব বর্তেছিল, নাগরিক সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার পরেও এ প্রভাব তিনি কোন দিনই অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর মনের ঝোঁক ছিল লোকগীতির দিকে। সে কারণেই হাপু, বাউল প্রভৃতি লোকগীতির সুর তাঁর কবিতায় নানা স্থানে সাদরে গৃহীত; 'বোধেন্দুবিকাশ'-এর প্রস্তাবনায় হাপু গানের

প্রভাব লক্ষণীয়, 'ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না, বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে? / এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা, হাসবে লোকে, হাসবে লোকে /——' ইত্যাদি। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বাউল বিংশতি' প্রকৃতপক্ষে, কবি রচিত বাউল গানের সংকলন। এর বিষয়, গঠনরীতি, এমন কি নামকরণে পর্যন্ত বাউল গানের প্রভাব সুস্পষ্ট।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী'র একাধিক কবিতায় পাঁচালী রীতির অনুরণন মেলে। উদাহরণ-স্বরূপ, 'দেশলাইয়ের স্তব', 'গঙ্গার উৎপত্তি', প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের বিভিন্ন কবির কবিতায় ধুয়াপদ-ধর্মিতা লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে বলদেব পালিতের (১৮৩৫–১৯০০) 'ভুল না আমায় নাথ' (কাব্যমালা) মানকুমারী বসুর 'সাধ' (কাব্যকুসুমাঞ্জলি) প্রভৃতি কবিতাগুলি স্মর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থের 'প্রতিনিধি' কবিতাটিতে চিত্রিত রামদাসের মূর্তিটি বাংলার বাউলকেই মনে করিয়ে দেয়। 'একতারে দিয়া তান / রামদাসে গাহে গান / আনন্দে নয়নজলে ভাসি'—এই বর্ণনায় আমাদের পরিচিত বাউলের মূর্তিটিই যেন প্রতিভাত।

২। (৬) নাট্য: বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়'-এর ১০ ও ১১ সংখ্যক চর্যায় কাপালিকদের নটবৃত্তির উল্লেখ মেলে। চর্যাপদগুলিতে বর্ণিত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুমান অযৌক্তিক নয় যে, কাপালিকদের উল্লিখিত নটবৃত্তি লোকনাট্য অবলম্বনে উদ্ভূত হয়েছিল; বড়ু চণ্ডীদাসের (১৫ শতক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ লোক-নাট্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়-বিদ্বদ্বল্লভের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতি-নাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য।'[৬২] লক্ষণীয়, এ কাব্যের অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়ায়ির সংলাপ-ভিত্তিক; ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাট্যগীতি কাব্য। কাব্যটির গঠন থেকে মনে হয় আসলে এটি ছিল পাঞ্চালিকা-নাট্য অর্থাৎ পুতুল নাচ।[৬৩] ডঃ সেন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লোকনাট্যপালার প্রভাবপ্রসূত; এর গানগুলির শীর্ষদেশে গীত-অভিনয়াদির নির্দেশ, উক্ত মন্তব্যেরই পরিপোষক।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত' (বৃন্দাবন দাস: ১৬ শতক) 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' (কৃষ্ণদাস কবিরাজ-আনু-১৫৩০–১৬১৫) প্রভৃতি চৈতন্য-জীবনী কাব্যগুলির নানা অংশে লোক-নাট্যানুগ উত্তর-প্রত্যুত্তর রীতি লক্ষ্য

করা যায়। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এর মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখি, 'একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে / আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে' এখানে 'অঙ্ক' অর্থে 'প্রভু' নাটকের অঙ্কের কথাই বলেছেন। তারপর 'সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া / বলিলেন প্রভু 'কাচ সজ্জ কর' গিয়া ('কাচ সজ্জ' অর্থে নট-বেশবাস)। বলা বাহুল্য, 'কাচসজ্জ' করে যে নাটক অভিনীত হয়েছে, তা যে লোকনাট্যেরই পর্যায়ভুক্ত, পটভূমিবিচারে এ অনুমান অলীক নয়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' ১ম খণ্ডে ব্যাসের কার্যকলাপে যে নাট্য-রস সঞ্চারিত হয়েছে তা কৌতুকময় লোকনাট্যকেই স্মরণে আনে। সেখানে হরির গুণকীর্তন করে ব্যাস শিবনিন্দা শুরু করলে 'শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে / ক্রোধ-দৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল / ভুজস্তম্ভ কন্ঠরোধ ব্যাসের হইল / চিত্তের পুতুলি প্রায় রহিলেন ব্যাস / শৈবগণ কত মত করে উপহাস'। ব্যাসের এই দুরবস্থার চিত্রে যেমন কৌতুকরস উপভোগ্য তেমনি তা নাট্য রস-সিক্তও। এরপর ব্যাসের অন্ধ হরভক্তি ও হরিবিদ্বেষে বিরক্ত হর কাশীতে তাঁর অন্ন বন্ধ করে দিলে, ভিক্ষুক ব্যাসের ও তাঁর প্রতি কাশীবাসীর নানা আচার-আচরণ লোকনাট্য রসাশ্রয়ী কৌতুক পালারই প্রভাবপুষ্ট বলে মনে হয়। এছাড়াও শিবের বৃদ্ধ বেশে গৃহস্থের অভিনয়, অন্নপূর্ণার 'জরতী'-র ব্যাসকে উত্যক্ত করার দৃশ্য লোকনাট্য-লক্ষণাক্রান্ত।

২। (৭) **ভাষাকেন্দ্রিক লোকঐতিহ্য** : আলোচ্য কাল-পর্বের কাব্য-কবিতায় লোকসমাজে প্রচলিত ভাষাগত নানা বৈশিষ্ট্যের প্রভাব-প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। লোকসমাজকৃত স্থান বা ব্যক্তির নামকরণ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের অতি ব্যবহৃত বাক ভঙ্গিটিও নানা সূত্রে কবিতায় প্রযুক্ত। এই পর্যায়ে আমরা লোকসমাজে প্রচলিত বিচিত্র স্থান-ব্যক্তি নাম, শব্দ-বিকৃতি, শব্দদ্বৈত, সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়াপদ অন্তর্ভুক্ত করেছি।

২। (৭) [১] **নামকরণ** : পূর্ব-বিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যে লোক-ঐতিহ্যানুগ একাধিক স্থান ও ব্যক্তির নাম মেলে। বর্ণনায় সরসতা সৃষ্টির প্রয়াস ও কবিদের বাস্তবানুগতাই এই সমস্ত নামকরণে লভ্য।

(ক) **লোকঐতিহ্যানুগ স্থান-নাম** : অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি জগতের নানা বস্তু, কিংবদন্তী, ব্যক্তি ও উপাধি, ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় অনুসারে নানা স্থান-নাম আলোচ্য কালপর্বের

বাংলা কাব্য-কবিতায় গৃহীত। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকটি বিচিত্র শব্দ কখনও নামের আদিতে কখনও বা অন্তে প্রযুক্ত হয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

অবস্থানগত স্থান নাম: **'বালি ঘাটা'** (কবিকঙ্কণ চণ্ডী) **'পিছলদা'** (শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত) **'হোগলা পাথর ঘাটা'** (ঐ), ইত্যাদি।

গাছপালা-ফলফুল-কেন্দ্রিক স্থান-নাম: **'বটগ্রাম'** (কবিকঙ্কণ চণ্ডী), **'গাদিগাছা'** (শ্রীচৈতন্যভাগবত), **'পাতুয়ারী'** (পদ্মাপুরাণ: দ্বিজবংশী-দাস: ১৭ শতক), **'বকুলতলা'** (বাজিমাৎ: কবিতাবলী: হেমচন্দ্র) ইত্যাদি।

সংখ্যা-সম্বলিত স্থান-নাম: **'সাতগাঁ'** (কবিকঙ্কণ চণ্ডী), **'দোগাছিয়া'** ('শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত') **'দশঘরা'** (বোধেন্দু-বিকাশ: ঈশ্বরগুপ্ত) প্রভৃতি।

পশু-পাখি-যুক্ত স্থান-নাম: **'কুকুর ঘাটা'** (মনসামঙ্গল: কেতকা-দাস ক্ষেমানন্দ), **'কাঁকড়া দহ'** (রায়মঙ্গল: কৃষ্ণরাম দাস), **'ময়নাপুর'** (ধর্মমঙ্গল), ইত্যাদি।

ব্যক্তি বা উপাধিভিত্তিক স্থান-নাম: **'বারবকপুর'** (কবিকঙ্কণ চণ্ডী), **'কাজীর নগর'**, **'মাধাইর হাট'** (শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)। **'হাজরা'** (পদ্মাপুরাণ: দ্বিজবংশী দাস), **'হাসন হাসির হাট'** (মনসামঙ্গল: কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ)।

(খ) লোকঐতিহ্যানুগ ব্যক্তি-নাম: ব্যক্তির নামকরণের ক্ষেত্রেও লোকসমাজের বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য। ব্যক্তির বৃত্তি, আকৃতি, তাকে ঘিরে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এই লোক-সমাজকৃত নামকরণে লক্ষণীয়।

বৃত্তিভিত্তিক ব্যক্তিনাম ও উপাধি: ব্যক্তির জীবনে বৃত্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। নামকরণেও অনেক ক্ষেত্রে তা স্বীকৃত। যেমন, 'মনসামঙ্গল' কাহিনীর 'শঙ্কর গারড়ী'-র উপাধিটি লক্ষণীয়। 'গারড়ী' = সাপের ওঝা, বিষবৈদ্য (গরুড় + অ + ইক/ইয়া ← গারুড়িক > 'গারড়ী')। শঙ্কর গারড়ীও একজন দক্ষ ওঝা। তাঁর উপাধিটি সম্ভবত লোকসমাজ প্রদত্ত। গরুড় হল সর্পশত্রু। ওঝাও সাপের শত্রু। সুতরাং 'গারুড়িক' তথা 'গারড়ী' শঙ্করের উপাধিরূপে সুপ্রযুক্ত।

এছাড়া এ কাব্যের 'জালু-মালু' চরিত্রদ্বয়ের নামকরণটিও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। 'জালু' (জাল + ইয়া) নামটি সম্ভবত বৃত্তিরই ইঙ্গিতবাহী;

আর 'মালু' (আরবী-মাল্লাহ্> মালা) নামটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৃত্তির (মালা ধীবর, জেলে) আভাস লভ্য।

'রায়মঙ্গল' কাব্যের 'রতাই বাউল্যা'-র উপাধিটিও তার বৃত্তির সূচক, 'বাউল্যা' (বাওয়ালী / বাওয়ালি) কোনো কোনো স্থানে বন ভ্রমণকারী মন্ত্রবিৎ সাধুদের বলা হয়।

এছাড়া বাউল গানের প্যারডি-ধর্মী একটি কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত 'কলু-রামী', 'ধোপা শামী'-কেও আমাদের সামনে হাজির করেছেন। বৃত্তি-ব্যঞ্জক শব্দগুলি নাম না হলেও নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত।

বিশ্বাস-সংস্কার-ভিত্তিক ব্যক্তি-নাম : লোকসমাজের সামগ্রিক জীবনা-চরণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা বিশ্বাস-সংস্কার ক্রিয়াশীল। নামকরণের ক্ষেত্রটিও তার থেকে মুক্ত নয়। তাই নানা অশুভ শক্তি থেকে শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে তার নাম রাখা হয়েছে 'নিমাই' (নিমময়>)। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগে রচিত প্রায় সব চৈতন্য-জীবনী কাব্যে নামটি উল্লিখিত।

বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য সূচক ব্যক্তিনাম : ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে লাউসেনের সেনাপতি 'লোহাটা'। 'লোহার'/ড়'-অর্থ কর্মকার। কিন্তু সৈন্য পরিচালনার কাজে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন উন্নত মজবুত শরীর। তবে এ অনুমান অসঙ্গত হবে না যে, 'লোহাটা'-র শারীরিক গঠন ও শক্তিই তার নামকরণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে, (লোহাটা = লোহা + টা = লোহার মতন যেন এই অর্থে)।

আবার হেমচন্দ্রের কবিতায় 'নাদাপেট'-ই যে 'ভুঁদোদাদা'র [ভুঁদো-হি-/ভোঁদু (শূন্যার্থে)] নামকরণের ভিত্তিমূল তা সহজেই উপলব্ধি করা যায় (সাবাস হুজুগ আজব সহরে : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র)।

মধ্যযুগের দুটি মঙ্গল কাব্যে 'কালু'র সাক্ষাৎ মেলে। একজন 'ধর্ম-মঙ্গল'-এর 'কালু ডোম', অন্যজন 'রায়মঙ্গল'-এর 'কালু রায়'; 'কালু' (কালী। কাল> কালু। স্নেহার্থে।) নামটির সৃষ্টি-ভূমিতে বিশেষ কোনো দেবদেবীর প্রভাব অপেক্ষা গাত্রবর্ণ-ই অধিকতর প্রভাবশীল বলে মনে হয়। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র সুবিখ্যাত 'ভাঁড়ুদত্ত'-র আচার-আচরণের প্রতীক যেন তার নামকরণটি। ভাঁড়ু [ভাঁড়<ভণ্ড (ভাঁড়ামী করা যার কাজ)] চরিত্রটি কাব্যে যে সরসতার সৃষ্টি করেছে, নামটি সেই ভাবেরই যথার্থ অনু-গামী। এ প্রসঙ্গে 'গবু' [<গাভী (নির্বোধ)] ও 'হবু' [(অবাক> হবাক্>হা-বাক> (বোকা অর্থে গৃহীত)] (হিং টিং ছট : সোনার তরী : রবীন্দ্রনাথ) উল্লেখযোগ্য।

দেবতা ও বিখ্যাত ব্যক্তির নামানুসারে লোকনাম—'ধর্মমঙ্গল'-এর পার্বতী-ভক্ত 'ইছাই ঘোষ' (ঈশ্বর>ইছাই); 'মিউনিসিপেল'-এর পোলিং শেষে 'হাজরে' উপস্থিত নাপিত 'নদের চাঁদ' [নদীয়ার চন্দ্র> (শ্রীচৈতন্য)] নামটি 'হেমচন্দ্রে'র সাবাস হুজগ আজব শহরে' (কবিতাবলী) কবিতায় লভ্য।

এছাড়া সোমাই পণ্ডিত [সোম+আই] ('কবিকঙ্কণ চণ্ডী'); 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এ 'নিত্যানন্দ'-র পিতা 'মুকুন্দ'-র নাম 'হাড়াই' পণ্ডিত [হাড়াই=হাড়ি+আই (ডোম জাতি?)]; 'মনসামঙ্গল'-এর 'লখিন্দর' (লক্ষীন্দ্র>); 'সাবুই বাগ' (কবিতাবলী: হেমচন্দ্র) প্রভৃতি নামগুলি স্মরণযোগ্য।

২। (৭) [২] বিশেষ্য: **'চিয়াড়'**—ব্যাধের ব্যবহার্য একপ্রকার ছুরি। 'মিথ্যা হৈলে **চিয়াড়ে** কাটিব তোর নাসা' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)। রাগের সময় বৃত্তি-সরঞ্জামই অস্ত্রে পরিণত হয়। সে অর্থে ব্যাধ কালকেতুর সংলাপে এই প্রয়োগ যথাযথ।

'ছাওয়াল—ছাওয়াল' কাহ্নাঞি' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), 'অষ্ট লোকপাল রাখ আমার **ছাওয়ালে** (রামায়ণ: কৃত্তিবাস)।

'ঠাম'—রূপ, গঠন। 'দেখিয়া বালক **ঠাম** সাক্ষাৎ গোকুল কান' (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত: কৃষ্ণদাস কবিরাজ)।

'পাৎড়া'—পাতার ভুক্তাবশিষ্ট। 'সাপুর হুপুর জুবড়ে দাড়ি / মেরে দিতাম **পাৎড়া** চেটে' (পৌষড়ার গীত: ঈশ্বরগুপ্ত)। যে লৌকিক খাদ্যাদি কবিতাটিতে উল্লিখিত, তার পরিপ্রেক্ষিতে লৌকিক শব্দটির প্রয়োগ যথাযথ।

'ফাউড়া'—ছোট লাঠি (ডাংগুলি খেলার ছোট লাঠি)। 'লইয়া **ফাউড়াডেলা** যার সঙ্গে করে খেলা / তার হয় জীবন সংশয়' (কবি-কঙ্কণ চণ্ডী), 'আখেটি-নন্দনে'র পক্ষে 'ফাউড়া-ডেলা' নিয়ে খেলাই স্বাভাবিক।

'বাউনি'—পৌষসংক্রান্তির পূর্বরাত্রে খড়ের দড়ি দিয়ে গৃহদ্রব্য বন্ধনের লোকাচার বিশেষ। 'পৌষপার্বণ অভাবে গেল সাদা' তাই কবির 'হোল নাক **'বাউনি** বাঁদা' (পৌষড়ার গীত: ঈশ্বরগুপ্ত), 'বাউনি' এখানে আনন্দ ও ঐশ্বর্যের সূচক।

'মেলানা' / মেলানি / মেলানী।—'বিদায়' অর্থে প্রযুক্ত, কিন্তু পুন-র্মিলনেরও ইঙ্গিতবাহী। 'বিদায়' বিচ্ছেদসূচক, তাই পুনর্মিলনের দিকটাই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। এটি 'সুভাষণ' পর্যায়ভুক্ত। দৃষ্টান্ত,

পাত্রমিত্র গণে রাজা দিলেন **মেলানি** (রামায়ণ : কৃত্তিবাস) [পাত্রমিত্র-গণকে রাজা বিদায় দিলেন। কিন্তু এ বিদায় সাময়িক, কারণ অদূর ভবিষ্যতেই তাঁদের সঙ্গে রাজা পুনর্মিলিত হবেন। সুতরাং এখানে 'মেলানি' শব্দের প্রয়োগ যথাযথ]।

'রা'—'কথা'। 'মুখে না নিঃসরে **রা**' (চণ্ডীদাস) ; 'অন্তরে পর্বতে ঘা, মুখে **রা** নাই' (বন্ধু বিয়োগ : বিহারীলাল)। 'রা' উভয়ত্র নীরবতার ইঙ্গিতবাহী। প্রথম ক্ষেত্রে, প্রেমের বিরহ জ্বালায় রাধার বাকরুদ্ধতা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কবিবন্ধু পূর্ণচন্দ্রের স্বভাব পরিস্ফুটনে 'রা' প্রযুক্ত।

'হোলা'—মালসা জাতীয় মৃৎপাত্র বিশেষ। 'পান্ত খাবার **হোলা** গেল একি মস্তত্তাপ', (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)। 'হোলা' এখানে দারিদ্র্যের ইঙ্গিতবাহী ; কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গলে'-ও 'হোলা' প্রযুক্ত।

২। (৭) [৩] বিশেষণ :—**'আছিদর'**-ধূর্ত প্রতারক অর্থে-'এবে রাজা হৈল ধনের কাতর / পথে মহাদানী থুইল হেন **'আছিদর'** (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন : বড়ু চণ্ডীদাস) ; এছাড়া 'প্রগল্ভ' অর্থেও 'আছিদর' প্রযুক্ত-'রাখোয়াল কাহাঞি সে বড় **আছিদর**' (ঐ)। বলা বাহুল্য, দুটি অভি-যোগই শ্রীরাধার অসহায়া নারী মূর্তিটিকে পরিস্ফুট করেছে।

'আটাশে'—আট মাসে যার জন্ম। অপরিণত অবস্থায় জন্ম বলে স্বভাবতই শিশুর দুর্বল হবার সম্ভাবনা থাকে। কবিতায় এই 'আটাশে' প্রয়োগে এই দুর্বলতার দিকটি গৃহীত হয়ে অবহেলিতের ইঙ্গিত স্পষ্ট,-'আমি কি মার **আটাশে** ছেলে' (শাক্তপদ : রামপ্রসাদ : ১৭২০-১৭৮১)। জগজ্জননীর স্নেহের কাঙাল, ভক্ত-কবির মানস-প্রার্থনা 'আটাশে' শব্দটির প্রয়োগে পরিস্ফুট।

'আচ্ছা'—ব্যঙ্গার্থে খুব-বা 'বেশ' অর্থে গৃহীত,-**'আচ্ছা** মজা নিলে' (সাবাস হুজুগ আজব সহরে : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র) ; ইংরেজ শাসনের প্রতি ব্যঙ্গ-প্রবণতা সূত্রে কবিতাটির মূল সুরের সঙ্গে 'আচ্ছা' সার্থক-প্রযুক্ত।

'উদ্‌লা'—(দেশী শব্দ) উন্মুক্ত, নগ্ন। প্রেমিক যুবার প্রতি সদ্যো-কিশোরীর অভিযোগ,-'তোমার কেবল ঘোমটা খুলে **উদ্‌লা** করে ফেলা' (এই এক নূতন খেলা : কস্তুরী : গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৮৫৫-১৯১৮)।

'কিপটে'—কৃপণ—**'কিপটে** ভাতার কেয়া কাঁটা, কুমড়ো বলিদান / মুখ মিষ্টি মধুপর্ক সকলি সমান' (সাবাস হুজুগ আজব সহরে : কবিতা-বলী : হেমচন্দ্র) শব্দটি ব্যঙ্গার্থে গৃহীত।

'টেটন'—ধৃষ্ট, চতুর। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি, 'তোহ্মা হেন পৃথিবীতে নাহিক **টেটন**' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। কাব্যের প্রথম পর্বে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে লাভ করবার জন্য যেভাবে নানা প্রয়াস করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে শ্রীরাধা প্রদত্ত বিশেষণটি যথাযথ।

'ডাবা'—বৃহৎ অর্থে গৃহীত। 'মাদুর পেতে ঘরের ছাতে / **ডাবা** হুঁকোটি ধরিয়া হাতে / করিব আমি সবার সাথে / দেশের উপকার' (দেশের উন্নতি : **মানসী** : রবীন্দ্রনাথ)। 'ডাবা হুঁকো' এখানে এক-শ্রেণীর বিলাসী, স্বার্থপর মানুষের কপট দেশপ্রেমের নগ্নরূপটি পরি-স্ফুটনে সহায়ক।

২। (৭) [৪] ক্রিয়াপদ : **'আগুলিল'**—আটক করল, (পথ) রোধ করল; চাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চিত্র বর্ণনাসূত্রে সুপ্রযুক্ত 'কামিলারে **আগুলিল** পথে' (মনসামঙ্গল : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ) বলা বাহুল্য, 'কামিলা'—কর্মকার।

'এড়ই'—পরিত্যাগ করা অর্থে। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উত্যক্ত শ্রীরাধা বলেছেন '**এড়ই** আহ্মারে কাহ্ন না কর কচাল' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

'গাড়ে'—প্রোথিত করে। নিছক বর্ণনাসূত্রে প্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত 'খুঁটো **গাড়ে** তারা' (বৈকালিক ঝড় : সম্ভাবশতক : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

'ডুসাঁআ'—মাথার গুঁতো দিয়ে, ঢুঁ মেরে। মুণ্ডে মুণ্ডে **ডুসাঁআ** মারিবোঁ তোহ্মা হেলে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। স্ব-অর্থেই প্রযুক্ত।

'পাখালিল'—ধুল। কালকেতু ভোজনে বসার আগে '**পাখালিল** মহাবীর পদপাণি মুখে' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)।

'পাঁচে'—চিন্তা করে, ভাবে। প্রচলিত অর্থেই প্রযুক্ত,—'ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে **পাঁচে**' (মনসামঙ্গল : বিজয়গুপ্ত)। আবার অন্যত্র, 'পাচে' (সং—প্রেরণ>) 'পাঠানো' অর্থেও গৃহীত,—'বড় বড় বীর **পাঁচে** সেইত দক্ষিণে' (রামায়ণ : কৃত্তিবাস)।

'পাড়িল'—উচুঁ থেকে নীচে নামানো। এখানে কিন্তু 'উপলব্ধি' বা 'অনুমান' অর্থে গৃহীত; 'প্রমাদ **পাড়িল** চেড়ী কোথাও না দেখি (রামায়ণ : কৃত্তিবাস) : প্রচলিত সাধারণ অর্থ বর্জন-পূর্বক বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত।

'ভেটিব'—মিলিত হব অর্থে। 'কি ভাবে আজি **ভেটিব** ভবেশে' (মেঘ-নাদবধকাব্য : মধুসূদন)। আবার দেখা অর্থেও 'ভেটা' গৃহীত,—'ঘাটত **ভেটিল** নান্দের পো' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। অন্যত্র (অদ্‌ভুতরোদন : অশোকগুচ্ছ : দেবেন্দ্রনাথ সেন) শব্দটি উপহার অর্থেও প্রযুক্ত।

২। (৭) [৫] অব্যয় : **'আর'**—অপর-বা-অন্য-অর্থে গৃহীত। 'চলিলেন **আর** বাড়ী প্রভুরে লৈয়া' (শ্রীচৈতন্যভাগবত : বৃন্দাবন দাস) ; অন্যত্র ক্রমোৎকর্ষসূচক,--'একে সে মোহন যমুনার কূল, **আর** সে কেলি-কদম্ব-মূল, আর সে বিবিধ ফুটন্ত ফুল, আর শারদযামিনী' (জ্ঞানদাস : ১৬ শতক)।

'নাক' / **'নাকো'**--'না' (সহানুভূতি মিশ্রিত) অর্থেই ব্যবহৃত। 'হোলো নাক বাউনি বাঁদা' (পৌষড়ার গীত : ঈশ্বর গুপ্ত) ; অন্যত্র,–'ফিরল **নাকো** তারা' (হোরিখেলা : কথা : রবীন্দ্রনাথ)।

'পাছে'--ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনায় আশঙ্কিত হওয়া অর্থে গৃহীত। 'ভাই মোর দায় তোর **পাছে** চোর ভাগে' (অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র) ; আবার 'পিছনে' অর্থেও ব্যবহৃত,--বনে মৃগকে দেখে 'তার **পাছে** ধায় ব্যাধ যেমন পতঙ্গ' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)। '**পাছে** লোকে কিছু বলে' (আলো ও ছায়া : কামিনী রায়)।

'যাই'—যেহেতু-অর্থে গৃহীত,—'**যাই** আমি নারী তাই ভুলি বচনে' (রামবসু : ১৭৮৬–১৮২৮)।

'লাগি'—জন্য, উদ্দেশ্যে (গ্রাম্য প্রয়োগ--লেগে / নেগে)। গঅণ কিলী **লাগি**' (১৬ সংপদ : মহীধর পাদ : চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) অর্থাৎ গগন শিখরের জন্য ; 'তোমা **লাগি** কে ছাড়িবে স্ত্রী-পুত্রের আশ' (রামায়ণ / কৃত্তিবাস) ; অন্যত্রও প্রচলিত অর্থেই গৃহীত ; 'দুহাতে **দাদালে** হালে যার **লাগি** পায়' (ধর্মমঙ্গল : ঘনরাম)।

'বটে'—'যথার্থ' অর্থে গৃহীত। 'পতিব্রতা কন্যা**বটে**' (মনসামঙ্গল : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ)। বলা বাহুল্য, বেহুলা সম্বন্ধে মন্তব্যটি প্রযুক্ত।

'বই'—'অন্তর' বা 'বাদে'-অর্থে ব্যবহৃত। 'শূন্যপরাণ'-এ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা সূত্রে,—'চৌদ্দ যুগ **বই** পরভু ভুলিলেন হাই' (শূন্যপুরাণ)। অনুরূপ অর্থে অন্যত্রও (মাতৃহারা : বিভূতি : মানকুমারী বসু) 'বই'-এর প্রয়োগ লভ্য।

সম্বোধনসূচক অব্যয় : **'ওরে'**—'**ওরে** বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি' (বঙ্গভাষা : চতুর্দশ পদাবলী : মধুসূদন)। এখানে সম্বোধন-সূচক শব্দটি স্নেহার্থে গৃহীত।

'ওহে'—নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সহায়ক,—'শুন শুন **ওহে** মিশ্র.... (শ্রীচৈতন্যভাগবত : বৃন্দাবন দাস)। '**ওহে** গিরি, গা তোল হে--' (শাক্তপদ : রাম বসু)।

'গ' / **'গো'** সম্বোধনসূচক অর্থেই প্রযুক্ত। 'এহা দুখ বড়ায়ি **গ** সহিতে না পারী' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) ; অন্যত্র ঘনিষ্ঠতা প্রকাশসূত্রে, 'দিন শেষে ভিনদেশে

পৌঁছে তরুণীকে কবির প্রশ্ন, 'হ্যাঁ গো এ কাদের দেশে / বিদেশী নামি এসে' (দিনশেষে : চিত্রা : রবীন্দ্রনাথ)।

'বপা' / **বাপু, 'বাপা'**, **'বাপ'**—স্নেহ মিশ্রিত সম্বোধনার্থে ব্যবহৃত। **'বপা'**—'সরহ ভণই **বপা** উজুবাট ভাইলা' (৩২ সংখ্যক পদ : সরহ পাদ : চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) অর্থাৎ 'সরহ বলেন, বাবা ঋজুপথ ভাল ; **'বাপা'**—'সোনা রূপা নহে **বাপা** এ বেঙ্গা পিতল / ঘসিয়া মাজিয়া **বাপু** করেছ উজ্জ্বল' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী) ; **'বাপ'-বাপ** কান্দ কি কারণ' (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত :)।

'লো'—সম্বোধনার্থে প্রচলিত। '**লো** ডোম্বী বাটত ভাইল উছারা' (১৪ সংপদ : ডোম্বীপাদ : চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) ; আবার অশোক কাননে বন্দিনী সীতাকে সরমার সম্বোধন,—'শুন **লো** মৈথিলী' (মেঘনাদবধ কাব্য : মধুসূদন) ; এছাড়া অন্যত্রও (দ্রঃ বৃত্রসংহার : হেমচন্দ্র, আকাঙ্খা অবকাশ রঞ্জিনী : নবীনচন্দ্র সেন) 'লো'-এর প্রয়োগ লভ্য।

২। (৭) [৬] শব্দদ্বৈত :— **'কাজে কাজে'**—সুতরাং অর্থে প্রযুক্ত। '**কাজে কাজে** কহতে হৈল দুর্যোধনদিগে' (কাশীদাসী মহাভারত)।

'ঘাসে ঘাসে'—ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত। '**ঘাসে ঘাসে** কেঁদে সারা শিশির সুন্দর' (জীবন সংগ্রাম : প্রদীপ : অক্ষয়কুমার বড়াল)।

'ঢুলু ঢুলু'—নিদ্রাচ্ছন্ন। প্রচলিত অর্থে,—'ঘুমে **ঢুলু ঢুলু**' (সাধের-আসন : বিহারীলাল)।

'থোকাথোকা'—গুচ্ছগুচ্ছ অর্থে ব্যবহৃত। / —'আমফলে **থোকা-থোকা** নুইয়া পড়ে ডাল' (মনসামঙ্গল : বিজয়গুপ্ত)।

'নিতিনিতি'—নিত্যানিত্য। প্রচলিত অর্থেই গৃহীত,—'**নিতিনিতি** নিআলা সিহে ষম জুজঅ' (৩৩ সংপদ : ঢেন্টণপাদ চর্যাপদ) অর্থাৎ নিত্যানিত্য শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধরত।

সহচর-অনুচর-প্রতিচর-শব্দদ্বৈত—**'আথেব্যথে'** (সহচর)—আস্তে ব্যস্তে (শ্রীচৈতন্যভাগবত)। **'হাঁকডাক'** (অনুচর)—হৈচৈ-অর্থে (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)। **'চালাক-চতুর'** (সহচর)—বুদ্ধিমান ও কর্মিৎকর্মা অর্থে (বাঙ্গালীর মেয়ে : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র)। **ঠাট-ঠমক** (সহচর)—আড়ম্বর (ঐ)। **ছেলেপুলে** (সহচর)—পুত্রাদি অর্থে (বিষাদিনী : বঙ্গসুন্দরী : বিহারীলাল)।

২। (৭) [৭] ধ্বন্যাত্মক শব্দ :—**'উঙা উঙা'** (সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি)—**'উঙা উঙা** করে সুত....' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)। **'হুপহাপ'**

(বানরকৃত বিচিত্র শব্দ)—'**হুপহাপ** লম্ফে ঝম্পে কম্পে বসুমতী' (কাশী-দাসী মহাভারত)। '**ভভম্ভম ভভম্ভম**' (শিঙার ধ্বনি)—'**ভভম্ভম ভভম্ভম** শিঙ্গা ঘোর বাজে' (অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র)।

'**হেঁকুর হেঁকুর**' (উদর পরিপূর্ণতাসূচক শব্দ। / ঢেঁকুর-এর অনুসরণে) —হেঁকুর হেঁকুর হেঁকুর ঢেঁকুর তুলে' (পৌষপার্বণের গীত : ঈশ্বর গুপ্ত)।

'**কুলুকুলু**'—(নদীর জলপ্রবাহের ধ্বনি)—'তমসা তটিনী-রানী **কুলুকুলু** স্বনে' (সারদামঙ্গল : বিহারীলাল)। '**ভোঁ ভোঁ**' (শিঙার বাদ্যধ্বনি) 'শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ' (হায় কি হলো : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র)।

২। (৭) [৮] শব্দ বিকৃতি :—**আকপট** [অকপট>]—সত্য—'তোর বোলে **আকপট** কহিলোঁ সরূপ' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। '**আশ** [আশা'>]—আশা—'স্ত্রী পুত্রের **আশ**' (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)।

'**লাগর লাগরী**' [নাগর নাগরী]—রসিক পুরুষ ও রমনী—'নাচ তোরা **লাগর লাগরী**' (স্নানযাত্রা : ঈশ্বর গুপ্ত)। '**ব্যাভার**' [ব্যবহার] —আচরণ—'আচার-ব্যাভার সব হিন্দুর মতন' (তোপাখুদে : ঈশ্বর গুপ্ত)।

২। (৭) (৯) বিশিষ্ট বাকভঙ্গি : (১) '**জো সো বুধী সোই নিবুধী। জো সো চৌর সোই সাধী**' (৩৩ সংখ্যক পদ : ঢেণ্ঢণ পাদ : চর্যাপদ) অর্থাৎ 'যে সেই বুদ্ধি সেই নির্বোধ / যে সে চোর সেই সাধু'।

(২) **ভাল মন্দ কত লোক** পথ মাঝ যাএ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

(৩) **নাকানি চুবানি খাইয়া** বেটা শেষে মরে (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)।

(৪) বাপের পুকুরে নাই **তোর বাপের কি?** (মনসামঙ্গল : কেতকা-দাস ক্ষেমানন্দ)।

(৫) '**বাপের আছে পো**' (ঐ)।

(৬) '**কথা না সরে** দক্ষ-রাজে তরাসে' (অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র)।

(৭) '**এবার বছরকার দিনে**' (পৌষপার্বণের গীত : ঈশ্বর গুপ্ত)।

(৮) 'আমি ব্যাটা **মরি খেটে**' (ঐ)।

(৯) 'হাসিছে **দুধের মেয়ে**'— (সারদামঙ্গল : বিহারীলাল)।

(১০) 'তার মেগের **মুখে ছাই**' (সাবাস হুজুগ আজব সহরে : কবিতা-বলী : হেমচন্দ্র)।

(১১) '**যার খায় যার পরে** তারি নিন্দাবাদ' (বাঙ্গালীর মেয়ে : ঐ)।

(১২) '**এক ছাঁচে ঢালা**' (স্বপ্নপ্রয়াণ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

(১৩) 'লাঠি নিয়ে **ঘা কতক** দাও......' (ধর্মপ্রচার : মানসী : রবীন্দ্রনাথ)।

(১৪) 'বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি' (পুরাতন ভৃত্য : কাহিনী : ঐ)।

১৫) 'এ যে ঘোর কলি' (বিসর্জন : ঐ) ইত্যাদি।

৩। বিশ্বাস-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি ঃ

লোকসমাজ বহু বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কারের অনুবর্তী। লোকসাধারণের দৈনন্দিন জীবনাচরণে এ সমস্ত বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাব অপরিসীম। এছাড়া রয়েছে নানাবিধ লোকপ্রথা, লোকাচার ও লোকউৎসব-অনুষ্ঠান। আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় এ সবের উপস্থিতিও চোখে পড়ে।

৩। (১) লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার—প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের ব্যাপক প্রভাব ছিল। স্বভাবতই আলোচ্য কালপর্বের বাংলা কাব্য-কবিতায় তার প্রভাব-প্রতিফলনের প্রচুর নিদর্শন মেলে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর 'দানখণ্ডে' হাটে যাবার পথে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক লাঞ্ছিতা রাধিকার আক্ষেপোক্তিতে লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন—'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে বিধাতা পুরুষ কর্তৃক অদৃষ্টলিখনের লোকবিশ্বাসটি এখানে স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে আসে।

যে কোনো কর্মারম্ভের ক্ষেত্রে হাঁচি, টিকটিকির ডাক ইত্যাদি লোক-সমাজ অশুভ মনে করে। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উত্যক্তা রাধার উক্তিতেই এই লোকবিশ্বাসটির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়,—'কালিনী মাএ মোর নাম থুইল রাধা / হাছি জিঠী কেহ তাত না দিল বিরোধা' (জিঠী—টিকটিকির ডাক)। এ কাব্যের একাধিক স্থানে এই লোকবিশ্বাসের উপস্থিতি লভ্য। 'কাহ্নাঞি'-র বৈরীসুলভ আচরণে শঙ্কাতুরা রাধা ভাবেন—'কমন আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা / হাঁছী জিঠি তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা'।[৬৪] যাত্রা-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস এখানে স্পষ্টতই প্রতিফলিত।

যাত্রাকালে শুভাশুভ লক্ষণ দেখে যাত্রারম্ভ বা যাত্রা স্থগিত রাখায় লোকসমাজ বিশ্বাস করে। অশুভ লক্ষণ দেখেও রাধা যাত্রা করেছেন বলে তিনি এমন বিপদে পড়েছেন—রাধার এ বিশ্বাস অন্যত্রও উল্লিখিত হয়েছে, 'ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ / কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে / আগেঁ সুনাঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী / চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে'।[৬৫] 'তেলেনী', 'শুষ্ক বৃক্ষে' কালো কাক, 'হাঁচি', টিকটিকির ডাক, শূন্য ঘট ইত্যাদি যাত্রার অশুভ লক্ষণ হিসাবে

বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে উপেক্ষা করায় এহেন দুর্ভোগ--এ ধারণার মধ্যে লোকসংস্কারেরও পরিচয় আছে। কারণ, যাত্রা সাময়িক স্থগিত রাখা উচিত ছিল--এমন মনোভাব এখানে ক্রিয়াশীল। অনুরূপ, বাঁশী চুরির অভিযোগে কৃষ্ণ রাধাকে অভিযুক্ত করলে অসহায় রাধা অপবাদের হেতু আবিষ্কারে প্রবৃত্তা হন; ভাবেন, 'হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ'। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে পড়ে, যাত্রাকালে সামনে তিনি 'শুন কলসী', 'বাঞ্জর শিআল' তাঁর 'ডাহিনেঁ জাএ', 'হাথে খাপর' ভিক্ষারত 'যোগিনী', 'কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী'--ইত্যাদি নানা কুলক্ষণ দেখেছিলেন। স্পষ্টতই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর এসব স্থানে লোকবিশ্বাস-সংস্কারের আধিপত্য।

'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর নানা স্থানে লোকবিশ্বাসের প্রভাব নিদর্শন মেলে। মায়ামৃগ বধ করে ফেরার পথে রামচন্দ্র নানা অশুভ ইঙ্গিত লক্ষ্য করে সীতার অমঙ্গলাশঙ্কায় চিন্তিত--এ দৃশ্য মূল বাল্মীকি রামায়ণেও চিত্রিত। কিন্তু অশুভ ইঙ্গিতগুলির মধ্যে রামচন্দ্রের 'বামে সর্প' দেখা কৃত্তিবাসেরই সংযোজিত লোকবিশ্বাস। অনুরূপ, একাব্যের অন্যত্র-ও দেখি, রাবণ কর্তৃক প্রেরিত ধূম্রাক্ষ যুদ্ধযাত্রাকালে একাধিক অশুভ লক্ষণ দেখেছে। এখানেও কৃত্তিবাস অধিকাংশ স্থানে মূলানুগ হলেও—'আউদড় চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী'—এ দৃশ্য তাঁর সংযোজন। বলা বাহুল্য, 'আউদড় চুলে' যোগিনীর ভিক্ষা চাওয়া অশুভ লোকবিশ্বাসেরই অন্তর্ভুক্ত; ধূম্রাক্ষ এ দৃশ্য দর্শনে আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম ভেবে বিচলিত হয়েছে।

লোকবিশ্বাসের অনুরূপ প্রায় দৃষ্টান্ত 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল'-এও মেলে। 'মনসামঙ্গল'-এ দেখি, চাঁদ সদাগর বাণিজ্যে চলেছেন। যাত্রার পূর্বমুহূর্তে তিনি দেখলেন, 'চরণে উঝাটি লাগে সগুনি আইল আগে / শৃগাল যায় দক্ষিণ ভাগে'[৬৬] (মনসামঙ্গল : জগজ্জীবন ঘোষাল); 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ কালকেতু শিকার যাত্রা-কালে 'সুবর্ণগোধিকা দেখি চিত্তে বীর হৈল দুখী / অযাত্রিক পাপ দরশনে' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)। এখানে লোক-বিশ্বাসের স্বীকৃতিও আছে,—'অযাত্রিক পাপ দরশনে'; বলা বাহুল্য, সত্য-সত্যই সেদিন কালকেতুর ভাগ্যে কোনো শিকার জোটেনি। এ কাব্যের ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। শুধু অমঙ্গল বা অশুভ সূচকই নয়, মঙ্গল বা শুভসূচক লোকবিশ্বাসও আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় মেলে। নারায়ণ দেব (১৫ শতক)-এর 'পদ্মাপুরাণ'-এ দেখি, বেহুলা নখীন্দরের বিবাহের কথাবার্তা চলছে,

এই সময় চাঁদ দেখেছেন, 'জায় সাধু পথ মেলি স্মুখে দেখিল মালি / শ্রীকাল দেখিল বাম পাসে। / দক্ষিণে যায় বিষধর দেখিয়া কৌতুক বড় / কার্য্যসিদ্ধি দেখি চান্দো হাসে'।[৬৭] পথে সাধু, মালী, 'বাম পাশে শ্রীকাল', ডানদিকে বিষধর সাপ দেখা শুভলক্ষণ ব'লে লোকসমাজের বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে চাঁদসদাগরও লখীন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহ দিতে মনস্থির করে ফেলেছেন; আবার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এ (মাধবাচার্য-আনুমানিক ১৬ শতক) কংস শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠালে পথে যেতে যেতে অক্রুর দেখেছে' '----মৃগ পাল। / রথ প্রদক্ষিণ করি যায় বারবার'।[৬৮] এই শুভলক্ষণ দেখে তার মনে হয়েছে, 'নিশ্চয় জানিলুঁ আর নাহিব বঞ্চিত।' 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ কালকেতু শিকার-যাত্রাপথে নানাবিধ সুলক্ষণ দেখেছে, 'দক্ষিণে গো-মৃগ 'দ্বিজ বিকশিত সরসিজ / বামে শিবা পূর্ণ ঘট জল।' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী) এছাড়া 'চৌদিকে মঙ্গল ধ্বনি, দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী', 'বৎসের সহিত্য ধেনু' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী), এগুলি দেখে ও শুনে এবং এর 'শুভরীতি' বুঝে কালকেতু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে।

লোকবিশ্বাসের সঙ্গে লোকসংস্কারের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যও বিদ্যমান। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতা থেকে লোকসংস্কারের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে কলিঙ্গপতি কোটালকে গুজরাটে প্রেরণ করলে 'যাত্রাকৈল কোটালিয়া শুভক্ষণ বেলা'। যাত্রা সম্বন্ধে লোকসমাজে প্রচলিত শুভাশুভ বিশ্বাসের একটি এখানে সংস্কারে পরিণত।

ডাকিনী বিশ্বাস ও তজ্জাত সংস্কারের নিদর্শন 'ধর্মমঙ্গল'-এ মেলে। গৌড় যাত্রার পথে লাউসেনের যাতে কোনো বিপদ না হয়, তার জন্য তার মা লাউসেনের 'মস্তকের কেশ বাঁধে দিল মন্ত্র পড়্যা'[৬৯] (শ্রীধর্মমঙ্গল : মাণিক গাঙ্গুলী)।

মধ্যযুগের কাব্য-কবিতায় লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব প্রতিফলনের উদ্ধৃত নিদর্শনগুলির মধ্য দিয়ে সে যুগের বিশ্বাস-সংস্কারপ্রবণ সমাজটিই প্রতিভাত।

পরবর্তী কালপর্বের কাব্য-কবিতাতেও লোকবিশ্বাসের প্রভাব দুর্লক্ষ নয়। যেমন, লোকবিশ্বাস, স্ত্রী লোকের ডান চোখ কাঁপা অশুভকর। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' ৬ষ্ঠ সর্গে এই লোকবিশ্বাসের অবতারণা ঘটেছে,-- যজ্ঞাগারে মেঘনাদের অকালমৃত্যুর মুহূর্তে অন্তঃপুরে তার পত্নী প্রমীলার

'বামেতর নয়ন নাচিল' (মধুসূদন)। অজানা ক্ষতির আশঙ্কায় প্রমীলা অস্থির হয়ে উঠেছে। লোকবিশ্বাসের অনুবর্তিনী প্রমীলার মনে হয়েছে, 'না জানি আজি পড়ি কি বিপদে' (ঐ)।

পেঁচা সম্বন্ধে লোকসমাজে নানা শুভাশুভ বিশ্বাস বর্তমান। যেমন, পেঁচা প্রাজ্ঞ; সে কাল-নির্দেশক। আবার গায়ের রঙ অনুসারে পেঁচা কখনো কল্যাণকর, কখনো বা অকল্যাণকর। 'স্বপ্ন প্রয়াণ'-এর (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৪র্থ সর্গে 'দানব রাজ্যের নিকেতন' বর্ণনায়, 'দেখা দিল অট্টা-লিকা মহাকায় / পার্শ্বে পড়িতেছে ভাঙি', উচ্চ শিরে মহত্ব শিখায়। / ভাঙা জানালায় / বায়ু ফুসলায় / আছেন কাল-পেচক থামের মাথায়'। চিত্রটিতে স্পষ্ট রহস্যময় পরিবেশটিতে কাল-পেচককে স্থাপন করে কবি যেন আসন্ন বিপর্যয়েরই ইঙ্গিত দান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' (১৮৯৯) কাব্যের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটির মূলকেন্দ্রে রয়েছে একটি লোকবিশ্বাস। লোকসমাজে এরকম ধারণা প্রচলিত যে, জলের কাছে পুত্রকে সমর্পণের কথা দিলে, জলের বুকে সে ছেলের মৃত্যু অনিবার্য।

বিধবা যুবতী মোক্ষদা মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে 'সাগর সঙ্গমে' তীর্থস্নানে চলেছে। নৌকা ছাড়ার প্রাক্-মুহূর্তে মোক্ষদা-পুত্র 'রাখাল' মায়ের সঙ্গে যাবার বায়না ধরল। নাছোড়বান্দা রাখালকে নিরস্ত করতে না পেরে রাগান্বিতা মোক্ষদা বলে ফেলল, 'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে'—একথা উচ্চারণ করেই অবশ্য জননী মোক্ষদা অনুতপ্ত হয়েছে; 'মৈত্র মহাশয়' তাকে মৃদু তিরস্কার করেছেন। এই অনুতাপ ও তিরস্কার উভয়ই লোকবিশ্বাসের ফল। কবিতাটির পটভূমিতে এবং পরিণতিতে লোক-বিশ্বাসের প্রভাব অনস্বীকার্য। লোকবিশ্বাস,—গঙ্গার জলে সমস্ত অশুদ্ধি দূর হয়, তাই জীবনে প্রতিনিয়ত জ্বালা অনুভব করে কবি প্রশ্ন করেন গঙ্গাকে, 'পরকালে যদি পাতকী তরাবে / তবে কেন এলে অবনী পরে, (গঙ্গার মূর্তি : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র); আবার 'শঙ্খ' হল শান্তির প্রতীক। স্মরণীয়, প্রাচীনকালে যুদ্ধসমাপ্তি ঘোষণা করা হত শঙ্খনাদ করে। নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে লোকসমাজ দেবতার ক্রোধের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করে। একারণেই দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে ভূমিকম্পাদি জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে শঙ্খধ্বনি করা হয়। কবিতায় বৈকালিক ঝড়ের পূর্ব-মুহূর্তে দেখি, 'লোকালয়ে ঘন ঘন শঙ্খনাদ হয় / কি হয় কি হয় আজি ভাবে গৃহিচয়' (বৈকালিক ঝড় : সদ্ভাবশতক : কৃষ্ণচন্দ্র

মজুমদার), রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী'-র 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি এই অধ্যায়ের লোকবিশ্বাস পর্বে আলোচিত হয়েছে। লোকবিশ্বাস যে কখনো কখনো সংস্কারের নির্মম-কঠিন পথ ধরে চূড়ান্ত সর্বনাশকে অনিবার্য করে তোলে তার ইঙ্গিত এই কবিতায় পাই। উন্মত্ত জলরাশিতে পড়ে বিভ্রান্ত মাঝিরা লোকবিশ্বাস থেকে বলেছে, 'বাবারে দিয়েছ ফাঁকি তোমাদের কেউ / যা মেনেছে দেয় নাই, তাই এত ঢেউ' আর সেই লোকবিশ্বাসের পরিণতি দুর্মর সংস্কারে,--'যার যত ছিল / অর্থ বস্ত্র যাহা-কিছু জলে ফেলি দিল'। এই সংস্কারের নির্মমতম রূপ কবিতার শেষপ্রান্তে আত্ম-প্রকাশ করল, যখন মাঝিরা 'বল করি রাখালের নিল ছিঁড়ি কাড়ি। মার বক্ষ হতে।' এর পরবর্তী অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। রাখাল সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাকে রক্ষার জন্য মৈত্র মহাশয়ও জলে ঝাঁপ দিয়েছেন। 'কাহিনী'-র অপর একটি কবিতা 'বিসর্জন'-এও মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে দুর্মর লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। মল্লিকা নাম্নী এক নারীর জীবনে একাদিক্রমে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে তার দুই ছেলে, পরে তৃতীয় সন্তানের জন্মলগ্নে তার স্বামীও মারা গেছে। নিয়তির এই নিষ্ঠুরতাকে মল্লিকার মনে হয়েছে, তার 'অজ্ঞাতজন্মের পাপ'-এর শাস্তি। এ বিশ্বাসে লোকঐতিহ্যের প্রভাব আছে। শুধু তাই নয়, সেই পাপ ক্ষালনের জন্য সে 'গ্রামে গ্রামে পুজো', 'ব্রত ধ্যান উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে' দিন কাটিয়েছে। কিন্তু এত করেও কিছু ফল হয় নি। সব-শেষে তার একমাত্র শিশুর যকৃতের বিকার ঘটল। তাকে নিরাময়ের আশায় সংস্কারাচ্ছন্ন জননী গঙ্গার খরস্রোতে সন্তানকে সমর্পণ করেছে।

৩। (২) যাদুবিশ্বাস ও যাদুসংস্কার : যাদুবিদ্যার প্রভাব বিশ্বজনীন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে যাদুবিশ্বাস ও যাদুসংস্কারের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতাতেও তার পরিচয় পাই।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর 'জন্মখণ্ডে' দেবগণ প্রদত্ত দুটি ভিন্ন বর্ণের কেশ থেকে বলভদ্র ও কৃষ্ণের জন্মলাভের ঘটনায় যাদুবিশ্বাসের প্রভাব অন-স্বীকার্য। নারায়ণ দেবের (১৫ শতক) 'পদ্মাপুরাণ'-এ বিবাহ-পূর্বে বেহুলাকে স্বামী-বশের কৌশল শিক্ষাদান প্রসঙ্গে দেখি,—'কলার মধ্যে কড়া থুইয়া বেহুলারে গিলাও গিয়া / এহি ঔষধ খাওয়াইবা শনিবারে / অহি কড়া বাটিয়া লখাইর বুকে পিঠে লেপিয়া' দিলে স্বামী বশীভূত হবে বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বশীকরণ-ক্রিয়াটির রহস্যময়তায় যাদু-ক্রিয়ার প্রভাব বিদ্যমান, আর তার প্রয়োগ যাদুবিশ্বাস-প্রসূত। একাব্যে

'জলপড়া' এবং মন্ত্র-সহায়তায় মৃত লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভে যাদুবিশ্বাস ক্রিয়াশীল।

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র আখেটিক খণ্ডে নিদয়া পুত্রলাভের আশায় ভগবতীর কথা মত স্নান করে এসে বসলে 'হইয়া মক্ষিকা বেশে' 'নীলাম্বর প্রবেশে / ঔষধ দিলেন তার নাকে'—নীলাম্বরের মক্ষিকায় রূপান্তর যাদুবিদ্যার অমিত প্রভাবজাত বলেই মনে হয়। প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই এধরণের রূপান্তরের প্রসঙ্গ মেলে। লক্ষণীয়, মনসামঙ্গলের মতো 'চণ্ডীমঙ্গলে'ও স্বামীকে বশীকরণে যাদুপ্রয়োগ দেখা যায়। 'খুল্লনার হবে সাধু নাক-বিন্ধ পশু' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)—এ বিশ্বাসে 'দোছাটি করিয়া' তসরের শাড়ী পরে লহনা বশীকরণের নানা বিচিত্র ঔষধ সংগ্রহ করেছে; এ কাব্যেরই অন্যত্র, 'লহনার সাধু হবে কিঙ্কর' এবং সপত্নী 'খুল্লনা হবে চেড়ী'—এই উদ্দেশ্যে যাদুবিদ্যার অধিকারিনী লীলাবতীর নির্দেশে দেখি, 'বসন ত্যজিয়া' 'শ্মশানের ক্ষীরা' আর 'কবর বিছাতি' আনতে হবে। শুধু তাই নয়, 'কালো গরুর গাঁজা', 'ফণিফণা'-জাত 'আঠুলিকীট', 'জোড়া অশ্বথের দল', 'একছত্রি গাছ', 'ভুজঙ্গের ছাল', 'নেউলের তুণ্ড', 'ছিনা জোঁক', 'শ্বেত কাকের রক্ত', 'কালো কুকুরের পিত্ত', 'কচ্ছপের নখ', 'কুম্ভীরের দাঁত', 'কোটরের পেঁচা', 'গোধিকার আঁত', 'বাদুরের পাখা', 'সজারুর কাঁটা'[৭০] ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য বস্তুর প্রয়োজন। বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এইসব বিচিত্র বস্তু সহযোগে যাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান Black Magic-এর অন্তর্ভুক্ত।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-এ বিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'কুসমন্তর-ঝাড়ফুঁক' ইত্যাদির প্রয়োগ যাদু-ক্রিয়ার নিদর্শন। বিষ-জর্জর শিবের বিষ-মুক্তির জন্য মনসা 'মহামন্ত্র বলি ঝাড়ে রাংগা বালি / বাপের শিয়রে বসি'[৭১]—এই চিত্রটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও যাদুক্রিয়ার প্রয়োগ লভ্য। রূপরাম চক্রবর্তীর (১৭ শতক) 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহকালে রঞ্জাবতীর চোখে যে কাজল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা মন্ত্রপূত।[৭২] এ কাব্যে লাউসেনকে চুরি করে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ইন্দা ইঁদুরের তোলা মাটিতে যাদুমন্ত্র বর্ষণ করে সমস্ত ময়নাবাসীকে ঘুম পাড়িয়েছে। এই প্রয়াস Black Magic-এর প্রভাবপুষ্ট। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য,—'জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগে মোর / ময়না নগর জুড়ে লাগ্ নিদ্রাঘোর' (ধর্মমঙ্গল : ঘনরাম) মন্ত্রটি শুনে মনে হয়, যাদুদণ্ড হাতে কোনো লোকযাদুকর যাদুক্রিয়া প্রদর্শন করছে।

'গোরক্ষবিজয়'-এর কাহিনীতে পথভ্রষ্ট গুরু মীননাথকে সাধন পথে ফিরিয়ে আনতে গোরক্ষনাথ কোনো কোনো ব্যাপারে যাদুশক্তির সাহায্য নিয়েছেন। যেমন, কদলী রমণীদের বাদুড়ে রূপান্তরিত করা, মীননাথের পুত্র বিন্দনাথের মৃত্যু সংঘটন ও পুনর্জীবন দান ইত্যাদি।

'সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী'-তে (দৌলতকাজী ও সৈয়দ আলাওল) মন্ত্রশক্তির সাহায্যে ঘুমপাড়ানোর চিত্র মেলে ; রাজকুমারকে চুরি করবার সময় চোরেরা 'প্রবেশিলা রাজগৃহে মন্ত্রের প্রভাবে / নিদ্রা সূত্রে বন্দী হৈয়া ছিল লোক সবে'[১৩]; পরশুরামের (১৮ শতক) 'কৃষ্ণমঙ্গল'-এ রাক্ষসী পুতনার স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণর ক্ষতির সম্ভাবনায় তাঁকে গোমূত্রে স্নান করানোর 'প্রতিরোধ মূলক যাদুবিদ্যার' প্রভাব লক্ষণীয় ; রাক্ষসীর কু-দৃষ্টি এড়ানোর জন্য গোপিগণের দ্বাদশ মন্ত্রের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

উনিশ শতকের কাব্য-কবিতাতেও যাদুবিশ্বাস ও যাদুসংস্কারের প্রভাব-প্রতিফলন দৃশ্যগোচর। তবে মধ্য ও প্রাচীন যুগে রচিত সাহিত্যের তুলনায় এই কালপর্বের কাব্য-কবিতায় যাদুবিশ্বাসের প্রভাব স্বল্প।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের (মধুসূদন) ৬ষ্ঠ সর্গে সুরক্ষিত যজ্ঞাগারে লক্ষণের মায়াবলে প্রবেশ বস্তুতপক্ষে যাদুশক্তির পরিচয়বহ। শুধু তাই নয়, সামান্য 'কোষা'-র আঘাতে অচেতন লক্ষণকে অস্ত্রহীন করতেও ব্যর্থ হন মহাশক্তিমান ইন্দ্রজিৎ। এই ব্যর্থতার মূলেও রয়েছে যাদু-শক্তির প্রভাব। ইন্দ্রজিৎ নিয়তিতাড়িত কিন্তু নিয়তি তাড়নাকে কবি যাদুশক্তির দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ বৃত্রাসুর বধের উপায়-স্বরূপ শিব ইন্দ্রকে বলেছেন, ঋষি দধীচির শরীরের অস্থিতে বৃত্রাসুরে 'বিনাশ বজ্রেতে'। শেষ পর্যন্ত দধীচির শরীরের অস্থি-সহায়তায় প্রস্তুত বজ্রাঘাতেই বৃত্র নিহত হ'ল। অস্থি দ্বারা বজ্রনির্মাণ যাদুবিদ্যার নিদর্শন। আবার মিউনিসিপাল বিলে ভোটিং খুলে ইংরেজরা যে চমক সৃষ্টি করেছে, তার প্রতি কটাক্ষ-সূত্রে কবি লিখেছেন, 'ভেলকিবাজি ইংরেজদের হদ্দমজা হায়' (সাবাস হুজুগ আজব সহরে : কবিতাবলী : ঐ)। 'ভেলকি বাজি' যাদু অর্থে সাধারণত প্রযুক্ত হলেও এখানে 'চমক' অর্থেই গৃহীত ; আবার দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'[১] কাব্যের পঞ্চম সর্গে ভৈরব কাপালিকের শব-সাধনা ও নানা ক্রিয়াকলাপ বর্ণনায় সূক্ষ্ম যাদুক্রিয়ার নিদর্শন মেলে,—'শবের সে বুকের উপরে চড়ি', / মুখে ঢালি দেয় মদ্য, ভয়ানক মন্ত্র

পড়ি পড়ি' আর মন্ত্রের প্রভাবে 'ক্ষণে ক্ষণে শব / করে আর্তরব / ক্ষণেকে চেতন পেয়ে উঠে ধরমড়ি'। এও যাদুক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র 'হিং টিং ছট' কবিতায় যাদুবিশ্বাসের সূক্ষ্ম প্রভাব লক্ষণীয়। সমগ্র কবিতাটি 'হিং টিং ছট' এই শব্দগুচ্ছের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বপ্নে রাজা বেদের মুখে এই শব্দ শুনেছেন। লোক-বিশ্বাস, বেদেরা বহুবিচিত্র যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। সম্ভবত সে কারণেই রাজা অধিকতর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন।

৩। (৩) লোকাচার-লোকানুষ্ঠান : লোকাচার, লোকপ্রথা, লোকউৎসব ও লোকানুষ্ঠান ইত্যাদি লোকাচার-লোকানুষ্ঠান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। লোকাচার-লোকানুষ্ঠানগুলি দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) জীবনবৃত্ত-কেন্দ্রিক : মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কালপরিধি কেন্দ্র করে যেগুলি প্রচলিত। (খ) বর্ষবৃত্তকেন্দ্রিক : বর্ষসূচনা থেকে শুরু করে বর্ষশেষ পর্যন্ত কালপরিধিকে কেন্দ্র করে যেগুলি প্রচলিত।

উদাহরণযোগে লোকাচার ও লোকানুষ্ঠানের পরিচয়সহ আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় এগুলির প্রভাব নির্দেশ করা যেতে পারে।

(ক) জীবনবৃত্ত :

নবজাতকের জন্মক্ষণ বিচার করে শুভাশুভ নির্ণয় লোকঐতিহ্যে পরিণত। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এ দশরথের চার পুত্রের জন্মের পর 'তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা / খড়িতে গণিয়া শুভক্ষণ বেলা'। জন্ম-সংক্রান্ত নানা প্রথা আচারাদির প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-তে জন্ম-কেন্দ্রিক নানা লোক-প্রথা-আচারাদি লভ্য ; কালকেতুর জন্মের পূর্বে নিদয়ার সাধ ভক্ষণের বর্ণনায় মুকুন্দ চক্রবর্তী লোকঐতিহ্যের অনুগত। সেখানে দেখি, দরিদ্র ব্যাধ ধর্মকেতু 'নিদয়ার সাধ হেতু' 'চাহিয়া আনিল আয়োজন। / আপনি রান্ধিয়া ব্যাধ নিদয়ারে দিল সাধ'। উল্লেখ্য লোকসমাজে আসন্ন-প্রসবা রমণীকে তৃপ্তি সহকারে বিভিন্ন ও বিচিত্র খাদ্য ভোজন করানোর জন্য সাধ ভক্ষণের প্রচলন আছে। বলা বাহুল্য, এই 'সাধ-ভক্ষণ'-এর সঙ্গে বিবিধ লোকাচার যুক্ত। একাব্যেরই অন্যত্র, জন্মের পর কালকেতুর নাড়ী ছেদন কালে 'সঘনে হুলুই পড়ল'। জন্মের অষ্টম দিনে 'আট কড়াই কৈল ধর্ম্মকেতু, / নয় দিনে নব নত্তা কৈল শুভ হেতু'—এসবই 'লোকাচার' পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। এখানেই শেষ নয়, তারপর ধর্মকেতু

'ষষ্ঠী পূজা একুশে করিল এক মাসে'। বলা বাহুল্য, এসবই কিন্তু সদ্যোজাতের কল্যাণ-কামনাভিত্তিক লোকানুষ্ঠান; লক্ষণীয়, একাব্যেও জাতকের জন্মক্ষণ ও ভবিষ্যত নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গণকেরা সমাগত,— 'ধর্ম্মকেতু গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু'। এছাড়া 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র 'আখেটিক' ও 'বণিক' উভয় খণ্ডেই সদ্যোজাত শিশুর মঙ্গলার্থে সূতিকাগৃহের দ্বারে 'গো-মুণ্ড' ও 'ষষ্ঠী' স্থাপিত। এ কাব্যের বণিক খণ্ডের 'খুল্লনার সাধ-ভক্ষণ', 'শ্রীমন্তের নামকরণ'–কালে গণকদের উপস্থিতি আখেটিক খণ্ডেরই যেন প্রতিধ্বনি। চৈতন্য-জীবনী কাব্যে দেখি, শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর যখন 'পরিপূর্ণ হইল মাসেক' তখন 'আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী স্থান' (আদি খণ্ড : শ্রীচৈতন্যভাগবত : বৃন্দাবন দাস); এখানেও শিশু নিমাই-এর নামকরণ-অনুষ্ঠানে নানা লোকাচারের সাক্ষাৎ মেলে। 'গণক' না এলেও সেখানে 'বিদ্বান সব' বিচার করেই নামকরণ করেছেন।

নামকরণকালে শিশুর ভবিষ্যত পরিণতির ইঙ্গিত লাভের উদ্দেশ্যে এক বিচিত্র পরীক্ষার প্রচলন লোকসমাজে বিদ্যমান। শিশুর সামনে নানাবিধ সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়। এগুলি এক একটি বৃত্তি বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতবাহী। এদের মধ্যে শিশু যেটি প্রথম স্পর্শ করবে, সেটির মধ্য দিয়ে যোগিত বৃত্তি বা চরিত্রই তার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। যেমন, বই বা কলম ধরলে, ভবিষ্যতে তার বিদ্বান হবার সম্ভাবনা প্রবল বলে বিশ্বাস করা হয়। উল্লেখযোগ্য, ইংলণ্ডের লোকসমাজেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত মেলে। চৈতন্য-জীবনী কাব্যে, শ্রীচৈতন্যের নামকরণ অনুষ্ঠানে 'ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত / ধরিতে আনিঞা করিলেন উপনীত' (ঐ)। 'শ্রীশচীনন্দন' 'ভাগবত ধরিঞা আলিঙ্গন' দিয়েছিলেন বলে উপস্থিত সকলের মনে হয়েছিল, 'শিশু বড় হইব পণ্ডিতে' (ঐ); কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-তেও অনুরূপ বর্ণনা লভ্য।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই লোকসমাজে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত। চর্যাপদে বিবাহের উল্লেখ মেলে,—'কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিলা'[১৪] (১৯ সংপদ : কাহ্নপাদ : চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) অর্থাৎ 'কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলল' (ডোম্বীকে বিবাহ করতে চলল); কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে' রাম সীতার বিবাহের উল্লেখ ও তৎ-সংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা মেলে। যেমন—সীতা 'সাতবার প্রদক্ষিণ করিল রামেরে' অথবা 'কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে। / পঞ্চ হরিতকী দিয়া পরিহার করে'। উল্লেখ্য, আজও

বিবাহানুষ্ঠানে এই সমস্ত লোকাচার প্রচলিত। কৃত্তিবাসের কালেও বিবাহোপলক্ষে 'বাসর' বসত, বিবাহ ও ভোজনান্তে রাম-সীতার জন্য-ও 'সাজায় বাসর ঘর যত সখীগণ'। কাশীরাম দাসের (১৭ শতক) 'মহাভারত'-এও পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ-বর্ণনায়, 'সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী / পঞ্চ ভাই সাতবার প্রদক্ষিণ করি'। এখানে গান্ধর্ব-মতে বিবাহ-প্রথার উল্লেখ একাধিক স্থানে লভ্য।

মধ্যযুগের প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই কোনো না কোনো বিবাহ-বর্ণনা মেলে। 'মনসামঙ্গলে' বেহুলা-লখীন্দরের বিবাহ-বর্ণনায় দেখি, "বিয়ার মঙ্গল স্নান করে লখীন্দর / চৌদিকে হুড়াহুড়ি জয় জোকার। / কনক আসনে বসে সাধুর কুমার / পূর্ণ ঘট হাতে করি আর দধি ধান। / কৌতুকে নারীগণে করে মঙ্গল গান।। / তিল তৈল আমলকী হরিদ্রা পিটানী। / লেপিয়া লখাইর গায় কৌতুকে জল ঢালি'[৭৫] (মনসামঙ্গল : বিজয় গুপ্ত); কেতকাদাস ক্ষেমানন্দেও অনুরূপ চিত্র লভ্য,—'— হরিদ্রা বাঁটিয়া দিল বেহুলার গায় / নারায়ণ তেল দিল তাহার মাথায়—' ইত্যাদি। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-তে একাধিক বিবাহের বিস্তারিত বর্ণনা মেলে। সেখানে 'হরগৌরী', 'কালকেতু-ফুল্লরা', 'ধনপতি-খুল্লনা', 'শ্রীমন্ত-জয়াবতী'-র বিবাহ বর্ণিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে, ধনপতি ও শ্রীমন্ত উভয়েই এক পত্নীর বর্তমানেই অন্য নারীর পাণি গ্রহণ করেছে। এর থেকে সে যুগে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা যে প্রচলিত ছিল তার ইঙ্গিত মেলে।

বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এ গৌরচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মী দেবীর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের উল্লেখ থাকলেও তা বিস্তৃত-বর্ণিত নয়। মাত্র দুটি ছত্রে ভক্ত কবি সে কাজ সেরে নিয়েছেন,—'তবে যত কিছু কুল ব্যবহার আছে / পতিব্রতাগণে তাহা করিলেন পাছে'। মধ্যযুগের শেষ পাদে লোকসমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীদের কাছে বিবাহ-প্রথার ফল নিতান্ত যে অস্থায়ী ছিল, 'অন্নদামঙ্গল'-এ তার ইঙ্গিত মেলে। সেখানে বেদেড়ানী বলছে, 'বৎসর পনের ষোল বয়স আমার। / ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার'[৭৬] (অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র)।

সেযুগেও বিবাহপ্রথা ছিল পণভিত্তিক। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' (বৃন্দাবন দাস)-এ দেখি, লক্ষ্মীদেবীর পিতা গৌরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহে যে পণ দিতে একান্তই অপারগ, তা জানিয়েছেন, 'অন্নদামঙ্গল'-এ (ভারতচন্দ্র) স্ত্রী-সঙ্গ বঞ্চিত বামুর খেদোক্তি, 'কুড়ি টাকা পণ দিয়া

নূতন করিনু বিয়া / একদিনো শুতে না পাইনু'। লক্ষণীয়, শুধু কন্যা-পক্ষই নয়, অনেকক্ষেত্রে বরপক্ষকেও পণ দিয়ে বিবাহ করতে হত।

মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রথারও প্রচলন ছিল। শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' ও 'বিজয়া' পর্বের গানে তার সমর্থন মেলে।

মৃত্যু-কেন্দ্রিক নানা লোকাচার-লোকানুষ্ঠানের উল্লেখও আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় বিধৃত। হিন্দুদের মৃত্যুর পর মৃতকে আগুনে দাহ করার প্রথার উল্লেখ 'রামায়ণে'র সূত্রে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে' 'বালি'র সৎকার প্রসঙ্গে লভ্য। সেখানে রামচন্দ্রের নির্দেশ,—'শুষ্ক কাঠ আন মিত্র অগুরু চন্দন / রাজ আভরণ আন বসন-ভূষণ'; রাবণের মৃতদেহ সৎকার-প্রসঙ্গেও অনুরূপ উপকরণের উল্লেখ মেলে। তবে গুরুত্বানুসারে সে বর্ণনা অধিকতর পুঙ্খানুপুঙ্খ, 'রাবণেরে করাইল স্নান সিন্ধুজলে / সুগন্ধি চন্দন লেপে কন্ঠে বাহু মূলে / দিব্যবস্ত্র পরাইল সোনার পইতে / ....' ইত্যাদি।

লোকসমাজে সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করা হয় না। পুনর্জীবন লাভের আশায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। 'মনসামঙ্গল'-এর কাহিনীতেও সর্পাঘাতে মৃত লখীন্দরকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মৃতের আত্মার শান্তি-কামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রচলন বাংলার লোক-সমাজে প্রচলিত। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র বণিক খণ্ডে ধনপতি নানা লোকা-চারসহ পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেছে,—'তিল তুলসী গঙ্গাজল কুশ-বটু রম্ভা-ফল / যত দূর্বা কুসুম চন্দন। / ধূপ দীপ ঘৃত দধি আয়োজন নানাবিধি। / শ্রাদ্ধ করে বেণের নন্দন'; কাশীদাসী 'মহাভারত'-এও যুদ্ধে মৃত-স্বজনাদির সৎকারে নানা লোকাচারের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত লভ্য ;—'নরনারী কৈল যত পারত্রিক কর্ম। / যেমন বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম।'

উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতায়ও জীবনবৃত্ত-কেন্দ্রিক লোকাচার-লোকানুষ্ঠানাদির প্রভাব লুপ্ত হয় নি। যেমন, প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের স্নিগ্ধ প্রকৃতিকে কবির মনে হয়, 'বিবাহের মাঙ্গলিক বেশভূষা পরি / যেমন রূপসী কনে সাজে মনোহর' (নিসর্গ সন্দর্শন : বিহারীলাল) এখানে 'বিবাহের মাঙ্গলিক বেশভূষা' উচ্চারণ কবির মনে বিবাহের লোকা-চারাদির ইঙ্গিতবাহী ; কখনও বা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের স্মৃতি পথ ধরে বিবাহ-সংক্রান্ত নানা লোকাচার প্রতিফলিত,—আজ 'মিলনের উপকূলে' কবির মনে পড়ে,—'গোধূলির আবছায়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ সেই / পুরজনে করে হুলুধ্বনি। / আনত ঘোমটা-ছায়ে লুকায়ে

গোপনে সেই, একবার সলাজ চাহানি / —' (উপহার : হাসি ও অশ্রু : সরোজকুমারী দেবী) ইত্যাদি। বিবাহানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ শুভদৃষ্টি-কে অবলম্বন করে এখানে প্রেমের আবহ সৃষ্টি-ই কবির উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থের 'বিবাহ' কবিতাটিতে এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে বিবাহ-সংক্রান্ত লোকাচার পালিত হয়েছে। বিবাহ-লগ্নে বর ক্ষেত্রি রাজকুমারকে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছে। কন্যা রাজকুমারের সঙ্গে নববধূর সজ্জাতেই যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত হ'লে 'গৃহবিপ্র আশীর্বাদ করি / ধানদূর্বা দিল তাহার মাথে। / চড়ে কন্যা চতুর্দোলা পরে, / পুরনারী হুলুধ্বনি করে—' ইত্যাদি; কাহিনীর পটভূমিটি রাজস্থান হলেও উক্ত লোকাচারগুলি বাংলার লোকঐতিহ্যেরই অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে, কবিমানসে দেশীয় লোকাচারের প্রভাবই অধিকতর ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়।

মৃত্যু-সংশ্লিষ্ট লোকাচারাদির নিদর্শন 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নবম সর্গে লভ্য। মেঘনাদের মৃতদেহের সৎকার-বর্ণনায় দেখি, প্রথমে মৃতদেহকে 'মন্দাকিনী পূত জলে ধুইয়া যতনে / শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই। থুইল / দাহস্থানে রক্ষোদল——' উল্লিখিত চিত্রের সৎকার-সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াদিতে লোকঐতিহ্যের প্রভাব অনুভূত হয়।

(খ) বর্ষবৃত্ত :

এবার বর্ষবৃত্ত-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়া যাক। বাংলার 'বারোমাসে তেরো পার্বণ' প্রবাদটির ভিত্তি বহু প্রাচীন। মধ্যযুগের বাংলার সমাজে বছরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে নানা আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতায় তার প্রমাণ ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

লোক-উৎসব 'দোলযাত্রা'-র সংশ্লিষ্ট অগ্র্যুৎসব বিশেষ চাঁচর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ উল্লিখিত। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'চাচরী খেলাও মোএঁ যমুনার কূলে'; 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র 'ফুল্লরার বারমাস্যা' অংশে 'জগজনে'র আশ্বিনে 'অম্বিকাপূজা'-র কথা উল্লিখিত; যে সময় 'জগজনে' অম্বিকাপূজার আনন্দে মাতে, সে সময় ফুল্লরা নিদারুণ দারিদ্র্যে কালযাপন করে। 'জগজনের অম্বিকা পূজা' এখানে আনন্দ-উৎসবের পরিচয়বহ; আবার এই কাব্যেরই বণিক খণ্ডে ভগবতীর পূজার জন্য খুল্লনা আশ্বিন মাসে অনশন ব্রত করেছে। শুধু তাই নয়, স্বামী-বিরহে তার আক্ষেপোক্তি 'পৌষেতে

করয়ে লোকে নানা উপভোগ'—লোক-উৎসব পৌষ-পার্বণকেই ইঙ্গিত করে। একাধিক চৈতন্যজীবনী কাব্যে 'আষাঢ় মাসে' রথযাত্রা উৎসবের উল্লেখ মেলে। 'রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমোহন' (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ) মূর্তিটি প্রায় প্রত্যেক চৈতন্য-জীবনীকারের লেখনীতে উদ্ভাসিত; কোথাও বা 'উত্তর দেশের লোক' (উত্তরবঙ্গের-অধিবাসী) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা 'কার্ত্তিকার ব্রত মহিপালের জাগরণ' (বংশ বিস্তার : বৃন্দাবন দাস) ইত্যাদি নানা ব্রত-অনুষ্ঠানাদি পালন করত।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত লৌকিক পূজানুষ্ঠান-আচারাদিকে কেন্দ্র করেই উদ্ভূত হয়েছিল। লৌকিক পূজানুষ্ঠানগুলি বছরের বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট সময়েই অনুষ্ঠিত হত। যেমন, সাধারণত বৈশাখ পূর্ণিমার নির্দিষ্ট দিনে ধর্মঠাকুরের পূজা, মাঘমাসের নির্দিষ্ট দিনে সূর্যপূজা অনুষ্ঠিত হত। বলা বাহুল্য, আজও এসব লৌকিক পূজানুষ্ঠানের আয়োজন নির্দিষ্ট দিনেই লোকসমাজ পালন করে থাকে। সেই সূত্রে উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতায়ও 'নববর্ষ', 'স্নানযাত্রা', 'পৌষপার্বণ', 'সেজুঁতি' ইত্যাদি নানা বিচিত্র লোকউৎসব-ব্রতাদি উল্লিখিত হয়েছে।

সমকালীন কলকাতার বিচিত্র সমাজের সরস চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস ঈশ্বর গুপ্তর 'স্নানযাত্রা' কবিতায় দেখা যায়। 'স্নানযাত্রা' উপলক্ষে জনসমাগম ও ব্যক্তির বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের বাস্তব চিত্রটি পথ চলতি ভাষায় ও উচ্চারণে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'স্নানযাত্রা' সুপরিচিত একটি লোকউৎসব। বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনে জগন্নাথদেবের স্নান উপলক্ষে এই উৎসব পালিত হয়। রথযাত্রার শুরু স্নানযাত্রা থেকে। এটি সৌরউৎসব বলেও অনেকে মনে করেন। অন্যত্র, 'পৌষড়ার গীত' কবিতাটির মূল পটভূমিতে লোকউৎসব 'পৌষ-পার্বণ' বিদ্যমান। 'পৌষ-পার্বণ' মূলত ফসল আহরণ ও সঞ্চয়ের উৎসব। কিন্তু এ উৎসবের সবচেয়ে জনপ্রিয় অঙ্গটি হ'লো 'পিঠেপুলি' ভোজ। স্থানভেদে বিচিত্র নামে ও বিচিত্র আকৃতিতে 'পিঠেপুলি'র আসরটিই এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। 'পৌষড়ার গীত' কবিতাটিতে এইসব 'পিঠে পুলি'-র বেশ কয়েকটি উল্লেখ মেলে। যদিও 'পৌষপার্বণ' উৎসবটির সরাসরি নামোল্লেখ এখানে নেই, কিন্তু ঐ বিশেষ আনন্দের দিনকে কেন্দ্র করেই যে কবি নিজের দুর্দশার কথা বলেছেন, তা স্পষ্ট অনুভূত। আবার বাউল গানের প্যারডি জাতীয় একটি কবিতায় নানা অসঙ্গতি পরিস্ফুটনে ব্যঙ্গপ্রবণ

ঈশ্বরগুপ্ত বিভিন্ন বিসদৃশ, বস্তু ও বিষয়ের সহাবস্থান ঘটিয়েছেন। সেখানে দেখি, 'একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী, / আর ভাদ্দর মাসে সাতই পোষে, চড়ক পূজার দিন এবার' (বোধেন্দুবিকাশ)। লক্ষণীয়, জন্মাষ্টমী কখনোই একাদশী তিথিতে হয় না এবং চড়ক পূজা হয় চৈত্রমাসে, পৌষে নয়।

রঙ্গলালের 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যের কাহিনীতে 'রথযাত্রা' উৎসব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'রথযাত্রা' বাংলার অতি জনপ্রিয় লোক-উৎসব। বছরের নির্দিষ্ট দিনে জগন্নাথদেব সুভদ্রা ও বলরামসহ রথযাত্রা করেন। 'রথযাত্রা'র সঙ্গে সূর্যের যোগ আছে। উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেবতার রথযাত্রার প্রচলন আছে।[৭৭] কবিতায় দেখি, প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে 'রথযাত্রা' উৎসব জগন্নাথদেবের রথের আগে রাজা নিজে ঝাড়ু-দারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর আকাঙ্খিত রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে উনিশ শতকের কাল বদলের দিনে স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী-মুক্তি চেতনার প্রসারে ঈশ্বর গুপ্তর বিরূপ প্রতিক্রিয়া,—'আগে মেয়েগুলো সব ছিল ভালো / ব্রতধর্ম করত সবে'....। শুধু তাই নয়, অদূর ভবিষ্যত সম্বন্ধে কবি সংশয়িত, 'আর কি এরা এমন কোরে, / সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে', (বাঙ্গালীর মেয়ে : গ্রন্থাবলী)। 'সাঁজ-সেজুতি' ব্রত ধর্মনিষ্ঠা ও প্রচলিত প্রথা-আচারাদিরই প্রতীকার্থে ব্যবহৃত।

কখনও রমণীগণ-পালিত এই 'সেঁজুতি ব্রত' নিছক ঘর-সংসারে গণ্ডীবদ্ধ জীবনযাপনের দ্যোতনা এনেছে। 'বাঙ্গালীর মেয়ে'-র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কবির মনে হয়েছে যে, তারা বৃহত্তর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত জগত থেকে বঞ্চিত। তাদের জীবনযাপন যেন অন্ধকূপের মত ঘর গেরস্থালীতেই সীমাবদ্ধ। তারা 'ব্রতকথা-উপকথা-সেঁজুতি পালন' (বাঙ্গালীর মেয়ে : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র) করেই সন্তুষ্ট, এই কবিতাটিতেই 'বাঙ্গালীর' বিবাহানুষ্ঠানের প্রতি কবির কটাক্ষ, '—মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্বে গাজনের গোল' (ঐ)।

অনুরূপ সূত্রে 'সাঁজতির ব্রত' (সেঁজুতি ব্রত)-র উল্লেখ অন্যত্রও লভ্য। উনিশ শতকের নবচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সে যুগের দেশীয় নারীদের অনগ্রসরতায় কবি ক্ষুব্ধ; তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই নব-চেতনার দিনেও দেশীয় নারীরা 'আজ কি করবে সবে সাঁজতির ব্রত' (বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা : কবিতাহার : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী)। এখানে অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন মানসের প্রতীকার্থে 'সাঁজতির ব্রত' পালন প্রযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য কালপর্বের কবিতায় 'ঝুলন', 'হোরি-খেলা', 'স্নানযাত্রা' উপলক্ষে মেলা প্রভৃতি লোকউৎসব-অনুষ্ঠানের উল্লেখ মেলে। 'কথা' কাব্যগ্রন্থের 'হোরি খেলা' কবিতাটিতে 'হোরিখেলা' বা দোল-উৎসবের পটভূমিকায় রাজপুত শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণিত ; বলা বাহুল্য, 'হোরি' বা 'দোল' ভারতের একটি সুপ্রাচীন লোকউৎসব। ভারতের নানা স্থানে এই উৎসব 'হোলি' (হোরি) নামে সুপরিচিত। এই উৎসবটিও মূলে সৌর উৎসব, কিন্তু কালক্রমে তা রাধাকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। অন্যত্র, 'স্নানযাত্রার মেলা' 'সুখ-দুঃখে'র সহাবস্থানের সূচক রূপে গৃহীত ; মেলার আনন্দে সকলে মাতলেও একটি ছেলে তার বহু-ঈপ্সিত 'তালপাতার বাঁশি' (স্নানযাত্রা : ক্ষণিকা : রবীন্দ্রনাথ) কিনতে পারে নি বলে বিষন্ন হয়ে থেকেছে।

৪। অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুসৃতি ঃ

আদিমযুগে অঙ্গভঙ্গি মানুষের ভাষার কাজ করত। তা ছিল মানুষের পারস্পরিক যোগসূত্রের মাধ্যম। ভাষার আবির্ভাবের পর থেকে আমাদের জীবনে অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিকতার গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবু, এখনও বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গি আমাদের কাছে বিশেষ বিশেষ ভাব ও অর্থ বহন করে। এছাড়া লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকসার্কাস ইত্যাদি শাখায় অঙ্গভঙ্গির গুরুত্বও কম নয়।

৪। (১) নৃত্য : একাধিক চর্যাপদে নৃত্য-পারদর্শিনী ডোম্বীর উল্লেখ পাই। অনেকের মতে, সে যুগের নৃত্য-গীত শুধুমাত্র অবসর-বিনোদনের উপায়-ই নয়, জীবিকারও অন্যতম অবলম্বন রূপে প্রচলিত ছিল। 'চর্যা-চর্যবিনিশ্চয়,-এর ১০ সংখ্যক পদে দেখি, 'এক সো পদমা চৌষঠী পাখুড়ী / তাই চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী (কাহ্নপাদ)। অর্থাৎ 'একটি সে পদ্ম, চৌষট্টি দল / তাতে চড়ে নৃত্যরত ডোম্বী বাপুড়ী।'[১৮] গুহ্য সাধনতত্ত্বের অন্তর্গত চৌষট্টি দল সমন্বিত পদ্মের জাগরণই সান্ধ্য-ভাষায় নৃত্যের রূপকে প্রতিভাত। 'মনসামঙ্গলের কাহিনীতে নৃত্যের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, কাহিনীর পরিণতি সংঘটনে। মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনের সংকল্প নিয়ে বেহুলা স্বর্গে গেছে। সেখানে মহাদেবকে নৃত্যে সন্তুষ্ট করে সে মনসার কোপদৃষ্টি থেকে লখীন্দর, চাঁদ ও

তার সমস্ত পুত্রদের পরিত্রাণে সমর্থ হয়েছে। ফলত, চাঁদ মনসাকে পুজা দিয়েছেন। এভাবেই কাহিনীর মধুর পরিণতি সংঘটিত হয়েছে।

মধ্যযুগের অমূল্য তথ্যভাণ্ডার 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এ (বৃন্দাবন দাস) এক শিবের গায়েন মহাপ্রভুর গৃহে এসে 'গাইয়া শিবের গীত বেড়িনৃত্য' করে। বলা বাহুল্য, এই নৃত্য লোকনৃত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য শক্তি উপলব্ধি করে সনাতন বলেছেন, 'কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় / আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায় / যৈছে যারে নাচাও তৈছে সে করে নর্তনে। । কৈছে নাচে কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে'। মানুষ যে ঈশ্বরচালিত এবং শ্রীচৈতন্য স্বয়ং যে ঈশ্বর এই ভাবটি পুতুল নাচের উপমা-সূত্রে উপস্থাপিত।

'গোরক্ষ বিজয়'-এ নৃত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধনপথচ্যুত মোহ-গ্রস্ত গুরু মীননাথকে শিষ্য গোরক্ষনাথ নর্তকীর ছদ্মবেশে, নৃত্যের মাধ্যমে সচেতন করে তোলেন। পথভ্রষ্ট গুরু শিষ্যের প্রয়াসে সাধনপথে প্রত্যা-বর্তন করেন। এইভাবে সমগ্র কাহিনীর ইতিবাচক পরিণতি সংঘটনে নৃত্যের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ শিবের দক্ষালয়-যাত্রার বর্ণনায় শিব ও তাঁর অনুচরবৃন্দের উদ্দাম নৃত্যের উল্লেখ লভ্য,--'চলে ভৈরব-ভৈরবী নন্দীভৃঙ্গী। / মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।' অবশ্য এ নৃত্য অধিকাংশ পরিমাণে আদিম নৃত্যকেই স্মরণ করায়। রামপ্রসাদের শাক্তপদে জীবন-যাপন-কর্মাদি পুতুল নাচের রূপকে বিধৃত,--'তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচি।'

উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত তুলনামূলক বিচারে স্বল্প হলেও একেবারে বিরল-দৃষ্ট নয়।

'নানা রাগ-রঙ্গ রসভরা' বাংলার 'স্নানযাত্রা'র বর্ণনায় দেখি, 'কেহ বলে বাবা ভাই, আমি এক গীত গাই। / নাচ তোরা নাগর নাগরী' (স্নানযাত্রা : ঈশ্বর গুপ্ত)। এ দৃশ্য লোকসমাজে প্রচলিত দ্বৈত নৃত্য-ই স্মরণে আনে।

'বীরাঙ্গনা'র (মধুসূদন) 'দশরথের প্রতি কেকয়ী'-র পত্রে ক্ষুব্ধ কেকয়ী দশরথের অধর্মাচরণের কথা সর্বত্র প্রচার করবেন, জানিয়েছেন। প্রচারের পদ্ধতিটি কেমন হবে, সেকথাও তিনি ঘোষণা করেছেন,... '....শিখাইব পল্লীবালা দলে। / করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া /

পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি'––এখানে পল্লীবালাদের নৃত্য-সহযোগে দশরথের অপবাদ-কীর্তনের চিত্রকল্পনায় কেকয়ীর বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গিটি ধরা পড়েছে।

আবার নবীনচন্দ্র তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৫৭) কাব্যে আশা-মুগ্ধ মানব-জীবনকে 'দক্ষ বাজিকরে'র নাচানো' পুতুল নাচের রূপকে পরিস্ফুট করেছেন।

৪। (২) অন্যান্য অঙ্গভঙ্গি: যুক্তকরে কিছু বলা, অনুরোধ বা বিনয়েরই সূচক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়েই যুক্ত হস্তে পরস্পরকে নানা মিনতি করেছেন; কখনো তা বড়ায়ির মাধ্যমে, কখনো বা সরাসরি। কিন্তু উভয়ত্রই প্রার্থনাসূচক লোকভঙ্গির প্রয়োগ লভ্য। যেমন, 'তাম্বুল খণ্ডে' শ্রীকৃষ্ণ বড়ায়ি মারফৎ শ্রীরাধাকে প্রেম নিবেদন করেছেন। কেমন করে বড়ায়ি সেই প্রেম-নিবেদনের বার্তাটি রাধার কাছে পেশ করবেন, তার নির্দেশ-দান সূত্রে এই লোকভঙ্গিটি গৃহীত,––'মোর হাত করী তাক বুলিহ বচনে'। এ কাব্যের 'দানখণ্ডে' শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা জানান, 'ঝগড় না কর পথে যোড় হাথ করি বোলোঁ / সমুচিত নেহ মোর দানে'। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ যুক্ত-হস্তে ভাঁড়ু দত্তেরও সাক্ষাৎ মেলে। ভাঁড়ুর নানা কুকীর্তির সংবাদ পেয়ে কালকেতু তাকে ডেকে পাঠালে সে কপট আনুগত্য প্রকাশ করেছে এইভাবে,––'জুড়িয়া উভয় পাণি ধীরে কৈল নতি' (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)। এখানে যুক্ত করে নত হওয়ার আনুগত্য-সূচক লোকভঙ্গিটি অপূর্ব শব্দ চিত্রে মূর্ত হয়ে ভাঁড়ু দত্তকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। প্রসঙ্গত, কলিঙ্গ রাজদরবারেও ভাঁড়ুর অনুরূপ কপট-বিনয়ের কথা মনে পড়ে,––'জুড়িয়া যুগল পাণি ভাঁড়ু দত্ত বলে বাণী / ক্ষিতি নাথ চরণে তোমার' (ঐ)।

জয়ানন্দ-র (১৬ শতক) 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-এ অত্যাচারী সুলতানকে 'দিগম্বরী' ভয় দেখালে ভীত যবনরাজ তার কৃতকর্মের জন্য 'নাকে খত দিলা..।' ক্ষমা প্রার্থনাজনিত লোকভঙ্গিটি এখানে হাস্যরসের সৃষ্টিতেও সার্থক-প্রযুক্ত।

পরবর্তীকালের কাব্য-কবিতাতেও অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুসৃতি একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

'ছায়াময়ী' (রঙ্গলাল) কাব্যে 'শরীরী'-র প্রশ্নের উত্তরে অমরী 'নির্দেশ কৈলা হেলায়ে অঙ্গুলি',—অঙ্গুলি দ্বারা বস্তু বা বিষয় নির্দেশ আমাদের অতি পরিচিত লোকভঙ্গি।

'বাঙ্গালীর মেয়ে' কবিতায় (কবিতাবলী) হেমচন্দ্র বাংলার মেয়েদের প্রতি তীব্র কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করেছেন। অবশ্য সে বিদ্রূপের মূলে কবির গভীর সহানুভূতিবোধ বর্তমান। কবিতাটিতে দেখি,—'বাসর ঘরে ঝুমুর কবি চোখের মাথা খেয়ে, / প্রভাত হলে পিসশাশুড়ী ঘোমটা মুখে চেয়ে / ....' ইত্যাদি। 'ঘোমটা-মুখে' লজ্জা-সংকোচের সূচক হলেও এখানে কটাক্ষসূত্রে তা কপট লজ্জার ইঙ্গিতবাহী হয়েছে। কখনো বা এই 'ঘোমটা'র রূপকে ফুলের পূর্ণ-প্রস্ফুটন চিত্রিত...'ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস' (২য় সর্গ : স্বপ্নপ্রয়াণ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর); একটি কবিতায় প্রিয়তমার বিষন্ন মুখ দেখে কবির মনে হয়েছে,—'....ঘোমটার জলদ আঁধারে / তোমার ও মুখশশী কাঁদিছে কাতরে'। (প্রিয়তমার প্রতি : পারিজাতগুচ্ছ : দেবেন্দ্রনাথ সেন)।

৫। ক্রীড়া-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি :

কর্মভারে ন্যুব্জ মানুষের প্রয়োজন অবসরের। কিন্তু একেবারে নিস্পৃহ অবসর যাপন-ও ক্লান্তিকর। তাই সে চিত্তবিনোদনের জন্য নানা উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করেছে। এদের মধ্যে খেলাধূলাই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বস্তুগত-ভাবে উপকারীও। লোকক্রীড়াগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়,—(১) গৃহ আশ্রয়ী, (২) বহিরাশ্রয়ী। আলোচ্য কাব্য-কবিতায় এই দুটি শ্রেণীর ক্রীড়ারই সাক্ষাৎ নানা স্থানে মেলে।

৫। (১) গৃহ-আশ্রয়ী : 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর ১২ সংখ্যক পদে দেখি, 'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয় বল' (কাহ্নপাদ) অর্থাৎ 'করুণাকে পীঁঠ করে নয় বল (নববল) খেলছি।' 'নয়বল' সম্ভবত দাবা খেলা। অনুমান,—খেলাটি বিদেশাগত।[৭৯] তবে বাংলার লোকসমাজে এর ব্যাপক প্রচলন বর্তমান।

"কবিকঙ্কণ চণ্ডী"-র বণিক খণ্ডে, দীর্ঘকাল অদর্শনের পর ধনপতি খুল্লনার মধুর-মিলন মুহূর্তে খুল্লনা ধনপতিকে বলেছে, 'আইস যামিনী যোগে দোঁহে খেলি পাশা'; শেষ পর্যন্ত একজন 'ভাণ্ডার' সকল ও অন্যজন 'রতি' পণ করে খেলতে বসেছে।

আবার উনিশ শতকের কবি রঙ্গলাল তাঁর 'কর্মদেবী' কাব্যে লিখেছেন, 'পুতুলে পুতুলে বিয়া, বহু বহু কেলী। / নিতান্ত কৈশোরে যত বাল-বালা মেলি। / কি রূপে পৌরুষ পথে যাইবে বালক'। উল্লেখ্য, যে

কোনো দেশের ক্রীড়ায় জাতীয় চরিত্রের যে ইঙ্গিত থাকে, তা এখানে সমর্থিত। 'পুতুল খেলা' সাধারণত বালিকারাই খেলে। এ খেলায় শরীর ও বুদ্ধির চর্চার প্রয়োজন হয় না। স্বদেশের পরাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে তাই কবির মনে হল যে, শৈশব থেকেই বাংলা দেশের বালক-বালিকাদের এ ধরণের উপযোগিতাহীন খেলাধূলা পৌরুষময় জাতীয় চরিত্র গঠনের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

৫। (২) বহিরাশ্রয়ী : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ বৃদ্ধ বড়ায়ি রাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকর্মের বর্ণনাদান-সূত্রে 'গেণ্ডুআ খেলা'র কথা উল্লেখ করেছে, 'কাহাঞি....। গোণ্ডুআ খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে'—এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের 'গেণ্ডুআ' (কন্দুক) খেলা রাধিকার প্রতি উদাসীনতার সূক্ষ্ম ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে; 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-র ব্যাধ-কাহিনীতে কালকেতুর অমিত বিক্রম বর্ণনা সূত্রে দেখি, 'লইয়া ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা / তার হয় জীবন সংশয়', (ফাউড়া ডেলা-ডাণ্ডা-গুলি); একাব্যের বণিক খণ্ডের একস্থানে দেখি, শিশু শ্রীমন্তের দুরন্তপনায় খুল্লনা একেবারে বিপর্যস্ত। পড়াশোনায় ছেলের মন নেই। তাই পুরোহিতের কাছে তার আকুল প্রার্থনা, 'যত চাহ দিব ধন নিবিষ্ট করাও মন / সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান'। কারণ 'নগরিয়া শিশু সঙ্গে খেলা করি ফিরে রঙ্গে / খেলে চিকা গুলি দাঁড়া ভাটা / পাশাতে হইয়া বল ডাকে সদা দশ দশ / বিপঞ্চিকা খেলায় শকটা'; বলা বাহুল্য, 'চিকা', 'গুলি', 'দাঁড়া' ইত্যাদি লোকক্রীড়া-পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-এ রাখাল বালকদের গো-চারণার চিত্রে দেখা যায় যে, রাখালেরা গরুদের মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। তারপর নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে নানা ক্রীড়ায় মগ্ন থাকে। 'যোল শত ধেনু লইয়া শতেক রাখাল'-এর মধ্যে 'কেহ টিক ডাড়ি খেলে কেহ ভেটা কড়ি। / কার লাগ ধরে কেহ করে রড়ারড়ি'। উল্লেখযোগ্য, 'ডাড়ি', 'ভেটাকড়ি' লোকক্রীড়াবিশেষ; এছাড়া রামপ্রসাদের একটি পদে জীবের মনের রূপকার্থে 'ঘুড়ি' গৃহীত হয়েছে। সাধক কবির কল্পনায় মনে হয়েছে, মহামায়া যেন 'মায়াদড়ি' বেঁধে 'আশা বায়ুতে' এই ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন,—'শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি / সংসার বাজারের মাঝে'।

আবার অন্যত্র প্রায় একই সূত্রে হেমচন্দ্র 'বাঙালী মেয়ে'-র চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তারা খেলাধুলার দিক থেকে ভীতু ও নিতান্তই গতানুগতিক—'খেলায় দিগ্‌গজ কেঁয়ে চোরের সর্দার। /

লুকোচুরি যমের বাড়ী—স্পষ্ট করে ঠার ॥' (বাঙ্গালীর মেয়ে : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র); এই লুকোচুরি খেলার উল্লেখ 'সারদামঙ্গল'—(বিহারীলাল) এ'ও মেলে। এখানে কবির সঙ্গে তাঁর আরাধ্যা 'সারদা'র 'লুকোচুরি' খেলা তাঁর অপার রহস্যময়তার দ্যোতনা এনেছে; অতীতের স্মৃতি-চারণা সূত্রে শৈশবের 'লুকোচুরি' খেলার উল্লেখও পাওয়া যায়,—'মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে, / কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে' (বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর : কড়ি ও কোমল : রবীন্দ্রনাথ)। 'লুকোচুরি' এখানে একই সঙ্গে মেঘের ভাসমান অবস্থা এবং শৈশব-স্মৃতির সূচক হয়ে উঠেছে।

দেশপ্রেমের ভাণ দেখিয়ে অন্তঃসারশূন্য কিছু ব্যক্তি, তাদের স্বল্প-বিদ্যাকেই সর্বত্র জাহির করে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়,—এরা 'দেশের লোকের কানের গোড়াতে। বিদ্যেটা নিয়ে লাটিম ঘোরাতে চায়' (বঙ্গবীর : মানসী : ঐ)। লাটিম এখানে একই সঙ্গে প্রচার ও পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিতবাহী।

৬। শিল্পবস্তু-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্য :

লোকসমাজ কখনও স্বতন্ত্রভাবে, কখনও নিত্য ব্যবহার্য বস্তুকে ভিত্তি করে তার শিল্পীমানসের স্ফূর্তি ঘটিয়েছে। যেমন, 'নৌকা' যানবাহন হিসেবে লোকসমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নানা বিচিত্র কারুকার্য-যোগে লোকসাধারণ তাকে একই সঙ্গে শিল্পস্তরেও উন্নীত করেছে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় বহুবিচিত্র নৌকার উল্লেখ লভ্য। এদের গঠনগত শিল্প-বৈচিত্র্যে লোকবিশ্বাস-সংস্কার ও যাদুক্রিয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। নৌকার 'গলুই' নির্মাণে বিশেষ বিশেষ পশু বা পাখির আকৃতির অনুস্মৃতি লক্ষণীয়; শুধু তাই নয়, লোকবিশ্বাস থেকে এদের জীবন্ত করে তোলার প্রয়াসও চলত। তাই নৌকার নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হলে গলুই-এ উৎকীর্ণ সেই পশু বা পাখির চোখে মণিমাণিক্য দিয়ে যেন তার প্রাণ দান করা হত।[৮০] উল্লেখযোগ্য, এসবের মধ্য দিয়ে লোক-সমাজের শিল্প-দক্ষতারও পরিচয় মেলে।

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-এ বর্ণিত চাঁদসদাগরের বাণিজ্য যাত্রার বহরের অষ্টম নৌকাটি 'টিয়াঠুঁঠী'। সম্ভবত, টিয়াপাখির ঠোঁটের আকৃতির সঙ্গে নৌকার সম্মুখভাগের সাদৃশ্য-সূত্রে এই নামকরণ। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-তেও দেখি, বাণিজ্য-যাত্রা উপলক্ষে বিচিত্র গঠনের, বিচিত্র নামের

নৌকার সমাবেশ। উল্লিখিত নৌকাগুলির নামকরণের মাধ্যমে তাদের আকৃতি ও গঠনবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। 'সপ্ত ডিঙ্গা'-র একটির গঠন-বৈশিষ্ট্য দেখা যাক, '—মকর আকর মাথা / গজদন্তের বাতা / মাণিকে করিল চক্ষুদান'।

যানবাহনাদির মতো অলঙ্কারাদিতেও লোক-শিল্পীমানসটি প্রতিফলিত। আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতায় এই জাতীয় অলঙ্কারের উল্লেখ মেলে। যেমন, সীতার বিবাহোপলক্ষে সখীরা তাঁকে নানাভাবে সজ্জিত করেছেন, তার মধ্যে 'বিচিত্র নির্মাণ দিল শঙ্খ দুই বাহু' (রামায়ণ : কৃত্তিবাস) কারুকার্যময় শাঁখারই পরিচয়বাহী। পরবর্তী কালের কাব্য-কবিতায় লোক-ঐতিহ্যের শিল্পকেন্দ্রিকতার প্রভাব ও প্রয়োগ আদৌ সুলভ নয়। তবে তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃতও হয় নি। যেমন, রঙ্গলালের 'কর্মদেবী'-তে 'পুতুলে পুতুলে বিয়া বহু বহু কেলী' উক্তিতে পুতুলশিল্পের উল্লেখ লভ্য।

বিবাহাদি অনুষ্ঠানের নানা লোকাচারাদির মধ্যে অন্যতম, 'ছিরি' বা 'শ্রী' সহযোগে 'বরণ'। চালবাটার মণ্ড দিয়ে নানাকৃতি পিণ্ড তৈরী হয়। মণ্ডের সঙ্গে নানা রঙ মিশিয়ে ঐ পিণ্ডের গায়ে বিচিত্র কারুকার্য সহযোগে এই 'শ্রী' প্রস্তুত হয়। হাঁস, প্রজাপতি, নানা বিচিত্র কল্কা ইত্যাদি শিল্পকর্ম 'শ্রী'তে উৎকীর্ণ। কবিতায় দেখি, এই 'ছিরি' বা 'শ্রী' প্রস্তুতকর্মটি সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ জীবন-যাপনের সূচকরূপে গৃহীত। কবির মনে হয়েছে, বাঙ্গালীর জগত—'হদ্দ বাহাদুরী' 'ছিরি' বিচিত্র কারখানা'র (বাঙ্গালীর মেয়ে : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র) মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৭। লিখন বা অঙ্কন-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্য :

লোকঐতিহ্যের এই পর্যায়েও লোক সাধারণের ব্যবহারিক জীবনের প্রভাব সক্রিয়। কারণ অধিকাংশ লোকচিত্রে লোকসমাজের ব্যবহারিক জীবন কোনো না কোনোভাবে প্রতিভাত হয়। দৈনন্দিন জীবনকে ভিত্তি করেই তাদের সৃষ্টিশীলতা সাধ্যানুগ কল্পনাকে আশ্রয় করে কখনও কখনও বিমূর্ত পর্যায়েও উন্নীত হয়। নানা আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিচিত্র আলপনা রচনায় যার প্রমাণ মেলে। অবশ্য পূজানুষ্ঠানাদি উপলক্ষে রচিত চিত্রে যাদুবিদ্যার প্রভাবও দুর্লক্ষ নয়।

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-এ দেওয়াল-চিত্রের উল্লেখ লভ্য—মৃত লখীন্দরের পুনরুজ্জীবনের আশায় বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে মান্দাসায়

চড়েছে। যাত্রাকালে বাসরগৃহের দেওয়ালে কিছু বিশেষ ইঙ্গিতময় চিত্রাঙ্কন করে গেছে, 'অঙ্গারে ময়ূর বামা বাসরে লিখিয়া / শাশুড়ীকে বলে বামা বিনয় করিয়া / ছয় মাস বই যদি ময়ূরে পেখম ধরে / তবে সে জানিবেন প্রভু আসিবেন ঘরে।' / —এখানে দেওয়ালে চিত্রিত 'ময়ূরের পেখম' জীবনের ইঙ্গিতবাহী; এছাড়া মৃত ব্যক্তির প্রাণ লাভ হলে দেওয়ালে চিত্রিত ময়ূর পেখম ধরবে এই বিশ্বাস ও ক্রিয়ার অনুকরণাত্মক যাদুবিদ্যার অবিসংবাদিত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল'-এ ভিন্নসূত্রে দেওয়াল-চিত্রণের সাক্ষাৎ মেলে। মনসা পূজা করতে স্বীকৃত হাসান, 'বিচিত্র দেয়াল গাথে নানা চিত্র করে তাথে / নানা বর্নে মূরতি অপার'; অন্যত্র, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন-ব্যাকুলা শ্রীরাধার বর্ণনাসূত্রে 'এক পয়োধরে চন্দন লেপিত / আরে সহজই গোর' (যশোরাজ খান: আনুমানিক ১৫ শতক) এখানে অসম্পূর্ণ অঙ্গরাগ শ্রীরাধার ব্যাকুল-হৃদয়ের দ্যোতক। বলা বাহুল্য, এই 'অঙ্গরাগে, লোকঐতিহ্যের প্রভাব অনস্বীকার্য।

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'-তে 'অভয়ার কাঁচুলিতে' নানা পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত চিত্রের সমাবেশ সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের নিদর্শন। বিবাহোৎসব উপলক্ষে অঙ্কিত আলপনাদিতেও লোকঐতিহ্যের অনুসৃতি লক্ষণীয়। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' (বৃন্দাবনদাস)-এ এই জাতীয় আলপনা উল্লিখিত। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহোপলক্ষে অধিবাসকালে 'সকল একত্র আনি করি সমুচ্চয় / সর্বভূমি করিলেন আলিপনাময়।' আবার রূপরাম-এর 'ধর্মমঙ্গল'-এ জম্বুবতী ইন্দ্রসভায় নাচবেন বলে কারুকার্য বিশিষ্ট 'কাঁচুলি' পরেছেন। বিশেষ বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে বাংলার লোকগৃহে 'মঙ্গলঘট' স্থাপিত হয়। মাটি বা পিতলের ঘটি বা ঘটের গায়ে সিঁদুর দিয়ে প্রতীকী গণেশ মূর্তি চিত্রিত হয়। দ্বিজরামদেবের 'অভয়ামঙ্গল'-এর 'গণেশ বন্দনায়' দেখি 'বন্দহ লম্বোদর সিন্দুরে সুন্দর / ঘটেতে কর অধিষ্ঠান'।

উনিশ শতকের কাব্য-কবিতায় কিন্তু এই পর্যায়ের প্রভাব-প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত প্রচুর নয়।

কবির সঙ্গে পটচিত্রকার বা পটুয়ার তুলনা করে কখনো কবিতা ও পটচিত্রের পারস্পরিক সাদৃশ্য-সন্ধানের প্রয়াস দেখা যায়। এই সূত্রে কবি ও পটুয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যও উল্লিখিত,—'চিত্রকর দেখে যত বাহ্য অবয়ব / —পটুয়ার চিত্র ক্রমে রূপান্তর হয়। / কবি চিত্র কিবা

চিত্র, বিনাশের নয়।' (কবি : ঈশ্বর গুপ্ত)। এখানে কবির কবিত্ব ও কবিতার মহিমা বর্ণনাই গুপ্ত কবির মূল উদ্দেশ্য। সেই সূত্রে কবি লোকসমাজের শিল্পীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কখনও 'বাঙ্গালীর মেয়ে'র প্রতি কটাক্ষ সূত্রে, 'বাঙ্গালীর মেয়ে'-রা 'চিত্রগুপ্তপিঁড়িতে আলপনা' (বাঙ্গালীর মেয়ে : কবিতাবলী : হেমচন্দ্র)। এখানে 'আলপনাদি-চিত্রকর্ম' বঙ্গনারীদের গৃহকোণমুখিতারই ইঙ্গিতবাহী।

উপসংহার :

পূর্ব বিশ শতকীয় বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের ব্যাপক প্রভাব-প্রতিফলনের কয়েকটি নিদর্শন মাত্র দেখান হল। এ কালপর্বে নগর ও লোকসমাজের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কই লোকঐতিহ্যের এই ব্যাপক প্রভাব-প্রতিফলনের প্রধানতম কারণ।

বস্তু-কেন্দ্রিক তো বটেই, লোকঐতিহ্যের অন্যান্য পর্যায়ের বিচিত্র উপাদান উপকরণও এ যুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় বহুল-ব্যবহৃত। বিশেষত, বাক ও বিশ্বাস-অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের প্রচুর নিদর্শন এ কালপর্বের কাব্য-কবিতায় লভ্য।

বাস্তব পরিবেশের প্রতিবিম্বণে, চরিত্র ও বক্তব্য পরিস্ফুটনে এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক হাস্যরস পরিবেশনে অনেক সময় প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা তাঁদের কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যানুসারী।

উনিশ শতকের কাব্য-কবিতা সম্বন্ধেও একথা খাটে। অধিকন্তু, উনিশ শতকের কবিরা তাঁদের স্বদেশ-প্রীতি ও রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশনেও কোনো কোনো সময় লোকঐতিহ্যাশ্রয়ী।

উল্লেখপঞ্জী

১। গোপাল হালদার : বাঙালী সংস্কৃতির রূপ; ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃঃ ২৫।
২। ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ২য় পর্যায় (৪র্থ সংস্করণ)। কলকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ২৫।
৩। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী' (৩য় সংস্করণ); কলকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ৮০।
৪। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত বড়ু চণ্ডী দাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (৭ম সংস্করণ); কলকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ১২৩।
৫। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'; কলকাতা, ১৯৫২, পঃ ১১৬।
৬। শ্রীবিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মাণিকরাম গাঙ্গুলী-র 'ধর্মমঙ্গল', কলকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৫৮১।
৭। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'; কলকাতা, ১৯৫২, পঃ ৯৭।
৮। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি পদাবলী; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০।
৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' (৬ সং); কলকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ১৬।
১০। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি পদাবলী, পূর্বোক্ত; পৃ ৬৮।
১১। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি পদাবলী, পূর্বোক্ত; পৃঃ ৮৩।
১২। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫।
১৩। ডঃ মানস মজুমদার : অক্ষয় কুমার বড়াল ও বাংলা সাহিত্য; কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ১-২।
১৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'; পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯।
১৫। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী'; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫।
১৬। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী'; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।
১৭। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'; পূর্বোক্ত,
১৮। যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' (২য় সং); কলকাতা, ১৯৪৯, পৃঃ ২৪০।
১৯। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড); কলকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ১৬২-৬৩।
২০। ডঃ সুকুমার সেন : বিচিত্র সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃঃ ২৫-৩২।
২১। ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত দ্বিজরাম দেবের, 'অভয়ামঙ্গল'; কলকাতা, ১৯৫৭।
২২। যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল' কলকাতা; ১২৯০, পৃঃ ১৬৯।

২৩। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী' ; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২।
২৪। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী' ; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।
২৫। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭।
২৬। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', পূর্বোক্ত।
২৭। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৪।
২৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' কলকাতা ১৩১৫।
২৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' (৩য় সং) ; কলকাতা, ১৩৬৯।
৩০। ডঃ সুকুমার সেন 'চর্যাগীতি পদাবলী' ; পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।
৩১। ডঃ সুকুমার সেন 'চর্যাগীতি পদাবলী' ; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০।
৩২। ডঃ সুকুমার সেন 'চর্যাগীতি পদাবলী' ; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৫।
৩৩। ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় : 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' কলকাতা।
৩৪। দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন' ; কলকাতা, ১৩৬৩।
৩৫। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য ; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২৮।
৩৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মানিক গাঙ্গুলীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল' ; কলকাতা, ১৩২২, পৃঃ ৯-১০।
৩৭। ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত দ্বিজরাম দেবের 'অভয়ামঙ্গল' ; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।
৩৮। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসের 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' (৮ম সং) ; কলকাতা, ১৩৫৩, পৃঃ ৫৩০।
৩৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩।
৪০। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২০।
৪১। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' ; প্রথম খণ্ড, কলকাতা,১৯৮৭, দ্রঃ 'ভূমিকা' অংশ।
৪২। ডঃ মযহারুল ইসলাম ও আব্দুল হাকিম সম্পাদিত 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' ; ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ১৩৯-৪০।
৪৩। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসের 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭৩।
৪৪। বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ; কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ১২৬-১২৭।
৪৫। বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ; কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ১২৭।
৪৬। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (৩য় সংস্করণ) ; কলকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ৬২৭-৮৮।
৪৭। বিনয় ঘোষ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
৪৮। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড, ১ম পর্ব) : কলকাতা।

৪৯। পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোৰ্খ বিজয়' (বিশ্বভারতী : ১৩৫৬) ডঃ সুকুমার সেন লিখিত ভূমিকার 'নাথ পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য' অংশ দ্রষ্টব্য।

৫০। Dr. Sashi Bhusan Dasgupta : Obscure Religious Cults as a Background of Bengali Literatnre.

৫১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৮।

৫২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছিন্নপত্র, ১৩৩৫, পৃঃ ১২২-২৩।

৫৩। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক; ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, (পরিবর্ধিত সংস্করণ) ১৩৫৩, পৃঃ ২৪৩।

৫৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।

৫৫। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : 'রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৬, ২য় সংখ্যা।

৫৬। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা' গ্রন্থের শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য, কলকাতা, ১৯৫৯।

৫৭। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা' গ্রন্থের শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য, কলকাতা, ১৯৫৯।

৫৮। ডঃ মযহারুল ইসলাম : ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন (২য় সংস্করণ), ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৮৫।

৫৯। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড)।

৬০। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম সংস্করণ) ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৬।

৬১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৯, ২য়-৩য় সংখ্যা।

৬২। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও মদন মোহন কুমার সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য, (৯ম সংস্করণ) কলকাতা, ১৩৮০।

৬৩। ডঃ সুকুমার সেন : বিচিত্র সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৫৩।

৬৪। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (২য় সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ ১৯৮।

৬৫। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (২য় সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ১৯৮।

৬৬। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল', কলকাতা, ১৯৬০, পৃঃ১০০।

৬৭। ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃঃ ১৩৯।

৬৮। শ্রীনুটবিহারী রায় সম্পাদিত মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল, কলকাতা, ১৩১০, পৃঃ ১১৩।

৬৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত মাণিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্মমঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩।

৭০। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯।
৭১। যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮।
৭২। ডঃ মানস মজুমদার : 'যাদুনির্ভর লোকজীবন', বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৪।
৭৩। ডঃ মযহারুল ইসলাম ও আব্দুল হাফিজ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০১।
৭৪। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতি পদাবলী ; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১।
৭৫। নগেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' ; কলকাতা, পৃঃ ৪৯।
৭৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৮।
৭৭। ডঃ দুলাল চৌধুরী : বাংলার লোকউৎসব, কলকাতা ; ১৯৮৭, পৃঃ ৬৩।
৭৮। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫।
৭৯। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।
৮০। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক : বিহঙ্গচারণা ; কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ১৯১।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের (১৯০১-৫০) বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-সূত্র অন্বেষণ

ভূমিকা

সামগ্রিক ভাবেই নাগরিক সমাজ-সংস্কৃতি জন্মসূত্রে লোকঐতিহ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। তাই যে কোন দেশের 'নাগরিক সাহিত্যে' বা 'লিখিত সাহিত্যে' লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলন অনিবার্য। বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রেও লোকঐতিহ্যের প্রভাব সুদূর-প্রসারী।

আলোচ্য কাল-পর্বের কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের এই প্রভাব-প্রতিফলন আকস্মিক বা অভাবিত নয়। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক কারণ ছাড়াও কবি-বিশেষের লোকঐতিহ্যপ্রীতি প্রেরণা-সঞ্চারী হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, বিশ শতকের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই বাংলার নাগরিক সমাজে লোকঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ ও তার চর্চা ক্রমবিস্তারী।

পরোক্ষ হলেও এই আগ্রহ ও চর্চার প্রকাশ ঘটেছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত 'কথোপকথন' (১৮০২ খ্রীঃ) গ্রন্থটিতে। এ প্রসঙ্গে 'ইতিহাসমালা' (১৮১২ খ্রীঃ) গ্রন্থটিও স্মর্তব্য। উভয় গ্রন্থেরই পরিকল্পনার কৃতিত্ব উইলিয়াম কেরীর। প্রথমটিতে উপভাষা এবং দ্বিতীয়টিতে একাধিক লোককথা সংকলনের মধ্য দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই কেরী বাংলার লোকঐতিহ্য-চর্চার এক নূতন সম্ভাবনার সূচনা করেন। পরবর্তীকালে শাসনকার্যের বৃহত্তর স্বার্থে কিংবা ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসার সূত্রে বাংলার শিক্ষিত মহলে লোকঐতিহ্যের প্রতি মনোযোগ দেখা গেল। এ ক্ষেত্রে বিদেশীয়দের সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিদর্শন-স্বরূপ, H. Beverleyর Report on census of Bengal on different schedule caste and Tribal Communities (১৮৭২ খ্রীঃ)-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এটি রচিত হলেও বাংলার বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বহু তথ্য

এ প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট হয়। আবার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী Rev. Long-এর প্রবাদ সংকলনগুলি লোকঐতিহ্যের প্রতি ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা আকর্ষণের স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। অবশ্য এ প্রসঙ্গে Sir Jones প্রতিষ্ঠিত Asiatic Society-র (১৭৮৪ খ্রীঃ) প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে লোকঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়-সম্বলিত গবেষণাধর্মী রচনাও সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়, যেমন, Thomas D. Pearse-এর On two Hindu festivals and Indian Sphinx (১৭৯০ খ্রীঃ) ইত্যাদি।

এছাড়া, Asiatic Society-র উদ্যোগে এমন বহু গবেষণাধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়, যা লোকসমাজ ও লোকঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট।[১] বিদ্যা-চর্চার এ ধারায় সেদিন বাঙালী মনীষাও যুক্ত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১ খ্রীঃ) ও শরৎচন্দ্র মিত্রের (?) নাম উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্রলালের On the funeral ceremonies of the ancient Hindus. (১৮৭০ খ্রীঃ) কিংবা শরৎচন্দ্র মিত্রের On some beliefs in a being or animal which is supposed to guard Hidden Treasure (১৮৯৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি রচনাগুলি লোকঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করেই রচিত।

লক্ষণীয়, মার্শম্যান-সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮ খ্রীঃ) পত্রিকায়-ও বাংলার লোকঐতিহ্য-বিষয়ক একাধিক রচনার সাক্ষাৎ মেলে (যেমন, রথ, চড়ক, স্নানযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা)। ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১ খ্রীঃ) ভাবাদর্শে 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৯৩৮ খ্রীঃ) ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬ খ্রীঃ) প্রমুখ পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯ খ্রীঃ) এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার (১৮৪৩ খ্রীঃ) নানা আলোচনাও পরবর্তী কালের লোকঐতিহ্য-চর্চার পূর্ব-পদক্ষেপ বলা যায়। এ প্রসঙ্গে 'হিন্দু মেলা'-র (১৮৬৭-১৮৮০ খ্রীঃ) গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সে যুগে 'হিন্দু মেলা' বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে স্বাদেশিকতা বোধের বিপুল জোয়ার এনেছিল। জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ তথা স্বাদেশিকতা বোধের উন্মেষ ঘটাতে এ মেলায় যাবতীয় স্বদেশী বস্তু প্রদর্শিত হতো। শুধু তাই নয়, এ মেলায় আয়োজিত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও লোক-ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত ছিল। স্বাদেশিকতা-বোধ জাগরণের ক্ষেত্রে 'হিন্দু মেলা'-র গুরুত্ব ঐতিহাসিক।

সুতরাং বিশ শতকের পূর্বেই বাংলার বিদ্বৎসমাজে লোকঐতিহ্যের প্রতি যে অল্প-বিস্তর আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই আগ্রহের মূলে জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ফলত, লোকঐতিহ্য-চর্চার প্রয়াস-প্রকল্পাদি তেমন ব্যাপকতা অর্জন করে নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর (১৮৯৪ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, '....জাতীয় হৃত গৌরব ও লুপ্ত মর্যাদাবোধ, তার সুদীর্ঘকালের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যশালী সাংস্কৃতিক ধারাটিকে পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদও সেদিন অনুভূত হয়েছিল। 'হিন্দু মেলা'র (১৮৬৭ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ প্রচেষ্টার শুভ সূচনা ঘটেছিল। পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উক্ত প্রচেষ্টাই আরো পরিকল্পিত ও সুসংহত রূপে আত্মপ্রকাশিত হতে দেখি'।[২]

উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে, সিপাহী বিদ্রোহের ৩৭ বৎসর পরে জাতির আত্মানুসন্ধিৎসা সুসংহত রূপে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বাংলার বিদ্বৎ সমাজে স্বীকৃতি লাভ করল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে চৈতন্য লাইব্রেরীতে আয়োজিত সভায় বাংলা দেশের 'মেয়েলি ছড়া'[৩] বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করে বাংলার শিক্ষিত মহলকে লোকসংস্কৃতি তথা লোকঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহশীল ও অনুসন্ধিৎসু হবার প্রথম প্রত্যক্ষ আহ্বান জানান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এর স্বল্পকাল পরে কবি 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় (১৩০১ সন, মাঘ সংখ্যা) 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র[৪] ভূমিকাতেও লোকঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশকে জানতে হলে দেশের লোকসাধারণকে জানতে হবে, তাদের জীবন-চর্যার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করতে হবে, কারণ সেই ঐতিহ্যের মধ্যেই লোকসাধারণের সুদীর্ঘকালের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী নিহিত—এ সত্য রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। এ কারণেই 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি' সযত্নে সংগ্রহ করবার আহ্বান জানিয়ে তিনি নিজেও সে কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে'[৫]-ও (১৭ই চৈত্র, ১৩১১ সন) কবি ছাত্রদের লোকঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহশীল হতে আহ্বান জানান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ছাত্রদের যোগসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি উক্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যটিও সে সভায় পরিস্ফুট করেন। দেশহিতৈষার নেশা পরিত্যাগ করে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হবার আহ্বান-ই এ 'সম্ভাষণে'র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যাচর্চার স্বাতন্ত্র্য ও সেখানকার সামগ্রিক কর্মসূচীর সঙ্গে লোকঐতিহ্যের গভীর যোগসূত্র স্থাপনার প্রয়াসও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এছাড়া কবি বাংলাদেশের যেখানেই লোকঐতিহ্য-চর্চার উদ্যোগের কথা জেনেছেন, সেখানেই তাকে স্বাগত জানিয়েছেন, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।[৬]

পাশাপাশি 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি' উদ্ধারকার্যে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০ খ্রীঃ), দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭ খ্রীঃ), অক্ষয় চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭ খ্রীঃ), দীনেন্দ্র কুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩ খ্রীঃ), দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯৩৯ খ্রীঃ), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯ খ্রীঃ), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১ খ্রীঃ) প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ লোকঐতিহ্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। রজনীকান্তের সংকলিত 'সাঁওতাল পরগণার ছড়া', দক্ষিণারঞ্জনের লোক কথা সংকলন,[৭] দীনেন্দ্রকুমারের 'বিজয়াদশমী', 'ঝুলন যাত্রা' ইত্যাদি প্রবন্ধ ও 'পল্লীকথা', 'পল্লীচিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ, দীনেশচন্দ্রের লোকগীতিকা সংগ্রহ,[৮] অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত', 'ভূতপতরীর দেশ' প্রভৃতি যার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

সুতরাং দেখা গেল, লোকঐতিহ্যের প্রতি উনিশ শতকের বাংলার বিদ্বৎ সমাজের আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসা ও তার সনিষ্ঠ চর্চার ধারা বিশ শতকেও অব্যাহত থেকে পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

এ প্রসঙ্গে আরও অনেকের ভূমিকাই স্মরণযোগ্য। যেমন, লোকমাতা নিবেদিতার (১৮৬৭-১৯১১ খ্রীঃ) লোকঐতিহ্য-প্রীতি ও লোকঐতিহ্য-চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সম্ভবত, পাশ্চাত্য লোকঐতিহ্য-চর্চার সঙ্গে স্বদেশেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল। যে মহৎ আদর্শ নিয়ে মার্গারেট নোবল তাঁর ভারত-জীবন শুরু করেন, তারই অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তাঁর মানসে লোকসাধারণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিকই ছিল। এই লোকঐতিহ্য-প্রীতির স্বাক্ষর তাঁর একাধিক রচনায় মেলে। তাঁর "Cradle tales of Hindusthan' (১৯০৭ খ্রীঃ) শিশু ভোলানো লোককথার সংকলন; এছাড়া আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর (১৮৭৭-১৯৪৭ খ্রীঃ) সহযোগিতায় তিনি 'Myth of the Hindus and Buddhists' (১৯১৩ খ্রীঃ) গ্রন্থটিও রচনা করেন।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সর্বপ্রথম একটি পূর্ণায়ত রূপ পরিগ্রহ করে। সেদিক থেকে

১৯০৫-এর 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'-ও অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী ঘটনা। এর ফলে দেশের কোনো বৃহত্তর আন্দোলনে লোকসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ যে ভূমিকা যেমন ভাবে অনুভূত হল, তেমনটি আগে কখনো হয় নি। এ উপলব্ধি থেকেও শিক্ষিত মানসে লোকজীবন-চর্যার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল। এ ব্যাপারে 'ভারতী' (১৮৭৬ খ্রীঃ), 'প্রবাসী' (১৯০১ খ্রীঃ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' (১৩০১ সাল) 'সন্দেশ' (১৯১৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও স্মরণীয়।

অর্থাৎ দেশ, জাতি এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে বাংলার নাগরিক সমাজের ধারণা যে পরিমাণে স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হচ্ছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই বাংলার লোকঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসা-ও বৃদ্ধি লাভ করছিল। স্বভাবতই, সাহিত্য-জগতেও এর প্রভাব পড়ে। বিশ শতকের প্রথম অর্ধের কাব্য-কবিতায় তাই লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলন কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এছাড়াও আলোচ্য কাল-পর্বের কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যানুসৃতির একাধিক কারণ বিদ্যমান। যেমন, জন্ম-বসবাস-কর্ম-সূত্রে গ্রামবাংলার প্রতি প্রীতি ও সেই সূত্রে লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব একাধিক কবির কবিতায় লভ্য। আবার রাজনৈতিক মতাদর্শ, শিল্পাদর্শ-ও অনেক ক্ষেত্রে কবিদের লোকঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে যুক্ত করেছে। কবিতায় রূপচর্চা ও বিচিত্র ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভাব-বিস্তারী।

প্রভাব সূত্র অন্বেষণ :

আলোচ্য কাল-পর্বের (১৯০১–১৯৫০ খ্রীঃ) কাব্য-কবিতায় লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলনের কারণগুলি এভাবে সূত্রাকারে বিন্যাস করা যায়,—(১) জন্ম-কর্ম-বসবাসাদি সূত্রে লোকঐতিহ্য প্রীতি, (২) নব-জাগ্রত স্বদেশ চেতনার প্রেরণা, (৩) বাস্তব জীবনানুগত্য, (৪) রোমান্টিক আবহ-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, (৫) লোকঐতিহ্যাশ্রিত পাশ্চাত্য কাব্য-কবিতার আদর্শ, (৬) বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আকর্ষণ, (৭) কাব্য-কলার অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস।

১। যে কোনো শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিতে স্রষ্টার ব্যক্তি-জীবনের প্রভাব অনস্বীকার্য। জীবন-বৃত্তের এক একটি স্তরের (যেমন, শৈশব, বাল্য, কৈশোর ইত্যাদি) স্মৃতি বা প্রতিবেশও কবিমানসকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

জীবনে চলার পথে কবির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি ক্রমে সুসমৃদ্ধ হতে থাকে, একই সঙ্গে আত্ম-স্বাতন্ত্র্যও কালক্রমে প্রতিষ্ঠা পায়। একদিকে অভিজ্ঞতা যেমন কবির এ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়, তেমনি অপর দিকে দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা অভিজ্ঞতার মাত্রান্তর ঘটিয়ে তাকে স্বকীয় করে তোলে। তাই কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলনের অন্যতম প্রধান সূত্র,—কবিদের ব্যক্তি জীবনের প্রতিবেশ, জীবিকা, পঠন-পাঠন ইত্যাদি।

২। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমপ্রসারে বাংলার বিদ্বৎসমাজ ব্যাপক আন্দোলিত হয়, মূল্যবোধে দেখা দেয় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জীবনের সব কিছুকে যাচাই করে নেবার সূত্রে, প্রাচীন ঐতিহ্যের পুন-মূল্যায়নের আন্তরিক প্রয়াস এ যুগের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

একথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতা সম্পর্কে দেশবাসীর ধারণা কালক্রমে এ সময় স্বচ্ছ হতে থাকে। স্বাধীনতার চেতনাও সে যুগের ঐতিহ্য-প্রীতির অন্যতম কারণ। এরই ফল-স্বরূপ, দেশ, দেশের সাধারন মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ দেখা গেল : 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি' সংগ্রহ ও রক্ষার গুরুত্ব অনুভূত হল। কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রেও এই লোকঐতিহ্য-সচেতনতা সক্রিয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতায় সমকালীন ভারতবর্ষের প্রায় অবি-সংবাদিত নেতা গান্ধীজীর প্রভাব সূত্রে-ও লোকঐতিহ্যের নানা উপাদান-উপকরণ গৃহীত। এর কারণ, গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়নের আদর্শ ও জাত-পাত বিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে লোকসাধারণ ও তাদের জীবন-চর্যার অবিচ্ছেদ্য যোগ।

এছাড়া স্বতন্ত্র ও সচেতন লোকঐতিহ্য-চর্চাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

৩। কবিরা সামাজিক জীব। যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় তাঁদের অবস্থান ও দৈনন্দিন জীবনযাপন, তার সঙ্গে লোকসমাজের অপরিহার্য যোগসূত্র লক্ষণীয়। তাই তাঁদের কাব্য-চর্চায় বাস্তব জীবনানুগত্যের সূত্রে লোকঐতিহ্যও প্রভাববিস্তারী। আলোচ্য কবিদের কাব্য-চর্চাতেও এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪। (ক) অন্তরের বিস্ময় ও সৌন্দর্য বোধের শতধারায় স্ফূর্তিতেই রোমান্টিকের মুক্তি। রোমান্টিকতার প্রধান অবলম্বন মূলত, প্রেম ও প্রকৃতি। রোমান্টিক প্রেমের আবহ-নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রকৃতির প্রতি অপার বিস্ময় ও সৌন্দর্যমুগ্ধ চেতনার প্রকাশসূত্রে লোকঐতিহ্যের

নানা বিচিত্র উপাদান আলোচ্য সময়ের কাব্য-কবিতায় ব্যবহৃত। এছাড়া রোমান্টিক কবিমানসের ঐতিহ্য-প্রীতিও অনেক সময় অতীত-চারণার পথ ধরে লোকঐতিহ্যের দ্বারস্থ।

(খ) রোমান্টিকেরা স্বপ্নপ্রিয়। সমাজকে নিয়েও তাঁরা স্বপ্ন দেখেন। অনিবার্যভাবেই তাঁদের স্বপ্নের সমাজের সঙ্গে ধূলিধূসরিত বাস্তবের সংঘাত ঘটে। রোমান্টিকতা অনেক সময়েই তাই সমাজ-বিপ্লবের প্রেরণা-সঞ্চারী। সমাজ-বিপ্লবীরাও এক অর্থে রোমান্টিক, কারণ আদর্শ সমাজের বাস্তবায়নই তাঁদের অভীষ্ট।

বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ লেখনী অস্ত্রে পরিণত হয়। কবিরা সামাজিক অসাম্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। স্বভাবতই শ্রমজীবী শোষিত বঞ্চিত শত সহস্র সাধারণ মানুষের পক্ষ নেন তাঁরা। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হন। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষজনের মতো, তাদের ঐতিহ্য-ও ঐ সমস্ত কবির কবিতায় প্রাধান্য পায়।

৫। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে পাশ্চাত্যে ভাববাদী রোমান্টিক কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে যে কাব্যান্দোলন গড়ে উঠেছিল, বিশ শতকের তৃতীয় দশকের বাংলা কাব্য-কবিতায় তার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব দেখা গেল। সেই সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৯ খ্রীঃ), অর্থনৈতিক মন্দা, মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কারও এ কাব্যান্দোলনে ব্যাপক প্রভাব-বিস্তারী হয়ে উঠলো। বলা বাহুল্য, এ কাব্যধারার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল,—প্রেম, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে অনাস্থা। এছাড়া বক্তব্য পরিস্ফুটনে অনেক সময়েই এ কাব্যধারায় কবিরা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। আবার কাব্যকলাগত অভিনবত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও লোকঐতিহ্যানুসৃতি এ যুগের কাব্য-চর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। T. S. Eliot, W.B . Yeats, F. G Lorca, P. Eluad —প্রমুখ পাশ্চাত্য-কবিগণ এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে আবির্ভূত বাঙালী কবিরা এঁদের কাব্যাদর্শে অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়ে তাঁদের কবিতায় লোকজীবনচর্যার নানাবিধ উপাদান-উপকরণ গ্রহণ করেছেন। স্বদেশ ও বিশ্বের বহু বিচিত্র পুরাকথা, রূপকথা ইত্যাদি যেমন এঁদের কবিতায় সাঙ্গীকৃত হল, তেমনি লোকসাহিত্য তো বটেই, বস্তু-কেন্দ্রিক, বিশ্বাস-অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক, অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিক, ক্রীড়া-কেন্দ্রিক, শিল্পবস্তু ও অংকন-কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের নানা উপাদানেও এঁদের কবিতা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো।

৬। বিশ শতকের বিশ্বসাহিত্যে মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব অনস্বীকার্য। শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা এ দর্শনের মূলকথা। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে সর্ববিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব-পীড়ন থেকে মুক্ত করাই এ দর্শনের লক্ষ্য। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্ব-ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে কার্লমাকস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রীঃ) নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখালেন, তার তরঙ্গাভিঘাত ভারতেও এসে পৌঁছল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক নানা ভ্রষ্টাচার, অহিংস-বাদী (গান্ধী পরিচালিত) আন্দোলন ও সমকালীন বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতেও মার্কসবাদ, বিশেষত, সাম্যবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটল (১৯১৯ খ্রীঃ থেকে মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ভারতে সাম্যবাদ বিস্তারের প্রয়াস স্মরণযোগ্য)।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা কাব্য-কবিতায়-ও মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটলো। আলোচ্য কালপর্বের কবিদের মধ্যে কেউ কেউ মার্কসবাদে গভীর আস্থাশীল (যেমন, বিষ্ণু দে), কেউ কেউ বা মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত (যেমন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ)।

স্বভাবতই মার্কসীয় দর্শনের প্রতি এই গভীর প্রত্যয় এঁদের কাব্য-কবিতায় শ্রমক্লিষ্ট লোকসাধারণ ও তাদের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে, যা লোকঐতিহ্য-নিরপেক্ষ নয়।

এবার আলোচ্য কবিদের কাব্য-কবিতায় পূর্বোদ্ধৃত সূত্রগুলির গুরুত্ব ও প্রভাব নির্দেশ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

১। শহর কলকাতার বুকে, উনিশ শতকের বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। নগর জীবনের প্রাণ-কেন্দ্রে অবস্থান করেও ঠাকুরবাড়ি কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। এমনকি ঠাকুর বাড়ির ভিতরকার পুকুর-গাছগাছালিভরা গ্রামীণ পরি-বেশটিতে সেই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়।[৭] কবির পরবর্তী জীবনেও এই পরিবেশটির প্রভাব লক্ষণীয়। শৈশবে সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে দিন-যাপনের মধ্যেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে পল্লীপ্রীতির অংকুরোদগম হয়।

অন্দরমহলে মায়ের মুখে শৈশবে শোনা ছড়া তাঁর অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'শিশু' (১৯০৩ খ্রীঃ)-র একাধিক কবিতায় তার প্রমাণ মেলে। চল্লিশোত্তীর্ণ কবি শৈশবের সেই স্মৃতি রোমন্থন করেছেন, '—মনে পড়ে মায়ের মুখে / শুনেছিলেম গান—/ বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর / নদের এল বান। (বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর : শিশু)।

ছোটোবেলায় কবির দিনের অধিকাংশ সময় কাটত দাসদাসীদের তত্ত্বাবধানে। তাদের কাছে শোনা ছড়া, রূপকথা ইত্যাদির মাধ্যমে কবি লোকসাহিত্যের প্রতি প্রথম আকর্ষণ বোধ করেন। এছাড়া যাত্রা, গান, বাউল, কীর্তন গান ঠাকুরবাড়িতে মাঝে মাঝেই অনুষ্ঠিত হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শৈশব থেকেই তিনি কোনো বিষয়েই সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করেন নি। তাঁর জন্য বিষ্ণু চক্রবর্তী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীত শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, তা সত্যিই অভিনব। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা স্মরণ করেছেন।

অতি অল্প বয়সেই ছকে বাঁধা পড়াশোনা থেকে মুক্তি পেতে তিনি 'কৃত্তিবাসী—রামায়ণ', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'বিবিধার্থ সংগ্রহা'দি পড়েছিলেন। পাশাপাশি পুত্রের পঠন-পাঠনে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্য দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে "Peter Parley's Tale" পর্যায়ের একাধিক গ্রন্থ পড়িয়েছিলেন।[১০] এসব গ্রন্থে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পুরাণ, লোককথা জাতীয় বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাল্যকাল থেকেই এ ধরণের বিচিত্র পঠন-পাঠন কবির পরবর্তী জীবনেও দৃষ্ট হয়। বাল্য-কৈশোরের পঠন-পাঠনের এই বৈশিষ্ট্যও পরবর্তীকালে কবির লোকঐতিহ্য-প্রীতির অন্যতম কারণ। শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিচারণ-মূলক কবিতায় স্বভাবতই তাই লোকঐতিহ্যের নানা উপাদান গৃহীত।

ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে নানা উৎসব-পার্বণ বরাবরই পালিত হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য,—'দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত ঠাকুরবাড়ির গোটা পরিবেশের মধ্যেই ছিল আধুনিকতা তথা ব্রাহ্মবৈদগ্ধ্য এবং ঐতিহ্য-প্রীতির এক আশ্চর্য সম্মিলন। ··পরিবেশের এই উদার আনুকূল্যই তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) পরবর্তী জীবনে বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সহায়তা করেছিল।'[১১] যার প্রতিফলন তাঁর কবিতাতে লভ্য। দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি ঠাকুর-পরিবারের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও

অনুরাগ রবীন্দ্রনাথেও বর্তেছিল। 'স্বদেশী আন্দোলনের যুগ' বলতে যে সময়কে সাধারণ ভাবে বোঝায়, তার আগেই মূলত, ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে স্বাদেশিকতার প্রসার ঘটানোর প্রয়াস চোখে পড়ে। হিন্দু মেলার প্রবর্তন যার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। এ মেলায় বাংলার লোকঐতিহ্য-সম্ভূত নানাবিধ বস্তু ও অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। মাত্র তেরো বছর বয়সে হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে (১৮৭৫) কবি স্বরচিত 'হিন্দু মেলার উপহার' কবিতাটি আবৃত্তি করে মেলায় উপস্থিত জনসাধারণকে শুনিয়েছিলেন। প্রতি বৎসরই কবি মেলায় উপস্থিত থাকতেন এবং নানা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণও করতেন। সুতরাং হিন্দু মেলার ভাবাদর্শ যে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা অনস্বীকার্য। একই সঙ্গে এ অনুমানও অযৌক্তিক নয় যে, ঐ মেলায় আয়োজিত নানা অনুষ্ঠান ও প্রদর্শিত নানাবিধ দ্রব্যাদির মধ্য দিয়ে লোকঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ কবিমানসে সঞ্চারিত হয়েছিল।

প্রায় তিরিশ বছর বয়সে উত্তরবঙ্গে জমিদারী তদারকী করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-বাংলার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এই কর্মসূত্রে তিনি শিলাইদহ-সাজাদপুর-পাতিসর অঞ্চলে প্রায় দীর্ঘ দশ বছর (১৮৯১-১৯০১) কাটিয়েছিলেন। গ্রাম বাংলার সঙ্গে এখানে কবির প্রাণের প্রথম পরিচয় হল। এই পল্লীবাস তাঁর লোকঐতিহ্য-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটিকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। উল্লেখযোগ্য, ভারতীতে প্রকাশিত 'বাউলের গান' (১২৯০) প্রবন্ধটি ছাড়া লোকঐতিহ্য-বিষয়ক সমস্ত প্রবন্ধগুলিই এখানে আসার পরে লেখা [যেমন, 'মেয়েলি ছড়া' (১৩০১ সন), 'ছেলে ভুলানো ছড়া' (১৩০১–২ সন), 'গ্রাম্য সাহিত্য' (১৩০৫ সন ইত্যাদি)]।

শুধু তাই নয়, শিলাইদহ বসবাস কালেই তিনি লোকঐতিহ্যের সংগ্রহ-সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শুধু লোকসাহিত্যের প্রতিই নয়, এখানে থাকাকালীন লোকঐতিহ্যের অন্যান্য শাখার প্রতিও তাঁর আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। এছাড়া শান্তিনিকেতনে বাস ও সেখানে আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৯০২) সূত্রেও কবি সে অঞ্চলের লোকসমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সে অভিজ্ঞতাও কবিজীবনে কম মূল্যবান নয়।

২। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার অভিঘাতে বাংলার শিক্ষিত সমাজে যে নবজাগ্রত চেতনার উন্মেষ হয়েছিল, রবীন্দ্র-মননে তার প্রভাবও অনস্বীকার্য। সেই নবোদ্ভূত চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি স্বদেশের পরাধীনতার যন্ত্রণা উপলব্ধি করলেন। অত্যন্ত সঠিক

ভাবেই তাঁর মনে হল, যে কোনো দেশের লোকঐতিহ্য সে দেশের জাতীয় চরিত্র ও জনসাধারণের সুদীর্ঘকালের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী বিধৃত। তাই লোকঐতিহ্যের সংগ্রহ-সংরক্ষণ শুধু মাত্র ব্যক্তিগত সখ-শৌখিনতাই নয়, তা 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি' সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সমগুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, যে কোনো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বৃহত্তর জনসাধারণের অংশ গ্রহণের গুরুত্ব ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রতিপন্ন হয়েছিল। সেই সূত্রেও আলোচ্য কালপর্বে তাঁর রচিত কাব্য-কবিতায় লোকসাধারণ ও তাদের জীবন-চর্যার প্রভাব-প্রতিফলন উপেক্ষনীয় নয়। স্বদেশী যুগে লেখা 'আমার সোনার বাংলা', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' প্রভৃতি বহু গান এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

৩। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা লোকঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকঐতিহ্য-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাই শুধু নয়, লোকসাহিত্য ও লোক-শিল্পবস্তু সংগ্রহেও তিনি নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর সংগৃহীত ছড়া,[১২] গীতি,[১৩] শ্রীনিকেতন ও কলাভবনে সংরক্ষিত নানা শিল্পবস্তু এর নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ্য। তাঁর আগ্রহ ও অনুপ্রেরণাতেই 'প্রবাসী'তে লোকসংগীত প্রকাশের জন্য 'হারামণি' বিভাগ খোলা হয়েছিল। এছাড়া দেশের যেখানেই লোকঐতিহ্য-চর্চার প্রয়াস লক্ষ করেছেন, সেখানেই তিনি সে প্রয়াসকে সাধ্যমতো অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বিশেষজ্ঞের মতে, 'গভীর অন্তর্দৃষ্টি বলে তাঁর লোকসাহিত্য-চর্চা শুধু আমাদের নয়, পাশ্চাত্য দেশেরও আধুনিকতম লোকসাহিত্য বিচারের ভিত্তি হতে পারে।'[১৪] শুধুমাত্র লোকসাহিত্য-চর্চা ও সংগ্রহই নয়, এই প্রয়াস সার্থক রূপ পরিগ্রহ করলো শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় (১৯০১)। পরবর্তী কালে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের শিক্ষাকর্মসূচীর পরিকল্পনা ও প্রয়োগসূত্রেও কবি লোকঐতিহ্য-প্রীতির পরিচয় দেন। লোকঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট বিস্তৃত পঠন রবীন্দ্র-কাব্যে লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলনের অন্যতম সূত্র রূপে বিবেচ্য। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে (সাধনা : ১৩০১, বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রথম জীবনের পঠন-পাঠনের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। পরবর্তী জীবনে তাঁর পঠিত গ্রন্থগুলির বিষয়-বৈচিত্র্যের যে পরিচয় মেলে,[১৫] তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, লোকঐতিহ্য সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট বিজ্ঞান-সম্মত ধারণা রবীন্দ্র-মননে বিদ্যমান ছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদত্ত রবীন্দ্র-পঠিত লোকঐতিহ্য-সম্পর্কিত-গ্রন্থের তালিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান।[১৬]

৪। রবীন্দ্র-কাব্যধারা বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, তিনি শুধুই ভাব-লোকের কবি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে 'চিত্রা' (১৮৯৩) কাব্যের সূচনায় কবির মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য, 'লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি, এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন, আমার প্রতি অবিচার করেছেন।'

তাঁর আলোচ্য কাল-পর্বের কাব্য-কবিতা সম্বন্ধেও এ সত্য প্রযোজ্য। এ পর্বের কাব্য-কবিতার নানাস্থানে বাস্তব সচেতনতা-সূত্রে লোকজীবন-চর্যার দৈনন্দিন চিত্র প্রতিফলিত। 'পলাতকা'র (১৯১৮) 'নিষ্কৃতি', 'পুনশ্চ'র (১৯৩২) 'কোপাই', 'বীথিকা'র (১৯৩৫) 'সাঁওতাল মেয়ে' প্রভৃতি বহু কবিতা বাস্তব-সচেতনতা-সূত্রে লোকঐতিহ্যের নানা উপাদান-উপকরণে সমৃদ্ধ।

৫। রোমান্টিক চেতনার প্রধান উৎস,—প্রেম ও প্রকৃতি। রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যে প্রেম ও প্রকৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য কবির প্রেম ও প্রকৃতি চেতনা রোমান্টিক জগতকে অতিক্রম করে বিশ্বজাগতিক ও বিশ্বমানবিক চেতনার অতীন্দ্রিয় ও চিরায়ত স্তরে উন্নীত। রোমান্টিক আবহনির্মাণ ও অতীন্দ্রিয় চেতনার-উদ্বোধনে অনেক ক্ষেত্রেই কবি লোকঐতিহ্যাশ্রয়ী, 'শ্যামলী'র (১৯৩৬) 'অমৃত', 'খেয়া'র (১৯০৬) 'বাঁশি', 'সমুদ্রে', 'মহুয়া'র (১৯২৯) 'বোধন', প্রভৃতি কবিতায় কবির লোকঐতিহ্যানুসৃতি যার নিদর্শন।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭–১৯৫৫)

১। জন্মসূত্রে করুণানিধান গ্রামেরই সন্তান। নদীয়ার শান্তিপুরে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। বেশ কিছুকাল কলকাতায় বসবাস করলেও নানাসূত্রে গ্রাম্য-জীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। বাল্যে অন্ততঃ কিছুকাল তিনি শান্তিপুর স্কুলেই লেখাপড়া করেন। এছাড়া কৈশোরে পিতার কর্মসূত্রে করুণানিধান দুমকা, গোবিন্দপুর ও পাকুড়কোটে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। এইসব স্থানের স্মৃতি তাঁর কবি মানসে চির-জাগরুক

ছিল। গ্রাম্যজীবনের সেই অতীত স্মৃতি কখনো কখনো তাঁর কবিতায় লোকঐতিহ্যাশ্রয়ে প্রকাশিত। 'বঙ্গমঙ্গল' (১৯০১) কাব্যের একাধিক কবিতায় এর সাক্ষ্য মেলে।

কর্মজীবনের প্রথম পর্বেও করুণানিধান, প্রধানত পল্লী-পরিবেশেই কাটিয়েছেন। প্রথমে পাবনার সুজানগর গ্রামের স্কুলে, পরে শান্তিপুর ও হুগলীর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পদ্মাতীরবর্তী সুজানগরের প্রকৃতিও কবিকে মুগ্ধ করেছিল। সুজানগরে বসবাসের ফলেও তিনি লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্র-শিষ্য হয়েও পদ্মাতীরবর্তী গ্রামজীবন তাঁকে কবিগুরুর মত লোকসমাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে নি।

সুখী দাম্পত্য জীবনের অধিকারী ছিলেন কবি। তাঁর কবিতার অন্যতম রস দাম্পত্য প্রেমরস। লোকঐতিহ্যের নানা উপাদান-উপকরণ সহায়তায় দাম্পত্য জীবনের চিত্রকে তিনি উপভোগ্য করে তুলেছেন।[১৭] 'প্রসাদী' (১৯০৪) 'ঝরাফুল' (১৯১১) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রযোজ্য।

২। করুণানিধানের কবিতায় স্বদেশ ও স্বকাল চেতনা তেমন উল্লেখ-যোগ্য নয়। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাতে সাময়িক ভাবে তিনিও আন্দোলিত। এই স্বদেশ-প্রীতির সূত্রে 'বঙ্গমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থের ২য় সংস্করণে (১৯০৫) গ্রথিত একাধিক কবিতায় লোকঐতিহ্যের নানা উপাদান-উপকরণ লভ্য। এর নিদর্শন-স্বরূপ, 'কোলাকুলি', 'আশীর্বাণী' (বঙ্গমঙ্গল, ২য় সং) প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়।

৩। করুণানিধানের কাব্যলোক রোমান্টিক প্রেম ও প্রকৃতি চেতনায় পুষ্ট। তাঁর এই রোমান্টিক প্রেম ও প্রকৃতি চেতনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পল্লী-বাংলার পটভূমির আশ্রয়ে স্ফূর্তি লাভ করেছে। আর এই সূত্রে বাংলার লোকঐতিহ্যের নানাবিধ উপাদানে তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'ভাব বধূ' (প্রসাদী), 'বাসনা' (ঝরাফুল) 'মৃণু' (ঐ) প্রভৃতি বহু কবিতায় এ মন্তব্যের সমর্থন মেলে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৭–১৯৪৮)

১। নদীয়ার যমশেরপুর গ্রামের বিখ্যাত বাগচী পরিবারে যতীন্দ্র-মোহন বাগচীর জন্ম। সেখানেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। বহরমপুর মিশনারী স্কুলেও কিছুকাল পড়েছিলেন তিনি। সম্ভবত,

তেরো-চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন গ্রামেই ছিলেন।[১৮] গ্রাম বাংলায় অতিবাহিত শৈশব-বাল্যের দিনগুলি কবি কোনোদিনই বিস্মৃত হতে পারেন নি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেও বছরের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ও ছুটির সময় তিনি স্ব-গ্রামে যেতেন। আজীবন গ্রামের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁর কবি মানসকে নানা স্থানে লোকঐতিহ্যানুস্মৃতিতে অনুপ্রাণিত করেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'ধান কাটার গান' (লেখা ১৯০৬), 'রথ' (ঐ), 'আটাশ বাড়ি' (পাঞ্চজন্য ১৯৪১), 'রথের দিন' (ঐ) প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ্য।

২। সমকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন যতীন্দ্র মোহনকে আলোড়িত করেছিল। 'নাগকেশর' (১৯১৭) কাব্যগ্রন্থের 'মাতৃমূর্তি' কবিতাটি যার অভ্রান্ত নিদর্শন। এছাড়া মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নির্ভরতাও একাধিক কবিতায় প্রদর্শিত [যেমন, 'জাগরণী'র (১৯২২) 'গান্ধী মহারাজ', 'চরকা সঙ্গীত' ইত্যাদি কবিতা]। এই সূত্রে এ সমস্ত কবিতা লোকঐতিহ্যের নানা উপাদানে পূর্ণ।

৩। যতীন্দ্রমোহনের বেশ কয়েকটি কবিতার পটভূমি লোকসমাজ। লোকজীবনের আধারে বাস্তবজীবন-আশ্রয়ী এসব কাহিনীমূলক কবিতায় বাস্তবতা পরিস্ফুটনে কবি লোকঐতিহ্যের উপাদান-উপকরণকে প্রয়োজন-মতো ব্যবহার করেছেন। 'অভদ্রকাব্য' (নীহারিকা ১৯২৭) 'গৌরী' (বন্ধুর দান ১৯১৮) 'প্রতিশোধ' (মহাভারত ১৯৩৬) প্রভৃতি বহু কবিতায় এ মন্তব্য সমর্থিত হয়।

৪। কবি-ধর্ম-বিচারে যতীন্দ্রমোহন নিঃসন্দেহে রোমান্টিক কবি। তাঁর প্রেম ও প্রকৃতি-চেতনা পল্লী বাংলার পটভূমিকায় অপূর্ব কাব্য-সুষমা লাভ করেছে। রোমান্টিকতার প্রকাশ-সূত্রে এই পল্লী-চিত্রণ স্বাভাবিক ভাবেই লোকসমাজ ও তার দৈনন্দিন জীবনযাপন-নিরপেক্ষ থাকে নি। 'জেলের মেয়ে' (রেখা); 'জটাই' (অপরাজিতা ১৯১৩), 'জেলের ছেলে' (নাগকেশর) ইত্যাদি বেশ কয়েকটি কবিতায় লৌকিক জীবন অবলম্বনে কবি রোমান্টিক প্রেমের অপূর্ব স্ফূর্তি ঘটিয়েছেন। এসব কবিতায় কবির প্রকৃতি চেতনাও লোকঐতিহ্যাশ্রয়ী।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

১। কলকাতার অদূরবর্তী নিমতা গ্রামে সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম। জীবনের প্রায় শুরুতেই তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু

গ্রামের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘদিন বজায় ছিল। এছাড়া, অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রেই পিতামহ মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তর প্রগতিশীল মনোভাব, বিজ্ঞানমনস্কতা ও শোষিত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি সত্যেন্দ্র-মানসেও লক্ষণীয়। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যানুস্মৃতির অন্যতম উৎস রূপে পিতামহের এ প্রভাব উল্লেখ্য।

সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন মেলায় যাবার সখ ছিল। বিভিন্ন মেলা সম্বন্ধে তিনি অনেক খোজ-খবরও রাখতেন।[১৯] বাংলার লোকসাধারণ আয়োজিত এসব মেলার প্রতি কবির আগ্রহ, লোকজীবন-চর্যার প্রতি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মানসিকতারই পরিচায়ক।

২। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতায় স্বদেশ-প্রীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে তাঁর কবিমানস বাংলা দেশের প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে। সমালোচকের ভাষায়, 'বঙ্গদেশকে দুচোখ ভরে দেখার আকাঙ্ক্ষা এসেছে বঙ্গভঙ্গ-জনিত আন্দোলন (১৯০৫) থেকে।'[২০] সমকালের প্রভাবে কবির এই স্বদেশ-প্রীতি ইতিহাস ও ঐতিহ্যসম্পৃক্ত, যা বাংলার লোকঐতিহ্য-নিরপেক্ষ নয়।

এ প্রসঙ্গে, সত্যেন্দ্রনাথের মনোলোকে গান্ধীজীর ভাবাদর্শের প্রভাব স্মরণযোগ্য। গান্ধীজীর ধর্ম ও কর্মের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত লোকসাধারণ সত্যেন্দ্র-কবিতার নানা স্থানে তাদের জীবন-চর্যার উপাদান-উপকরণসহ উপস্থিত।

৩। নির্বিরোধী কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতায় লঘু কল্পনা, শিশু সুলভ ভাবচাপল্য লক্ষণীয়। বিশ্বজগতকে তিনি শিশুর দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার বিপুল বৈচিত্র্যে হয়েছেন মুগ্ধ। আর বাংলার গ্রামজীবন ও তার প্রকৃতি জগতের প্রেক্ষাপটে সে মুগ্ধতা সুপরিস্ফুট। স্বভাবতই, এসব চিত্রে লোকজীবনের নানা প্রসঙ্গ চোখে পড়ে। (দ্রষ্টব্য, 'পালকীর গান', 'দূরের পাল্লা' প্রভৃতি কবিতা)।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩–১৯৭০)

১। কুমুদরঞ্জন খাঁটি পল্লী-বাংলার সন্তান। বর্ধমান জেলার কোগ্রামে তাঁর জন্ম। বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও কবি স্থায়ীভাবে কখনও জন্মগ্রাম ত্যাগ করেননি। 'জন্মভূমির প্রতি তাঁর প্রেম অত্যন্ত গভীর, বারবার অজয় তাঁর ভদ্রাসনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও তবু সেই অজয় নদীর তীর তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না।'[২১]

জন্মভূমির প্রতি এই গভীর প্রীতি তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুরণিত। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, মানুষ ও তার সংস্কৃতি কুমুদ-কবিতার মূল বিষয়। বলা বাহুল্য, স্বভাবতই তা লোকঐতিহ্যের প্রভাবপুষ্ট। শৈশব থেকেই গ্রাম-বাংলার বাউল-বৈরাগীদের গান ও তাদের সহজিয়াভাবের সঙ্গে কবির যে পরিচয় হয়েছিল, তা তাঁর সমগ্র কাব্য-কবিতায় ব্যাপক প্রভাব-বিস্তারী।

কুমুদরঞ্জনের কর্মজীবনও গ্রামেই অতিবাহিত। মাথরুন গ্রামের হাই স্কুলে প্রথমে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে, পরে ঐ স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের পদে তিনি প্রায় একত্রিশ বছর চাকরি করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে কবি অজয়ের তীরে কাব্য ও অধ্যাত্ম সাধনায় বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। কর্মসূত্রে এই গ্রাম-বাসের ফলে তিনি যে গ্রামীণ-সংস্কৃতি তথা লোকঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর একাধিক কবিতায় বিধৃত।

কুমুদরঞ্জনের এই গভীর পল্লী-প্রীতি তাঁকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী ও নিষ্ঠাবান করে তুলেছিল। এই আগ্রহ ও নিষ্ঠার ফলে তাঁর কাব্য-কবিতায় লোকজীবন-চর্যার নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। কবির 'বনতুলসী' (১৯১১), 'উজানি' (ঐ), 'একতারা' (১৯১৪), 'বনমল্লিকা' (১৯১৯), 'অজয়' (১৯২৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় তার প্রমাণ লভ্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নামকরণও লক্ষণীয়।

২। প্রেরণায় বিশ্বাসী কুমুদরঞ্জন তাঁর কাব্য জীবনের প্রথম পর্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থের রোমান্টিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন।[২২] অজয়ের প্রতি জন্মান্তরের সৌহার্দ্য ও এই রোমান্টিক ভাবাদর্শ কবির প্রকৃতি চেতনাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর এই অসামান্য প্রকৃতি-প্রীতির মূলে ঐতিহ্য-প্রীতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যা রোমান্টিকতার অন্যতম প্রাণ ধর্ম। আর এ ঐতিহ্যপ্রীতির পথ ধরেই লোকসাধারণের জীবনচর্যার ঐতিহ্যের প্রতি পল্লীর কবি আকৃষ্ট হয়েছেন। 'কুনুর' (উজানি), 'একটি গ্রাম', 'বন্যা' (স্বর্ণসন্ধ্যা), 'গ্রামে' (বনমল্লিকা) প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এ মন্তব্যের সমর্থন মেলে। অজয় নদীকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতাগুলিও এখানে স্মরণযোগ্য।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮–১৯৫২)

নদীয়ার কাঁচড়াপাড়ায় মাতুলালয়ে মোহিতলাল মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাসও গ্রামে, হুগলী জেলার বলাগড়ে। প্রথম

জীবনে মোহিতলাল হালিশহর ও বলাগড়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। সুতরাং বাল্যজীবনেই তিনি গ্রামীণ জীবনযাত্রা তথা লোকঐতিহ্যের অল্প-বিস্তর সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যালয় জীবনে অন্ততঃ দুটি সহজাত দক্ষতার সূত্রে পরবর্তীকালে লোকঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুসন্ধিৎসু হবার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। এ সময় চিত্রাঙ্কণ ও মাটির পুতুল তৈরীতে তাঁর নৈপুণ্য দেখা গিয়েছিল।[২৩] যদিও পরবর্তীকালে এই সহজাত দক্ষতা তাঁকে লোকঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহশীল করে তুলতে পারে নি।

অনুরূপ সম্ভাবনা তাঁর কর্মজীবনেও উপস্থিত হয়েছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী জরিপ বিভাগের 'কানুনগো'-র চাকরি নিয়ে তাঁকে উত্তরবঙ্গে যেতে হয়। সেখানে তিনি তিন বৎসর কাটিয়ে গ্রামবাংলা সম্বন্ধে অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য, 'এক কথায় বিধিবদ্ধ সমাজ জীবনের বাহিরে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যেভাবে ঘটিয়াছিল পরিচয় এবং প্রকৃতির যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল—তেমন শিক্ষা আমার আর কিছুতেই হয় নাই[২৪] প্রায় তিন বৎসরের জন্য উত্তরবঙ্গ-বাস সূত্রে পল্লী-জীবন দেহবাদী কবির অন্তরে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার স্বীকৃতি এই মন্তব্যে মেলে। লোকঐতিহ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি না থাকলেও পরিবেশগত এই প্রভাব সূত্রে লোকসমাজ ও তার জীবন-সংশ্লিষ্ট বহু উপাদান-উপকরণ মোহিতলালের কবিতাতে অনিবার্যভাবে উপস্থিত। 'স্বপনপসারী' (১৯২১), 'বিস্মরণী'-র (১৯২৬) একাধিক কবিতায় এর সাক্ষ্য মেলে।

২। মোহিতলালের ভোগবাদী কাব্যাদর্শে রোমান্টিকতার সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। তাঁর কাব্য-চর্চার সূচনা পর্বেই এই রোমান্টিকতা সত্যেন্দ্রীয় ফ্যান্সির প্রভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। 'স্বপনপসারী' (১৯২১) কাব্যগ্রন্থের 'পুরুরবা', 'বেদুইন' প্রভৃতি কবিতায় এ মন্তব্য সমর্থিত। রোমান্টিক আবহ সৃষ্টির প্রয়াসে এসব কবিতার অনেক স্থানেই লোক-ঐতিহ্যের অনুস্মৃতি লক্ষণীয়।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)

১। বর্ধমানের পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। নদীয়ার শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর গ্রামে কবির

পিতৃভূমি। এখানেই কবির শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত। স্বাভাবিক-ভাবেই কৈশোরের গ্রামীণ পরিবেশের সুবাদে যতীন্দ্রনাথ বাংলার লোক-ঐতিহ্যের সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 'সেদিন বাঙলার গ্রামে গ্রামে রামায়ণ গান, যাত্রা, কথকতা আর পাঁচালী-গান হত। আর কিশোর যতীন্দ্রনাথের এ সবের ওপর ছিল দুর্বার আকর্ষণ। তিনি গুরুজনদের নিষেধ অমান্য করেও এই সব যাত্রা কথকতার আসরে উপস্থিত হতেন।----এই সব যাত্রা কথকতা তাঁর মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।'[২৫] এই প্রভাব-সঞ্চরণের পথ ধরেই তাঁর অনেকগুলি কবিতা লোকঐতিহ্যাশ্রয়ে রূপে-রসে সমৃদ্ধ। কর্মজীবনে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। চাকুরী-সূত্রে তিনি কৃষ্ণনগর, রঙপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারি, নাটোর, ফ্রেজারগঞ্জ এবং বিহার ও উড়িষ্যার নানা স্থানে সাময়িক বাস করেন। গ্রাম জীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা আগেই হয়েছিল, কর্মজীবনে তা সমৃদ্ধতর হয়। 'কাজের তাগিদে তিনি গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছেন, দেখেছেন গ্রাম-বাংলার করুণ রূপ, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও বিত্তহীনতার শোচনীয় চিত্র। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যেও বিধৃত।'[২৬] উল্লেখ্য, গ্রাম-বাঙলা সম্বন্ধে কবির 'বাস্তব অভিজ্ঞতা' লোকঐতিহ্য-নিরপেক্ষ ছিল না।

এছাড়া কবির ব্যক্তিগত জীবনের একাধিক বিপর্যয় ও প্রথম পর্বের কাব্যাদর্শ তাঁকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি দান করেছিল। তাঁর কাব্য-চর্চার প্রথম পর্বের বহু কবিতায় এর সমর্থন মেলে। এ জাতীয় কবিতাগুলিতে কবির ব্যঙ্গপ্রবণতা নানা লৌকিক প্রবাদের আশ্রয়ে তীক্ষ্ণতর হয়েছে। এসব স্থানে লৌকিক প্রবাদগুলিতে বিধৃত সুদীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞতা ও ভাব-প্রকাশের অমিত শক্তিকে কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। 'ঘুমের ঘোরে' (মরীচিকা ১৯২৩) 'নবপন্থা' (মরুশিখা—১৯২৭), 'নবান্ন' (মরুমায়া—১৯৩০), প্রভৃতি কবিতাগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

২। উনিশ শতকের নবচেতনা কিংবা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যতীন্দ্র-কবিতায় সরাসরি প্রতিষ্ঠা পায় নি বললেই চলে। কিন্তু গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়নের আদর্শ ব্যক্তি যতীন্দ্রনাথকে এক সময় অনুপ্রাণিত করেছিল। কবি রূপে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি স্বগ্রামে খদ্দর বয়ন ও পল্লীসংস্কারে কিছুকাল (১৯২০-২৩), আত্মনিয়োগ করেন। জীবনে সাময়িকভাবে হলেও স্বদেশ চেতনাজাত এই বাস্তব প্রয়াস তাঁর কয়েকটি

কবিতায় নানা লোকউপাদান-উপকরণের প্রযুক্তির কারণ। 'দেশোদ্ধার' (মরুশিখা), 'ফেমিন-রিলিফ' (মরুমায়া) প্রভৃতি এ জাতীয় কবিতাগুলির অন্যতম দৃষ্টান্ত।

৩। দেশ-কাল-সমাজ সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথের সচেতনতা অনস্বীকার্য। সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে নানা ভ্রষ্টাচার কবিকে অসহিষ্ণু ও পীড়িত করেছে। লোকঐতিহ্যাশ্রয়ে সেই ক্ষুব্ধ-ব্যথিত কবিমানসটি যতীন্দ্রনাথের কবিতায় পরিস্ফুট। তীব্র বাস্তবতা বোধ কবিকে লোক-জীবনের দুরবস্থার চিত্রাঙ্কনে অনুপ্রাণিত করেছে। এ শ্রেণীর কবিতায় লোকজীবন-চর্যার বহুবিধ উপাদান কখনো প্রত্যক্ষত, কখনো বা রূপকাশ্রয়ে ব্যবহৃত। 'চাষার বেগার' (মরীচিকা ১৯২৩), 'লোহার-ব্যথা' (মরুশিখা ১৯২৭), 'দুঃখের পার' (মরুমায়া ১৯৩০) প্রভৃতি কবিতায় উক্ত মন্তব্যের যাথার্থ প্রতিভাত।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

১। কাজী নজরুল ইসলাম গ্রাম-বাংলার সন্তান। বর্ধমানের জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলের জন্ম। দরিদ্র পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করে শিশু দুখু মিঞা (নজরুলের শৈশবের নাম) শিক্ষালাভের পথে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হন। গ্রামেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। শহরে পড়াশুনা করা তাঁর আর হয়ে ওঠে নি।

নজরুলের জীবনের প্রথম পর্বে তাঁর পিতৃব্য বজলে করিমের প্রভাব অনস্বীকার্য। এঁর প্রভাবে নজরুল বাল্যেই উর্দু-ফারসী মিশ্রিত 'মুসলমানী-বাংলায়' পদ্য রচনা শুরু করেন। এগারো বারো বছর বয়সেই তিনি সেই অঞ্চলে সুপ্রচলিত 'লেটো' নাচ-গানের দলে যোগ দেন। এই 'লেটো' হল এক ধরণের লোকনাট্য। সুতরাং জীবনের শুরুতেই নজরুল লোকঐতিহ্যের স্রোতোধারায় স্নাত হন। এই লেটো দলের প্রভাব তাঁর জীবনের পরিণত বয়সের রচনাতেও মেলে।

লেটো দলের পালা-রচয়িতা রূপে তিনি 'চাষার সঙ', 'ঠগপুরের সঙ', 'রাজপুত্র' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন।[২৭] এরপর নানা ঘটনা চক্রে নজরুল এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের সহায়তায় প্রথমে দরিয়ামপুর, পরে রানীগঞ্জের 'শিয়ারশোল'-এর হাইস্কুলে কিছুকাল পড়াশোনা করেন।

বাল্য-কৈশোরের এই বৈচিত্র্যময় জীবন নজরুলকে নানা সূত্রে বাংলার লোকঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনেছিল। যার অনিবার্য প্রভাব নজরুলের সাহিত্য-চর্চার বিভিন্ন শাখায় প্রতিফলিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালেও দেখা যাবে, নানা সূত্রে পরোক্ষভাবে লোকঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিখ্যাত লোকসঙ্গীতশিল্পী আব্বাসউদ্দিন (১৯০১-১৯৫৯), গ্রাম বাংলার কবি জসীমউদ্দিন (১৯০৪-১৯৭৬), বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা মুজফ্ফর আহ্মেদ (১৮৮৯-১৯৭৩) প্রমুখের মাধ্যমে লোকসাধারণ ও তাদের জীবন-চর্যার সঙ্গে কবির পরোক্ষ যোগসূত্রটি নিবিড়তর হয়েছিল। 'দোলন চাঁপা' (১৯২৩) 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় এর সাক্ষ্য মেলে।

২। স্বদেশ-চেতনা নজরুলের বিদ্রোহী কবিমানসের অন্যতম উৎস। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত। এ পত্রিকায় লিখিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' (পূজাসংখ্যা, ১৩২৯) কবিতাটির জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার মামলা দায়ের করেন।

আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়ে নজরুল সমাজে ও কোনো আন্দোলনে লোকসাধারণের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন। যার ফলে শ্রমজীবী লোক-সাধারণের প্রতি গভীর প্রীতি তাঁর কবিতায় সঞ্চারিত।

৩। নজরুলের কাব্যের লোকপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ, তাঁর বিদ্রোহপ্রবণতা। বিদ্রোহ পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অসাম্যময় সমাজের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের উৎস কেন্দ্রে একই সঙ্গে বাস্তব সচেতনতা ও রোমান্টিক স্বপ্নদর্শিতা বিদ্যমান।

এই বাস্তব চেতনা কবিকে নিপীড়িত শোষিত লোকসাধারণের আপন-জন করে তুলেছে। সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন ও বিদ্রোহ নজরুল-কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য, তা লোকঐতিহ্যের নানা উপাদান-উপকরণের আশ্রয়ে পরিস্ফুট হয়েছে।

৪। নজরুলের বহু গানে তাঁর রোমান্টিক কবিমানস স্ফূর্তি লাভ করেছে। প্রেম ও প্রকৃতির প্রতি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর বহু কবিতাতেও মেলে। এই সব কবিতার নানা স্থানে রোমান্টিক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে কবি লোক-উপাদানাশ্রয়ী। 'গোপনপ্রিয়া' (সিন্ধু হিন্দোল—১৯২৭) 'চাঁদনী রাত' (ঐ) এ জাতীয় কবিতার অন্যতম নিদর্শন।

এই রোমান্টিক মানসই কবির বিপ্লব চেতনার অন্যতম উৎস। বিপ্লবীরা রোমান্টিক। তাঁরাও স্বপ্ন দেখেন। সমাজের বাস্তব ধুলি-ধূসরতা ছাড়িয়ে সে স্বপ্ন-দৃষ্টি এক আদর্শ সমাজকে প্রত্যক্ষ করে। সেই আদর্শ সমাজের কথা নজরুলের কবিতায় বিধৃত। সামাজিক নানা বিশৃঙ্খলা, আদর্শচ্যুতি কবিকে পীড়িত করেছে। ক্ষুব্ধ কবি কবিতায় তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে লোকজীবনাশ্রয়ে তাঁর রোমান্টিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী।

৫। মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব পরোক্ষভাবে নজরুলের কয়েকটি কবিতায় প্রতিফলিত। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহমেদ-এর ভূমিকা অবশ্য-স্মর্তব্য। ফজলুল হক সাহেবের 'দৈনিক নবযুগ' সম্পাদকতাকালে মুজফ্ফর আহমেদের প্রভাবে নজরুল শ্রমজীবী সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের প্রবন্ধ তার পরিচয় ('ধর্মঘট', 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', 'মুখবন্ধ')।[২৮] বলা বাহুল্য, মুজফ্ফর আহমেদের মার্কসীয় দর্শন-চিন্তার অনুসরণেই শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে আস্থাশীল কবি নানা ক্ষেত্রেই লোকজীবনচর্যার অনুগামী। মুজফ্ফর আহমেদের প্রভাব নজরুলের 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের নানা স্থানে লভ্য।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪)

১। পূর্ববঙ্গের বরিশাল শহরে জন্ম হলেও শৈশব থেকেই তিনি গ্রামীণ পরিবেশে মানুষ হন। পরিবার-ভুক্ত পরিচারক-পরিচারিকার কাছে ছোটোবেলায় নানা লোককথা, ছড়া ও গ্রামবাংলার বিচিত্র গাছ-গাছালি, ফুল-পাখিদের নাম শুনতে তিনি ভালোবাসতেন। পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় রূপকথার বহুল ব্যবহার ও বিচিত্র গাছ-গাছালি ভরা প্রকৃতি জগতের উৎসে এর প্রভাব দুরনুমেয় নয়। কর্মসূত্রেও তিনি জীবনের নানা সময়ে লোকজীবনের সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন (১৯৩৫-৪৮)। এ সময় একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত কবি বাংলার লোকজীবনের পটভূমিতেই 'রূপসীবাংলা'-র (১৯৫৭-মৃত্যুর পরে প্রকাশিত; ১৯৩৬ এর কাছাকাছি সময়ে লিখিত),[২৯] কবিতাগুলি রচনা করেন।

২। জীবনানন্দের বাস্তব সচেতনতা প্রচলিত নিরিখে বিচার্য নয়। স্ব-কালকে গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধি করে ইতিহাস, মৃত্যু ও

ইন্দ্রিয়-চেতনার সংমিশ্রণে তা স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। আর এই সংমিশ্রণে যে আবহসৃষ্ট, তা অনেক ক্ষেত্রেই লোকজ উপাদানের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৯) প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের একাধিক কবিতায় এর সাক্ষ্য লভ্য (খেতে প্রান্তরে', 'রাত্রি', প্রভৃতি কবিতাগুলি দ্রষ্টব্য)।

৩। বিশ শতকের পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কাব্যান্দোলনে জীবনানন্দও কম বেশি আন্দোলিত। Impressionism, Fobbism, Futurism, Expressionism, Surrealism ইত্যাদি বিভিন্ন কাব্যাদর্শের প্রভাব তাঁর কবিতায় লোকঐতিহ্যাশ্রয়ে স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে।

তাঁর কবিতার অন্যতম প্রাণধর্ম যে ইতিহাসচারিতা, তা বহু ক্ষেত্রেই বাংলার রূপকথার আধারে বিধৃত। W. B. Yeats -এর কবিতায় যে ইন্দ্রিয়-ঘনত্ব লক্ষণীয়, জীবনানন্দেও তা ব্যাপকভাবে উপস্থিত। এই ইন্দ্রিয়-ঘনত্ব সৃষ্টিতে লোকঐতিহ্য তাঁর কবিতায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে 'অবসরের গান', 'মাঠের গল্প', 'স্বপ্নের হাতে' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্মরণে আসে।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১—১৯৮৮)

১। অমিয় চক্রবর্তীর শ্রীরামপুরে জন্ম হলেও প্রায় আবাল্য-প্রবাস তাঁর কবিতায় উদ্বাস্তু সুলভ মনোভাবের উৎস। আর এ কারণে মাঝে মাঝেই আমেরিকার শহরে বসেই কবি গ্রাম-বাংলায় মানস-পরিক্রমারত। 'প্রবাসী', 'বিধুবাবুর মতো' প্রভৃতি কবিতায় প্রবাস জীবন কবিকে বাংলার লোকঐতিহ্যের সন্নিকটবর্তী করে তুলেছে।

এছাড়া কিছুকাল শান্তিনিকেতনে বাস করে তিনি রবীন্দ্র-সান্নিধ্যও লাভ করেন যা লোকজীবন-চর্যার প্রতি তাঁর আকর্ষণের অন্যতম উৎস-স্বরূপ।

২। পাশ্চাত্যের 'আধুনিক' কাব্যাদর্শ অমিয় চক্রবর্তীকেও প্রভাবিত করেছিল। বিশ শতকের পাশ্চাত্য কাব্যান্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, 'সংস্কার-মুক্তির প্রয়াস' তাঁর কবিতায় স্বীকৃত। আর এ কারণে নানা লোকজ উপাদানও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় নতুনতর মাত্রা-সৃষ্টিতে সার্থক প্রযুক্ত।

জার্মান কবি রিলকের আপতিক বিরোধকে সংগতিদানের কাব্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম পর্বের কাব্যে ইমপ্রেশনিষ্টধর্মিতার সূত্রেও

বাংলার লোকঐতিহ্যের নানাবিধ উপাদান উপকরণের ব্যবহার মেলে। 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থে এ জাতীয় কবিতার সাক্ষাৎ লভ্য।

জসীমউদ্দিন (১৯০৪—১৯৭৬)

১। সব অর্থেই জসীমউদ্দিন যথার্থ পল্লী-কবি। ফরিদপুরের তাম্বুলখানায় এক ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশব-কৈশোর তো বটেই, যৌবনেও কিছুকাল বিশেষ কারণে জসীমউদ্দিন গ্রামেই অতিবাহিত করেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি লোকঐতিহ্যের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাই গ্রামের কবিয়ালদের আসরে তাঁর উপস্থিতি প্রায় নিয়মিত-ই ছিল। লোক-সংগীতের প্রতিও তাঁর গভীর প্রীতি ছোটবেলা থেকেই দেখা গিয়েছিল।

এছাড়া পিতৃব্য দানু মোল্লার কাছে শৈশব-বাল্যে শোনা বিচিত্র গল্পকথা ও পল্লী-গীতি-গাথার প্রভাবও তাঁর কাব্যজীবনে সুদূরপ্রসারী।

২। কলেজ জীবনেই জসীমউদ্দিন কাব্য-চর্চার পাশাপাশি গ্রাম্য গীতি-গাথাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। পরে কর্মসূত্রেও তিনি লোকঐতিহ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে জসীমউদ্দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক' রূপে (১৯৩১) পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে লোকসাহিত্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। উল্লেখ্য, এ সময় তিনি বাংলার বাউলদের নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন।

এরপর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-সাহিত্য-সংগ্রাহকের নব-সৃষ্ট পদে নিযুক্ত হন। এই সংগ্রহ-কর্ম-ও তাঁর কাব্যচর্চায় ব্যাপক প্রভাব-বিস্তারী।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, তিনি লোকঐতিহ্যবিষয়ক গ্রন্থ ও একাধিক প্রবন্ধের রচয়িতা[৩০]। 'মুর্শিদা', 'ঘাটু' প্রভৃতি লোকগীতি ও লোক-ঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট 'নকশী কাঁথা' বিষয়ক প্রবন্ধ তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়া পরবর্তীকালে তিনি 'জারীগান' (১৯৬৮) ও 'মুর্শিদা' (১৯৭৭) গানের সংকলন ও সম্পাদনা করেন।

জসীমউদ্দিন একাধিক লোকনাট্য-ধর্মী নাটকও রচনা করেন (এগুলির মধ্যে 'বেদের মেয়ে', 'পল্লী বধু' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য)। লোকঐতিহ্যের এই সচেতন-চর্চায় কবির কাব্যচর্চা অনিবার্যভাবে প্রভাবিত।

৩। জসীমউদ্দিনের কাব্য-কবিতার মূল সুর রোমান্টিক। কবির গভীর পল্লী-প্রীতির মূলেও এই রোমান্টিক দৃষ্টি অনস্বীকার্য। রোমান্টিক প্রেমের আবহ-সৃষ্টির জন্য তিনি প্রায়শই লোকঐতিহ্যাশ্রয়ী।

প্রকৃতপক্ষে, জসীমউদ্দিনের কবিতার পটভূমি লোকঐতিহ্যপুষ্ট গ্রামীণ সমাজ। স্বভাবতই তাঁর কাব্য-কবিতা লোকঐতিহ্যের বহু বিচিত্র উপাদান-উপকরণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

এই রোমান্টিক আবহ-সৃষ্টির জন্যই কবি তাঁর একাধিক কাব্যে নানা ধরণের পল্লীগীতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। কারণ কবির প্রথম কাব্য 'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) পড়ে অবনীন্দ্রনাথই এর প্রতি অংশের শীর্ষে বিষয়ানুগ লোকগীতির অংশ সংযোজনের কথা বলেন।

বিষ্ণু দে (১৯০৯--১৯৮৩)

১। বিষ্ণু দে-র পঠন পাঠনের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রটিতে বিভিন্ন দেশের লোকঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর অজস্র কবিতায়-এর প্রচুর নিদর্শন লভ্য। এছাড়া শিল্প-বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধে[৩১] তাঁর লোকশিল্প-প্রীতিও পরিস্ফুট। এমনকি লোকসঙ্গীত-বিষয়ক প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি।[৩২]

২। বিষ্ণু দে-র বাস্তব সচেনতা প্রচলিত ধারণায় বিচার্য নয়। প্রত্যয়সিদ্ধ দার্শনিকতায় তাঁর বাস্তব সচেনতা সুসমৃদ্ধ। আন্তর্জাতিক চেতনায় তাঁর বাস্তবতাবোধ কবিতায় উদ্ভাসিত। সেখানে অন্তঃসারশূন্য নগর জীবনের পাশাপাশি সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত, নিপীড়িত লোকজীবনও প্রতিবিম্বিত। অনেক সময় স্বদেশ ও বিশ্বের সুপরিচিত পুরাণের পটভূমিকায় কবি সমকালীন সমাজের বাস্তব প্রতিরূপ রচনা করেছেন। অনুরূপ কারণেই তাঁর কবিতায় সুপ্রচলিত রূপকথা ও লৌকিক ছড়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'পারুলের ছড়া', 'ছড়া' ১, ২, (সন্দীপের চর : ১৯৪৭), 'সাত ভাই চম্পা' (সাত ভাই চম্পা : ১৯৪৪) এ জাতীয় কবিতাগুলির অন্যতম।

৩। বিশ শতকের পাশ্চাত্য কাব্যজগতের অনন্য ব্যক্তিত্ব T. S. Eliot এর (১৮৮৮-১৯৬৫) কাব্যাদর্শ বিষ্ণু দে-কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। দেশ-কাল-নিরপেক্ষ ঐতিহ্যের চিরায়ত রূপটি উপলব্ধি

করে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে তাকে গ্রহণ করবার আদর্শ—তিনি Eliot-এর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। এই ঐতিহ্য প্রীতি ও সংস্কার মুক্তি তাঁর কবিতায় বহু বিচিত্র লোকঐতিহ্যের আশ্রয়ে সুপরিস্ফুট।

বিশ শতকের পাশ্চাত্য কাব্য-আন্দোলনের প্রভাব তাঁকে বহু কবিতায় লোকঐতিহ্যানুসারী করে তুলেছে। তাই ইতালির লোকনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল প্রাণের আদিম উৎসাহও তাঁর কবিতায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে Lorca ও Eluar -এর কাব্য-কবিতাও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। 'চোরাবালি' (১৯৩৭) 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৪) 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় এর উজ্জ্বল নিদর্শন লভ্য।

৪। বিষ্ণু দের কবিমানসে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব অনস্বীকার্য। মার্ক্সবাদের সামগ্রিক রূপ অনুধাবন করে কবি সে চিন্তাধারায় গভীরভাবে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। সমকালীন বিশ্ব ও মানুষের আপতিক খণ্ডতার জন্য ধনতন্ত্রকে দায়ী করে তিনি মানুষের মুক্তির সন্ধান পান মার্ক্সবাদে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সাম্যবাদী বিপ্লবেই প্রলেতারিয়েত তথা সাধারণ মানুষের মুক্তি সম্ভব—এই প্রত্যয়, তাঁকে কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের উপাদান-উপকরণ ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করেছে। 'জন্মাষ্টমী' (পূর্বলেখ) 'যে দিনের গান' (সন্দ্বীপের চর) '১৯৪২', 'এক পৌষের শীত' (সাত ভাই চম্পা) প্রভৃতি কবিতায় এ মন্তব্যের সমর্থন মেলে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯—)

১। নদীয়ার কৃষ্ণনগরে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। শৈশব-কৈশোরের গ্রাম-জীবনের নানা স্মৃতি তাঁর কবিতায় বিধৃত। এছাড়া বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। স্বল্পকাল হলেও গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা ও রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হেতু লোকসমাজ ও লোকঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে তাঁর। যার প্রভাব তাঁর কবিতায় স্পষ্টগোচর। 'এই আশ্বিনে' (চিরকুট), 'কাব্যজিজ্ঞাসা', (অগ্নিকোণ), প্রভৃতি কবিতায় এর সাক্ষ্য মেলে।

২। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাস্তব চেতনার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এছাড়া প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির

সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলেও কবির বাস্তব চেতনা তীক্ষ্ণতর হয়েছে। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে কবির বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মিশ্রিত বাস্তবতা-বোধ লোকসমাজ-নিরপেক্ষ থাকে নি। কবি দেখেছেন, বার বার জমিতে ধান ফললেও 'ন্যাবির আগায় পাড়া জুড়োতে / তারপর পালে আসে পেয়াদা'—শোষণ-ক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত, দরিদ্র লোক-সাধারণের দুর্দশার এ করুণ চিত্রটি তাঁর একাধিক কবিতায় লোকজীবন-চর্যার বহুবিধ উপাদান-উপকরণ সহযোগে চিত্রিত হয়েছে।

'গ্রামে' (চিরকুট/১৯৪৯) 'স্বাগত' (ঐ) 'ঘোষণা' (অগ্নিকোণ / ১৯৪৮) প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য।

৩। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাঁর সাম্যবাদী বিপ্লব-চেতনা। সর্বহারা মানুষের দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা তাঁকে বিপ্লবাত্মক চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছে। স্বভাবতই লোকসাধারণ ও লোকসমাজ তাঁর কবিতায় বিশিষ্ট ভূমিকা-সম্পন্ন। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন করতে গিয়ে কবি তাঁর অনেক ক্ষেত্রেই লোকঐতিহ্যাশ্রয়ী। 'মে দিনের কবিতা', 'সকলের গান', 'প্রস্তাব ১৯৪০' (পদাতিক / ১৯৪০), 'আহ্বান' (চিরকুট / ১৯৪৯) প্রভৃতি বহু কবিতা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ্য।

বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০—১৯৮২)

১। বিমলচন্দ্র ঘোষ বাস্তব-মনস্ক কবি। সমকালীন রাজনীতির আত্মপ্রচারধর্মিতা, সামাজিক অবিচার, শোষণ, মধ্যবিত্তের ত্রিশঙ্কু অবস্থা, ইত্যাদি উপলব্ধি করেছেন তিনি। বিশেষত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পট-ভূমিকায় দেশব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয় কবিকে সবিশেষ আলোড়িত করেছিল। তাঁর কবিতায় এই আলোড়িত কবিমানসের প্রতিফলন ঘটেছে। সমকালীন যুগের এই ভ্রষ্টতায় কবির অন্তর্জ্বালা নানা লোকউপাদান অবলম্বনে প্রকাশিত। 'দক্ষিণায়নে', 'ভ্রষ্টদিন', 'মহাসামরিক' প্রভৃতি কবিতায় এ মন্তব্যের সমর্থন লভ্য।

২। বিমলচন্দ্র মার্কসবাদে সমাজ-মুক্তির পথের সন্ধান জেনেছেন। সাম্যবাদী বিপ্লবাত্মক চেতনায় কবি শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য-দুরবস্থার কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন ধনতন্ত্রকে।

শ্রমজীবীদের সংগ্রামই বর্তমানের অন্ধকার ঘুচিয়ে নূতন সূর্যোদয় ঘটাবে,—এ বিশ্বাসে কবি তাঁর কবিতায় শ্রেণী-সংগ্রামের চিত্র রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, লোকসাধারণ এই শোষিত শ্রমজীবীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের জীবন-চর্যার নানা দিক স্বভাবতই তাঁর কবিতায় স্থানপ্রাপ্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'মদনসাগরদোলা', 'কিস্তি শোধের বাস্তবতা', 'ধুমাবতী' ইত্যাদি কবিতা স্মরণযোগ্য।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬--১৯৪৭)

১। স্বল্প-পরিসর জীবনে বিচিত্র ও বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সুকান্তর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর অকপট প্রীতি সে অভাব পূরণ-প্রয়াসী। এছাড়া, রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ তাঁর বাস্তবতা বোধকে তীক্ষ্ণতর করেছিল।

বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, যুদ্ধ ইত্যাদি নানা বিপর্যয় কৈশোরেই কবিকে আন্দোলিত করে। তাই তাঁর বিপ্লব চেতনাকে সম্পূর্ণত ভাববাদী বলে লঘু-জ্ঞান করার সুযোগ নেই। এই বাস্তববাদিতা সুকান্তর বহু কবিতায় লোকঐতিহ্যানুসরণে প্রকাশিত। 'বিবৃতি' (ছাড়পত্র/১৯৪৯), 'সেপ্টেম্বর ৪৬' (ঐ), 'এই নবান্নে' (ঐ), 'ভেজাল' (মিঠেকড়া/১৯৫২) প্রভৃতি কবিতায় এ অনুসরণ চোখে পড়ে।

২। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য সুকান্ত-র কাব্যচর্চা সাম্যবাদী বিপ্লবী চেতনার ফল। শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তব চিত্র-ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর কবিতার মূল বিষয়। কবির এই বিপ্লবী চেতনা তাঁকে গণমুখী করেছে। ব্রেখটের মতোই তিনি বলেছেন, কবির চেয়ে তাঁর 'কম্যুনিষ্ট' পরিচয়ই বড়। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজের সাধারণ মানুষজনকে সম্যক উপলব্ধি করাই কম্যুনিষ্টদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষজন ও তাদের জীবন-সংগ্রাম তাই সুকান্তের কবিতার মুখ্য অবলম্বন হয়ে ওঠে।

স্বাভাবিকভাবেই সুকান্তর কবিতায় লোকসাধারণ ও তাদের জীবন-চর্যার নানাবিধ উপাদান-উপকরণ ব্যবহৃত। 'হে মহাজীবন' (ছাড়পত্র) 'দিন বদলের-পালা' (ঘুম নেই—১৯৪৮) প্রভৃতি কবিতা এর দৃষ্টান্ত।

উপসংহার ঃ

বিশ শতকের প্রথমার্ধের আলোচ্য কবিদের কাব্য-কবিতায় লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এযুগের কাব্য-কবিতায় লোক-ঐতিহ্যের এই প্রভাবের উৎস-সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'লে নানাবিধ কারণ চোখে পড়বে।

লোকঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র গ্রাম। আলোচ্য কবিদের অনেকেই নানা সূত্রে সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করে লোকজীবনের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। পল্লীপ্রীতিও এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি-বিশেষের লোকঐতিহ্যবিদ্যা-চর্চা ও তার প্রতি আগ্রহ-আকর্ষণ এযুগের কবিতায় লোকঐতিহ্যানুস্মৃতির আর একটি কারণ। রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ-সূত্রেও লোকঐতিহ্যের বহু বিচিত্র উপাদান-উপকরণে বহু কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে।

বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কাব্যান্দোলনের প্রভাবও এ পর্বের কবিদের লোকঐতিহ্য-সচেতন করে তুলেছে। এছাড়া জনসংযোগের প্রয়াসেও বহু কবিতায় লোকঐতিহ্যানুস্মৃতি লক্ষণীয়।

উল্লেখপঞ্জী

১। ডঃ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ২৬–২৭।
২। ডঃ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ২৯।
৩। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামে 'লোকসাহিত্য' (১৩১৪ সাল) গ্রন্থভুক্ত হয়।
৪। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি ১৩৪৫ সালে প্রথম 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত হয়।
৫। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রতিবেদনটি ১৩১৫ সালে 'শিক্ষা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৬। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' (১৩০৩), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৩১৪), বিভূতিভূষণ গুপ্তের 'বেড়াল ঠাকুরঝি' (১৩৩০) ইত্যাদি গ্রন্থের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের লেখা।
৭। দক্ষিণারঞ্জন সংগৃহীত লোককথার সংকলন 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯০৯), 'ঠানদিদির থলে' (১৯০৯), 'দাদামহাশয়ের থলে' (১৯১৩) ইত্যাদি।
৮। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (১৯২৩), 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' (১—৪ খণ্ড) উল্লেখযোগ্য।
৯। ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : ঠাকুরবাড়ীর কথা, ১৯৬৬, কলকাতা, পৃঃ ১৪৬–১৪৭।
১০। ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : রবীন্দ্র অন্বেষা, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ৪৮।
১১। ডঃ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২–৬৩।
১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছেলে ভুলানো ছড়া ১ ও ২ (১৩০১–২ সনে যথাক্রমে সাধনা ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত)।
১৩। ডঃ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।
১৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য, কলকাতা, (১ম সংস্করণ) ১৯৭৩, পৃঃ ৫৪।
১৫। Ramananda Chatterjee : Rabindranath Tagore/Viswa Bharati; Qly. (Tagore Birthday Number) May-Oct. 1941 p. 4.
১৬। ডঃ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮–৯।
১৭। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ; কলকাতা (২য় সং) ১৯৭৮, পৃঃ ৫৫।
১৮। ডঃ অলোক রায় : যতীন্দ্রমোহন : কবি ও কাব্য; হাওড়া, ১৯৫৪, পৃঃ ৪।
১৯। ডঃ অলোক রায় : 'সত্যেন্দ্র জীবন কথা' : সত্যেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড); কলকাতা, ১৯৭২।
২০। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০।

২১। কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার (কলকাতা ১৯৬৭)-এ কালিদাস রায় লিখিত ভূমিকা পৃঃ ৪।
২২। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৬।
২৩। ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় : মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস ; কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ৩৩-৩৪।
২৪। সম্পাদকীয় : 'শনিবারের চিঠি', মাঘ, ১৩৪৬।
২৫। ডঃ অমরেন্দ্র গণাই : যতীন্দ্রনাথের কবিকৃতি ; কলকাতা ১৩৩৩, পৃঃ ৩।
২৬। ঐ পৃঃ ৬।
২৭। আব্দুল কাদির : 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য'—নজরুল রচনাসম্ভার (১ম খণ্ড) সন, পৃঃ ৩৭১।
২৮। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩১।
২৯। জীবনীপঞ্জি : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, (২য় সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ।
৩০। জসীমউদ্দিন : 'পল্লীশিল্প' ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৩৯), 'পূর্ববঙ্গের নকশী কাঁথা ও শাড়ী' (মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৩৮) ইত্যাদি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।
৩১। বিষ্ণু দে : জনসাধারণের রুচি, কলকাতা ১৯৭৫, পৃঃ ২৯।
৩২। ঐ পৃঃ ১৩২।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের (১৯০১—১৯৫০) বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব নিরূপণ

ভূমিকা।

বিশ শতকের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব প্রতিফলনের নানামুখী বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। এখন এই প্রভাব-সূত্রগুলির প্রয়োগে আলোচ্য পর্বের বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক-ঐতিহ্যের প্রভাব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, বস্তু, বাক, বিশ্বাস-অনুষ্ঠান, অঙ্গভঙ্গি, ক্রীড়া, শিল্প ও অঙ্কন-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের শৃঙ্খলাক্রমে এ আলোচনা বিন্যস্ত।

১। বস্তু-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি :

লোকঐতিহ্যের বস্তু-কেন্দ্রিক পর্যায়ে খাদ্য-পানীয়, পরিধান-প্রসাধনাদি, গৃহস্থালী দ্রব্য, বিভিন্ন লোকবৃত্তির সরঞ্জাম, যানবাহন, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি বিচিত্র বস্তুসম্ভার অন্তর্ভুক্ত।

১। (১) খাদ্য-পানীয় : আলোচ্য কাল-পর্বের (১৯০১-৫০) বাংলা কাব্য-কবিতায় নানা সূত্রে লোকখাদ্য ও লোকপানীয়ের প্রসঙ্গের ব্যবহার ঘটেছে। অবশ্য মধ্যযুগের তুলনায় এযুগের কাব্য-কবিতার খাদ্য-পানীয়ের বৈচিত্র্যাভাব অনস্বীকার্য। আসলে, মধ্যযুগে এমন কি উনিশ শতকেও বিশ শতকের মতো ব্যক্তি-জীবন এত সমস্যা-জটিল ছিল না। এযুগে বিজ্ঞানের প্রয়াসে একদিকে যেমন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি তার জীবনযাপনের সমস্যাও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তার ভার বেড়ে চলেছে, কমেছে তার অবসর-যাপনের সময়। তাই পৌষ-পার্বণের দিনে আগের মত আর ঘরে ঘরে হরেক রকম পিঠে-পুলির আসর বসে না। দৈনন্দিন রন্ধনকর্মের আয়োজনেও সংক্ষিপ্তিকরণের প্রবণতা চোখে পড়ে। গ্রাম-জীবনেও এ পরিবর্তন সহজ-দৃষ্ট। একারণেই তিরিশের

দশকের কবিদের কবিতায় লোকখাদ্য ও লোক-পানীয়ের ব্যবহার নিতান্তই অল্প, তবে সামগ্রিক ভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের কাব্য-কবিতার বিস্তৃত অঙ্গনে লোকসমাজের নানা খাদ্য-পানীয় একেবারে বিরল-দৃষ্ট নয়।

১। (১) [১] ধান্যজাত খাদ্য : 'চিড়া', 'খই', 'মুড়ি', 'মুড়কি' প্রভৃতি ধান্যজাত খাদ্যাদি আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় উল্লিখিত।

বিগত দিনের প্রীতি-মমতাময় সম্পর্কের রোমান্টিক আবহ-নির্মাণে 'চিঁড়ে' 'কলা'—'নাড়কেল নাড়ু'-র সার্থক ব্যবহার লক্ষণীয়। দীর্ঘদিন পরে এককালের ভালো-লাগা 'অমিয়া'-র সঙ্গে কবির দেখা হলো, অমিয়া এখন অন্যের গৃহিণী। কবিকে দেখে 'অমিয়া নিয়ে এলো, 'চিঁড়ে কলা নারকেল নাড়ু—' [অমৃত : শ্যামলী (১৯৩৬) : রবীন্দ্রনাথ]। লক্ষণীয়, অমিয়া চপ-কাটলেট আনে নি, একেবারেই ঘরোয়া খাবার এনেছে, যা কবির সঙ্গে তার পুরনো মধুর সম্পর্কের নিবিড়তারই ইঙ্গিত-বাহী। আবার মধ্যবিত্তের অল্পে সন্তুষ্টির চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা সূত্রে দেখি, তারা 'চিঁড়ে গুড় খেয়ে তৃপ্তিটুকু উপভোগ করে' [বিধুবাবুর মতো : মাটির দেয়াল (১৯৪২) : অমিয় চক্রবর্তী]। লক্ষণীয়, 'চিড়ে-গুড়' এখানে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত।

আধুনিক কবিতার নানা বৈশিষ্ট্যের একটি হলো, কবিতায় বস্তু বা শব্দ চয়নে সংস্কারহীনতা ; তাই আকাশের তারার উপমান রূপে 'খই' অনায়াসে সেখানে গৃহীত,—'নীল আকাশের খই ক্ষেতের সোনালী ফুলের মত অজস্র তারা' [আমি যদি হতাম : বনলতা সেন / (১৯৪২) : জীবনানন্দ দাশ]। উল্লেখযোগ্য, 'খই' এর ক্ষেত হয় না। কিন্তু 'অজস্র তারার ভিড়' দেখে কবির স্যুররিয়ালিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হয়েছে, নীল আকাশে যেন খইয়ের ক্ষেত ফুটে আছে। অবশ্য 'তারা' ও 'খই'-এর সূক্ষ্ম সাদৃশ্য অলীক কল্পনা নয়। দূর থেকে উভয়ের আকৃতি ও বর্ণগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তাছাড়া ভাজার সময় যেমন 'খই' 'ফোটে', তেমনি চলতি কথায় আকাশে তারাও 'ফোটে'।

কখনও 'খইয়ের রঙ রিক্ততার ইঙ্গিতবাহী। সমকালীন যুগের অদ্ভুত অন্তঃসারশূন্যতায় কবি দেখেন, 'ঝাঁপির থেকে অমেয় খইয়ের রঙ ঝরে, / সহসা নদীর মতো প্রতিভাত হয়ে যায় সব' [হাঁস : সাতটি তারার তিমির (১৯৪৯) : ঐ], 'ঝাঁপি'-তে শস্যাদি থাকে ; তাই তা সমৃদ্ধির প্রতীক। সেই ঝাঁপি শূন্য করে 'অমেয় খইয়ের রঙ' ঝরে পড়ছে। খইয়ের সাদা রঙ এখানে যুগের শূন্যতার, রিক্ততার দ্যোতনা এনেছে। এছাড়া নিছক বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'মুড়কির মোয়া', 'খইয়ের মোয়া' প্রভৃতির

উল্লেখও নানা স্থানে মেলে [যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'র (১৯৩৭)২ সংখ্যক কবিতায় 'মুড়কির মোয়া', 'ছড়া'র (১৯৪২) ৬ সংখ্যক কবিতায়' খইয়ের মোওয়া' ইত্যাদি]।

ভোজনবিলাসী বাঙালীর অতিপরিচিত ভোজ্য 'পিঠে-পুলি' এ কাল-পর্বের কবিতায় একেবারে অ-পরিবেশিত থাকে নি। তবে বলাবাহুল্য, তার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ পূর্ব যুগের মত অত সুসমৃদ্ধ নয়।

সাধারণত বছরের একটি বিশেষ সময়ে বাঙালী-গৃহে এই 'পিঠে-পুলি'-র আসর বসে। প্রস্তুত-পদ্ধতি, উপকরণ ও স্থান ভেদে বিচিত্র ধরণের 'পিঠে' বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত। এদের নামও বড় বিচিত্র। 'পৌষ-পার্বণ' উৎসবের সঙ্গে এই 'পিঠে-পুলির' অবিচ্ছেদ্য যোগ। ফসল কাটার আনন্দে 'পৌষ-পার্বণে'র নির্দিষ্ট দিনটি বাংলার লোকসমাজে যেন 'পিঠে-পুলি' খাওয়ারই উৎসব বলে মনে হয়।

চালবাটা, নারকেল, দুধ ইত্যাদিই পিঠে-পুলির প্রধান উপাদান। বাংলার নগর সমাজেও পিঠে-পুলির কদর যথেষ্ট, তার প্রমাণ কবিতাতে লভ্য,—''মাঝে মাঝে পাই পুলি পিঠে / পার করে দিই দু-চারটে / খেজুর গুড়ের সাথে মিশে'' [পলাতকা : প্রহাসিনী (১৯৩৮) : রবীন্দ্রনাথ।]

পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয়-রাঢ়-মানভূম অঞ্চলে প্রচলিত বিশেষ এক ধরণের পিঠের নাম 'আসকে'; প্রস্তুতির পর এর ভেতরে অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়। কবিতায় এই ছিদ্র করার দিকটিকে যতীন্দ্রনাথ স্ব-কর্তব্য পালনের সূচক রূপে গ্রহণ করেছেন।

সমকালীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেতৃত্বের নানা ভ্রষ্টাচারে কবি বীতশ্রদ্ধ; স্বার্থপর নেতাদের ছদ্ম-দেশপ্রেম এবং অন্যকে উপদেশ দিয়ে বা বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আত্মরক্ষার প্রবনতাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই তাদের অন্তঃসারশূন্য অগ্নিময় ভাষণের প্রতি কবির তীব্র কটাক্ষ— '—সকলেই মহা যুগবাণী শোন— / নিজ চরকায় তেল দাও, নিজ আসকের ফোঁড় গোণ' [ক্ষণিকের জাগরণ : মরুশিখা (১৯২০) : যতীন্দ্রনাথ]। স্পষ্টতই-'আসকে'র 'ফোঁড়' গোণা এখানে স্ব-কর্তব্য পালনের ইঙ্গিতবাহী।

আবার বাঙালী বাবুদের বিলাসিতাময় জীবন-যাপনের প্রতি কটাক্ষ-সূত্রে 'পায়েসের' উল্লেখ মেলে। সেখানে দেখি, 'বাঙালী বাবুরা' 'পায়েস খেয়ে..দুপুর বেলা আয়েস' করেন (কচুরিপানা : মাটির দেয়াল : অমিয় চক্রবর্তী)।

জলে ভেজান আগের দিনের ভাতকে 'পান্তাভাত' বলে। কবিতায় দেখি, সত্যকে গোপন করে মিথ্যা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ক্ষুব্ধ মোহিতলাল বললেন, "তপ্ত বলিয়া ভাণ করে কেহ' পান্তা জুড়াতে চায়" [দুঃখের কবি : হেমন্ত গোধূলি (১৯৪১) : মোহিতলাল]। উল্লেখযোগ্য, 'পান্তা-ভাত' স্বভাবতই ঠাণ্ডা থাকে। সুতরাং তাকে তপ্ত বলে 'জুড়াতে' চাওয়া, প্রহসনেরই সামিল, সত্য গোপনের নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।

১। (১) [২] দুগ্ধজাত খাদ্য : ননী, ক্ষীর, রসকড়া প্রভৃতি দুগ্ধজাত খাদ্যবস্তুর সমাবেশ বিভিন্ন কবিতায়। স্নিগ্ধ, কমনীয় অর্থে ননীর উপমা-সুলভ ব্যবহার সাধারণ্যে সুপ্রচলিত। কবিতায়-ও তার বহুল প্রয়োগ মেলে। এছাড়া ভিন্নসূত্রেও কবিতায় দুগ্ধজাত খাদ্যবস্তুর প্রয়োগ দেখা যায়।

শিশু সুন্দর, প্রকৃতিও সুন্দর। সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ তাই শিশুর সঙ্গে প্রকৃতির এক অর্ন্তগূঢ় যোগসূত্র উপলব্ধি করে লিখেছেন, 'যখন নবনী দিই লোলুপ করে / হাতে মেখে মুখেচুকে বেড়াও ঘুরে, / তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদী বারি, / ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে'—[কেন মধুর : শিশু (১৯০৩) : রবীন্দ্রনাথ], 'নবনী মাখা মুখ, এখানে শিশুর সৌন্দর্যের পরিস্ফুটক।

শিশুর উপমা সূত্রেও 'ননী' গৃহীত,—'ননীর গড়ন শিশু' [শিশুর আশ্রয় : বেণু ও বীণা (১৯০৬) : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]। কখনও স্পর্শকাতর বা নিতান্তই কোমল অর্থে সৌন্দর্য প্রেমী সত্যেন্দ্রনাথ শিশু ফুলের রূপক রূপে 'ননী'-র প্রয়োগ করেছেন। বিকাশোন্মুখ অবস্থায় হিমের স্পর্শে অনেক সময় ফুলের অকাল মৃত্যু ঘটে। তাই কবি বলেছেন, শিশু ফুল যেন 'ননীর পুতুল হিমের পরশে মরি' [শিশুফুল : ফুলের ফসল (১৯১১) ঐ]। আবার নজরুলের একটি কবিতায় 'ননী' শিশুর আনন্দময় উপস্থিতির দ্যোতনা সৃষ্টিতে সার্থক-প্রযুক্ত,—'ওরে যাদু, ওরে মাণিক, আঁধার ঘরের রতন-মণি। / ক্ষুধিত ঘর ভরলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী' [চিরশিশু : ছায়ানট (১৯২৪) : নজরুল।]।

সমাজ-বিপ্লবীরা এক অর্থে রোমান্টিক। তাই সাম্যবাদী বিপ্লবী কবি নজরুলও স্বপ্ন দেখেন, এক আদর্শ সাম্যময় সমাজের, যেখানে "পায় না ক'—কেহ ক্ষুদ খাঁটা কেহ দুধ-সর-ননী" [সাম্য : সর্বহারা (১৯২৬) : নজরুল]। 'ক্ষুদ-খাঁটা' ও 'দুধ-সর-ননী' এ কবিতায় যথাক্রমে দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের প্রতীক।

রোমান্টিক কবির অন্যতম মানসধর্ম অতীতচারিতা। বর্তমান তাঁকে তৃপ্তিদানে অপারগ। তাই তিনি কখনো অতীতচারী, কখনো বা ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা। রোমান্টিক কুমুদরঞ্জনও বিগত অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এই বলে,—'সেই ক্ষীর সর নবনীর দিন আর ফিরিবার নয়' [তে হি নো দিবসা গতা : স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮) : কুমুদরঞ্জন]; 'ক্ষীর-সর-নবনী' এখানে অতীত সমৃদ্ধির সূচক। 'ক্ষীর' স্নিগ্ধ ও সুধাময় অর্থেও ব্যবহৃত। নারীর স্নেহময়তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, 'স্নেহবলে নারী বক্ষ শোণিতে ক্ষীর করি পারে দিতে' [সাম্য-সাম : হোমশিখা (১৯০৭) : সত্যেন্দ্রনাথ]। কখনো বা রোমান্টিক কবি-কল্পনায় অপূর্ব জ্যোৎস্নালোক 'শতগুণে উচ্ছ্বসিত ক্ষীর' (সোম : ঐ) রূপে প্রতিভাত। শুধু তাই নয়, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় সুগন্ধের রূপকার্থেও ক্ষীরের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সেখানে পদ্মের সুগন্ধ হয়েছে 'মৃণালের ক্ষীর' (নীলাকমল : ফুলের ফসল : ঐ)।

আবার সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে বিপর্যস্ত এক যুগের কবি জীবনানন্দ দেখেছেন, অতীতের ক্ষণিকের প্রেমই আজ প্রেমিকের উপজীব্য; চিরায়ত, সফল প্রেম এযুগে অসম্ভব। কবির কাছে বিগতা প্রেমিকা 'একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া / আতার ধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো / নদীর জলে / সমস্ত বিকেল বেলা ধরে / স্থির....' (আমাকে তুমি : বনলতা সেন : জীবনানন্দ)। লক্ষণীয়, 'ক্ষীরে গড়া মূর্তি' সৌন্দর্যের ও স্নিগ্ধতার সূচক হলেও 'ধূসর' বিশেষণ যোগে তাকে স্থবির, অতীত-সর্বস্ব করে তোলা হয়েছে।

নারকেল কুরে চিনি বা গুড় ও দুধ সহযোগে বিশেষভাবে প্রস্তুত 'নাড়ু' লোকসমাজে সুপরিচিত মিষ্টান্ন বিশেষ। জীবনানন্দের কবিতায় এটি প্রেম-মমতার সূক্ষ্ম দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। বিষণ্ণ, ধূসর প্রেমের কবি আক্ষেপ করেছেন যে তাঁর মৃত্যু হলে প্রেমিকা অন্য কাউকে ভালো-বাসবে কি না, তা তাঁর জানা নেই..... '..বুঝিব না গঙ্গাজল, নারকেল নাড়ুগুলো তার / জানি না সে কারে দেবে—— / আবার কাহার সাথে ভালোবাসা হবে তার— / আমি তা জানি না', [১৭সং কবিতা : রূপসী বাংলা : (১৯৫৭) : জীবনানন্দ], বিপন্ন যুগের অস্থির প্রেম-প্রসূত বিষণ্ণতার সুরটি এখানে অনুরণিত।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের 'অমিয়া' ('শ্যামলী' গ্রন্থভুক্ত) কবিতাটিতে ইতিপূর্বেই মধুর রোমান্টিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতবাহী

রূপে 'চিঁড়ে', 'কলা'-র সঙ্গে 'নারকেল নাড়ু'-র সাক্ষাৎও মিলেছে।

এছাড়া, কাহিনীমূলক একটি কবিতায় দেখি, বিয়ের পর মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি ; দীর্ঘ নদীপথের যাত্রা। তাই তার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে, 'দই-এর হাঁড়ি, রসকড়া ও চিঁড়ে' [আটাশবাড়ি : পাঞ্চজন্য : (১৯৪১) যতীন্দ্রমোহন]। কবিতাটির কাহিনীতে বাস্তবতা পরিস্ফুটনে এ খাদ্য-বস্তুগুলি উল্লিখিত।

১। (১) [৩] উদ্ভিদজাত: খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে তরল খেজুর গুড় 'নলেন' বা 'নলিন' গুড় নামে পরিচিত। খেজুর বাগানের তাৎপর্য-ময় বর্ণনাসূত্রে যতীন্দ্রনাথের কবিতায় 'নলিন গুড়' উল্লিখিত। সেখানে জিরেন কাঠের ছাঁকা রস দিয়ে 'নলিন গুড়ের' (খেজুর বাগান : মরুশিখা : যতীন্দ্রনাথ) প্রস্তুত পদ্ধতির চিত্র মেলে। রবীন্দ্রনাথও 'পলাতকা' (প্রহাসিনী গ্রন্থভুক্ত) কবিতায় 'খেজুর গুড়' সহযোগে 'পিঠে-পুলি' খাওয়ার কথা বলেছেন।

১। (১) [৪] ব্যঞ্জনাদি: কলা গাছের ফুল 'মোচা' দিয়ে প্রস্তুত সুস্বাদু 'ঘন্ট' রান্নার বিচারে জনৈক গৃহস্থবধূ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, 'মোচার ঘন্ট বানাতে সে সবার চেয়ে কেজো বউ' (৫ সং কবিতা : ছড়া : রবীন্দ্রনাথ)। এছাড়া 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থেরই ৬ সংখ্যক কবিতায় 'চচ্চড়ি', 'ঝোলঝাল' এবং অমিয় চক্রবর্তীর 'একমুঠো' (১৯৩৯) কাব্য-গ্রন্থের 'আরোগ্য' কবিতাটিতে 'ঝোল' পরিবেশিত হয়েছে।

চাল-ডাল-তরিতরকারি-মসলাদি সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ 'জগা-খিচুড়ি'র প্রয়োগও কবিতায় মেলে। জগৎ-সংসারের নানা বিশৃঙ্খলায় ক্ষুব্ধ যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জীবনে মরণে সমপরিমাণে/মিলায়ে রাঁধে এ জগাখিচুড়ি' (খিচুড়ি : মরুশিখা : যতীন্দ্রনাথ) ; জগতের নানা বৈপরীত্যের সহাবস্থানের রূপকার্থে এখানে 'জগাখিচুড়ি' ব্যবহৃত। এ প্রয়োগে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি কবির অনাস্থাজাত ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবটিও সুপরিস্ফুট।

১। (১) [৫] অন্যান্য: চিঁড়ে-খই-দুধের সঙ্গে ফলাদি সহযোগে আহার্য 'ফলার' প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে জীবনানন্দের কবিতায় দৈনন্দিন ক্লান্তিকর জীবন-যাপনের সংকেতবাহী হয়ে উঠেছে। শোষণ-ক্লিষ্ট সমাজে সাধারণ মানুষ যেন সে-ই 'বলদ', 'যে বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে' [কোরাস : মহাপৃথিবী (১৯৪৪) : জীবনানন্দ]। বলাবাহুল্য, 'ফলার' এখানে শোষিত সাধারণ মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত দিনাতিপাতের প্রতীক।

লোকগৃহে, বিশেষত লোকসমাজের নারী মহলে 'আচার' একটি অতি মুখরোচক খাদ্যবস্তু। আম, তেঁতুল, কুল প্রভৃতির সঙ্গে তেল-নুন-নানাবিধ মসলা কিংবা গুড় সহযোগে এটি প্রস্তুত হয়। কোনো কোনো আচার যত পুরানো হয়, ততই তার স্বাদুতা বাড়ে। কবিতায় অতীত পৃথিবীর রূপকার্থে 'আচার' গৃহীত হয়ে বিশেষ তাৎপর্যময় হয়েছে।

সমকালীন যুগের নিরাশ্বাস, বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে জীবনানন্দ— উপলব্ধি করেছেন, কালের স্রোতোধারায় সব কিছুই ভেসে যাবে; শুধু 'যা কিছু নিভৃত-ধূসর-মেধাবী' তা-ই টিকে থাকবে।—'পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে/যা কিছু নিভৃত-ধূসর-মেধাবী— তাহারে রক্ষা করে/পাথরের চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মন গড়ে' (মনোবীজ : ঐ); 'আচার' এখানে একই সঙ্গে মানুষের সুদীর্ঘকালের কামনা-বাসনারও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এনেছে।

এছাড়া, নিতান্ত বর্ণনাসূত্রে অন্যত্রও 'আমের আচার'-এর উল্লেখ লভ্য। যেমন, অম্লশূলের ভয়ে 'আমের আচার' কেউ খাবে না। তাই 'কাঁচা আমের আচার যত/রহিবে হয়ে বংশগত' (ভোজনীয় : প্রহাসিনী : রবীন্দ্রনাথ), এক্ষেত্রে অবশ্য 'আমের আচার'-এর সঙ্গে সূক্ষ্ম কৌতুক রসও পরিবেশিত।

আবার 'চিনি-ময়দা' সহযোগে প্রস্তুত বহুতর বিশিষ্ট খাদ্য 'খাজা'-র উল্লেখ বিমল চন্দ্রের 'কিস্তি শোধের বাস্তবতা' [দ্বিপ্রহর এবং অন্যান্য কবিতা (১৯৪৬)] নামক কবিতাটিতে মেলে।

১। (২) পরিধান-প্রসাধন : বৈচিত্র্যময় লোকসমাজের পরিধান-প্রসাধন-সজ্জা-দ্রব্যাদিও কম বিচিত্র নয়। 'পাগড়ি' থেকে শুরু করে 'নাকছাবি-দুল', 'আলতা-সিঁদুর', 'আয়না-চিরুনী' প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

১। (২) [১] পরিধান : 'পাগড়ি' হ'ল পাকানো কাপড়ের প্রস্তুত মাথার আচ্ছাদন বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের (১৯৪২) 'রঙরেজিনী' কবিতাটিতে পাগড়ির বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য; কাহিনী মূলক কবিতাটিতে দেখি, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শঙ্করলালের পাগড়িতে উৎকীর্ণ শ্লোকের একটি চরণ তাঁর আত্মম্ভরিতার সূচক। রাজবাড়িতে আসন্ন তর্কযুদ্ধ উপলক্ষে ঐ পাগড়ি ধুতে গিয়ে রঙরেজিনী বালিকা আমিনা সেই শ্লোকের চরণটি দেখতে পেয়েছে! শুধু তাই নয়, নিতান্ত বালিকা-সুলভ বুদ্ধিতেই সে ঐ চরণটির সঙ্গে স্বরচিত আর একটি চরণ যোগ

করেছে, যার মধ্য দিয়ে এক গভীর সত্য বাণী উচ্চারিত। যথাসময়ে পাগড়ি নিতে এসে শঙ্কর পাগড়িতে আমিনার সংযোজিত চরণটি দেখে তাঁর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করেছেন। আর এভাবে পাগড়িতে লেখা একটি চরণ এক অহঙ্কারী পণ্ডিতকে হৃদয়ের গভীর সত্য উপলব্ধিতে উপনীত করে তাঁর চরিত্র পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের একটি কবিতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহ-নির্মাণে 'পাগড়ি'-র প্রয়োগ লক্ষণীয়,—'হিন্দু-মুসলমানে হয়ে গেছে উষ্ণীষ বিনিময়,/ পাগড়ি বদল ভাই-/সে আদরে সোদরে অধিক হয়' [ঝোড়ো হাওয়ায় : কুহু ও কেকা (১৯১২), সত্যেন্দ্রনাথ]।

আবার চেতন ও জড়ের পারস্পরিক মিলন—রূপান্তরের রূপকার্থেও 'পাগড়ি-বিনিময়' প্রযুক্ত,—''চেতন-জুড়ে না হয় হবে পাগড়ি-বিনিময়'' (ঝোড়ো হাওয়ায় : ঐ)।

এছাড়া, কখনো কাহারদের বর্ণনা প্রসঙ্গে (দ্রষ্টব্য—৬ সংখ্যক কবিতা : ছড়া : রবীন্দ্রনাথ), কখনো বা চাপরাসীর চিত্রাঙ্কন সূত্রে [দ্রষ্টব্য-মতি চাপরাসী : ত্রিযামা (১৯৪৯) : যতীন্দ্রনাথ]; কিংবা পুলিশের প্রতীকার্থে [দ্রষ্টব্য—বিয়েবাড়ির মজা : মিঠেকড়া : (১৯৫১) সুকান্ত] 'পাগড়ি'র উল্লেখ নানাস্থানে মেলে। সাধারণত হিন্দুদের বিবাহানুষ্ঠানে বরের মাথার শোলার টুপি বিশেষ 'টোপর' নামে পরিচিত। কবিতায় বিবাহ বর্ণনা সূত্রেই টোপরের সাক্ষাৎ লভ্য,—'সোলার চড়া টোপর পরা/ঐরে এল বর' [বর : লেখা (১৯০৬) : যতীন্দ্রমোহন]; কখনো মোহিতলালের রোমান্টিক কবিদৃষ্টি আকাশে 'সাদা মেঘের টোপর' [শিউলির বিয়ে : বিস্মরণী (১৯২৬) : মোহিতলাল] দেখে উৎফুল্ল হয়েছে।

কৃষকেরা ক্ষেতে কাজ করার সময় রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে চওড়া কানাওয়ালা এক ধরণের টুপি পরে। এর নাম 'টোকা' বা 'মালুই'। গ্রামবাংলার কৃষকের চিত্রাঙ্কনে সত্যেন্দ্র-কবিতায় এটি ব্যবহৃত,—'টোকায় টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন হাতে কে ওই মাঠে' (ভাদ্রশ্রী : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ)।

জসীমউদ্দিনের কবিতায় পশু-কথার প্রয়োগ-সূত্রে দেখি—'শিয়াল চলে শ্বশুর বাড়ি মালুই মাথায় দিয়ে' [সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৪১) : জসীমউদ্দিন]। এখানে কৌতুকময়তা সৃষ্টিই কবির উদ্দেশ্য।

'কামিজ' এক ধরণের ঢিলা জামা বিশেষ। কবিতায় তা কখনো ন্যুনতম প্রতিরোধের প্রতীক,—'অঘ্রাণ হিমের দিনে ততোধিক মিহিন কামিজে/কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ' (বিভিন্ন কোরাস এক : মহাপৃথিবী : জীবনানন্দ) ; 'অঘ্রাণ' হলেও 'হিমের দিন' এখানে আধুনিক যুগের নানা বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী ; 'গিরেবাজ' হল যুগের বিপর্যস্ত মানুষ, আর সেই সূত্রে 'মিহিন কামিজ' এই বিপর্যয়ের প্রতিরোধক রূপে গৃহীত।

কখনো 'আধবুড়ো হিন্দুস্থানী'-র ছবি আঁকতে রবীন্দ্রনাথ তার গায়ে ফতুয়া জাতীয় ছোট 'মেরজাই' চাপিয়ে দিয়েছেন (একজন লোক : পুনশ্চ : রবীন্দ্রনাথ)।

'মেখলা' স্ত্রী-লোকের কটিবস্ত্র বিশেষ। চিত্রকল্প রচনাসূত্রে 'মেখলা' কবিতায় প্রযুক্ত,--'রঙীন মেখলা পরিয়া চলেছি আশা দিতে ফুল দলে' (মেঘের কাহিনী : বেণু ও বীণা : সত্যেন্দ্রনাথ)। আবার অন্যত্র দেখি, দেহবাদী মোহিতলাল নারীকে 'বেদনার বিষহরি' কল্পনা করে তার কাছে মৃত্যুকে 'মঞ্জীর মেখলা' [নারী স্তোত্র : স্মরগরল (১৯৩৬) : মোহিতলাল] রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন ; কখনো বা "মেখলা"-য় বিশেষ সূত্রে মানবিকতার গুণ আরোপিত। ভারতের নানা স্থানের মন্দিরে প্রাচীনকাল থেকে দেবদাসী প্রথা প্রচলিত। দেবতার সেবা করাই দেবদাসীদের প্রধান কাজ ; কিন্তু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এদের নানা ভাবে স্ব স্ব স্বার্থে ব্যবহার করে। স্বভাবতই নানা ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত এ দেবদাসীদের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির কোনো মূল্য দেওয়া হয় না।

তাই মানবতাবাদী মোহিতলালের মনে হয়েছে, সমাজে দেবদাসীদের 'মমতা' হ'ল 'মোহ', প্রণয় একান্তই 'পাপ', তারা যদি কোন ব্যক্তিকে যথার্থ ভালোবাসে তবে তা-ও এক অসম্ভব ব্যাপার হবে,—'কটির মেখলা মূক হয়ে যাবে/নূপুরে বাজিবে বাধা' (দেবদাসী : ঐ)।

আলোচ্য কাল-পর্বের কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যপুষ্ট বিচিত্র শাড়ির সম্ভার লক্ষণীয়।

দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার গতানুগতিকতায় ক্লান্ত যতীন্দ্রনাথ অন্তত একদিন মুক্ত-আনন্দ লাভের আহ্বান জানালেন কবিতায়,--"মলিন আট-পৌরে ছাড়ি'/যে যার পোশাকী সাজে/একদিন সাজিয়া আসুক" (উৎসব : ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ)। 'আটপৌরে শাড়ি' (গৃহে রমণীদের সর্বক্ষণের

পরিধেয় শাড়ি) এখানে গতানুগতিক জীবন-যাপনের ক্লান্তিঅবসাদের ইঙ্গিতবাহী।

আবার, ব্যস্ত শহরের সংকীর্ণ এক গলিতে থেকেও যখন 'সন্ধ্যায়-সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান', তখন 'সদাগরী আফিসের' কেরানীর মনোলোকে চিত্রিত হয় শান্তস্নিগ্ধ এক বঙ্গ-গৃহবধুর সজীব মূর্তি,—'আঙ্গিনাতে যে আছে অপেক্ষা করে, তার/পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর' (বাঁশি : পুনশ্চ : রবীন্দ্রনাথ)। রোমান্টিক আবহ-নির্মাণে 'ঢাকাই শাড়ি' এ স্থলে সার্থক ভূমিকা-সম্পন্ন।

অনুরূপ কারণে জসীমউদ্দিনের কাব্যে বিচিত্র শাড়ি উল্লিখিত। সেখানে বিদেশ যাত্রাকালে নায়ক তার প্রেমিকাকে বিদেশ থেকে 'কলমী-লতা', 'বালুচরী', 'জলেভাসা' ও 'কেলি-কদম শাড়ি' (সোজন বাদিয়ার ঘাট : জসীমউদ্দিন) এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নায়িকারও আশা, প্রেমিক 'সোজন' তার জন্য বিদেশ থেকে 'মধুমালা শাড়ি' (ঐ) আনবে।

উপমা-সূত্রে একাধিক স্থানে শাড়ি আগত। 'কৃষ্ণকলি' ফুলের বিচিত্র বর্ণের বর্ণনায় দেখি, 'কাহারো পরণে জর্দা-তসর কাহারো বা রাঙা চেলি' (কৃষ্ণকেলি : ফুলের ফসল : সত্যেন্দ্রনাথ)। নারকেল গাছের সবুজ পাতার সাদৃশ্য-সূত্রে 'সবুজ শাড়ির শ্যামল শোভা'-ও (অনুরাগ : পাঞ্চজন্য : যতীন্দ্রমোহন) লক্ষণীয়।

এছাড়া নিছক বর্ণনাসূত্রেও বহুস্থানে নানাবিধ শাড়ির উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, 'কল্কাপেড়ে শাড়ি' [মনোহারিকা : ঝরা ফুল : (১৯১১) করুণানিধান], 'রাঙা শাড়ি' (বিচ্ছেদ : ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ) ইত্যাদি।

পুরুষের পরিধেয় 'ধুতি'-ও একাধিক কবিতায় মেলে। ধুতির আবার রকম-ফের আছে। তা কখনো খাটো, কখনো ধোয়া, কখনো বা খদ্দরের। সমাজের এক এক শ্রেণীর মানুষ এক এক রকম ধুতি পরে। যেমন, দরিদ্রের পরণে 'খাটো দেহে খাটো ধুতি' (সন্ধিক্ষণ : বেণু ও বীণা : সত্যেন্দ্রনাথ), বিত্তবানের পরণে দেখি, 'ধোয়াধুতি' (পথের স্মৃতি : কুহু ও কেকা : ঐ)। উল্লেখ্য, উভয়ত্রই বাস্তবতা পরিস্ফুটনে ধুতি গৃহীত। অন্যত্র, প্রবাসী কবি অমিয় চক্রবর্তী দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরে জাতীয় পোষাক তথা 'ধুতি-পাঞ্জাবী' (বিধুবাবুর মতো : মাটির দেয়াল : অমিয় চক্রবর্তী) পরবেন ভেবে উৎফুল্ল হয়েছেন।

কখনো 'খদ্দরের ধুতি' ভণ্ড দেশপ্রেমের ইঙ্গিতবাহী। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকালে এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে দেশপ্রেমিক রূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। এদের দেশপ্রেম শুধু বেশবাস আর শুষ্কবাক্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজ-সচেতন, বিপ্লবমনস্ক কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ এদের স্বরূপ উপলব্ধি করে তাদেরই জবানীতে কবিতায় লিখলেন 'বিড়ি ফুঁকে অতঃপর/পরিয়াছি খদ্দরের ধুতি' (নৈষ্কর্ম দর্শন : দ্বিপ্রহর এবং অন্যান্য কবিতা : বিমলচন্দ্র)।

এছাড়া একাধিক কবিতায় 'ধুতি'-র উল্লেখ লভ্য [যেমন, একজন লোক' (পুনশ্চ : রবীন্দ্রনাথ) 'পথে' (বেণু ও বীণা : সত্যেন্দ্রনাথ) ইত্যাদি কবিতা দ্রষ্টব্য]। 'ঘাঘরা' কোনো কোনো লোকসমাজের নারীদের নিম্নাঙ্গবাস। (যেমন, বেদে রমণীরা ঘাঘরা পরে থাকে)। বাস্তব-বাদী যতীন্দ্রনাথের কবিতায় বেদের সংসারের দারিদ্র্য-চিত্রণে এই লোক-পরিধানটির সাক্ষাৎ মেলে,—'চির হাঘরের ঘরণী রে তুই/ঘাঘরায় দিস তালি' [বেদেনী : সায়ম (১৯৪২), যতীন্দ্রনাথ], 'ঘাঘরায় তালি' দেওয়া এস্থলে দারিদ্র্যেরই সূচক।

যতীন্দ্রমোহনের কাহিনীমূলক একটি কবিতায় বেদেনীর চিত্রে বাস্তবতা-পরিস্ফুটনেও 'ঘাঘরা' ব্যবহৃত, ঘাঘরাটি আঁটা, কেশে বাঁধা জটা, কাঁচুলিটি কসা বুকে' [মজুর : অপরাজিতা (১৯১৩) যতীন্দ্রমোহন]।

ছিন্নবাস-পরিহিতা ভিখারিনীকে দেখে মানবপ্রেমিক যতীন্দ্রনাথ 'কালী মূর্তি' স্মরণ করেছেন। এসূত্রে কালী-র প্রলয়ঙ্করী রূপ বর্ণনায় তাঁর কটিদেশে কর্তিত হাতগুলি 'ঘাঘরা' রূপে কল্পিত,—"মানুষের হাত কাটি'/ঘাঘরা পরেছে আঁটি'/কটির মিটিল বুঝি ক্ষোভ" (ভিখারিনী : সায়ম : যতীন্দ্রনাথ)। বলাবাহুল্য, কবি ভিখারিনীকেও অনুরূপ মূর্তি ধারণে আহ্বান জানিয়েছেন। কখনো রূপদক্ষ সত্যেন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টিতে 'কৃষ্ণকেলি' ফুলের দলগুলি 'ঘাঘরা'-র রূপকে প্রতিভাত,— 'পঞ্চবরণ ঘাঘরিতে সাজি কিশোরী কৃষ্ণকেলি' (কৃষ্ণকেলি : ফুলের ফসল : সত্যেন্দ্রনাথ)।

অনুরূপভাবে, সুকান্ত-র কবিতায় গ্রামের সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ 'ঘাঘরা'-র রূপকে বিধৃত,—'গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস/এ গ্রাম নতুন সবুজ ঘাঘরা পরে' [চিরদিনের : ঘুম নেই (১৯৪৮) : সুকান্ত]।

'ওড়না' হ'ল স্ত্রী-লোকের পরিধেয় পাতলা, স্বচ্ছ চাদর বা উত্তরীয় বিশেষ, এটি নারীদের মুখাবরণও।

রোমান্টিক কল্পনায় 'স্বপুরানীর রাজ্যের রহস্যমেদুর আবহ-নির্মাণে' 'ওড়না'-র ব্যবহার লভ্য। কবির মনে হয়েছে, স্বপুরানীর 'কালো কেশে' 'সন্ধ্যালোকের ওড়না খানি' [স্বপুরানী : নাগকেশর (১৯১৭) : যতীন্দ্র-মোহন] উড়ছে, এর ফলে স্বপুরাজ্যের রহস্যময়তাও ঘনীভূত।

কোথাও বা বর্ষাগমে আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি 'মোহিনীর ওড়নায়' রূপান্তরিত,—'কোন্ মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে' (বর্ষা : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ) ; সত্যেন্দ্রনাথের অন্য একটি কবিতায় জ্যোৎস্নালোকের রূপকার্থে 'ওড়না'-র প্রয়োগ লক্ষণীয়,—'কৌতুকে মিহি চাঁদের সুতায়। ওড়না ওড়ায় কেহ' (মেঘলোকে : ঐ), আবার ফুল-পরীর রাজকন্যার বর্ণনায়—'পরনে তার হাওয়ার কাপড়, ওড়না ওড়ে অঙ্গে' (ফুলের রানী : ফুলের ফসল : ঐ)।

মোহিতলালের অপূর্ব কবি-কল্পনায় গোধূলি বেলা 'রজনীর কালো কেশ' থেকে খসে পড়া 'নেবু রঙা ওড়না'-র (দিন শেষে : স্বপ্নপসারী : মোহিতলাল) রূপকে বিধৃত।

দেবদেবী নামাঙ্কিত উত্তরীয় বিশেষ 'নামাবলী' ও কবিতার পাত্র-নগ্ন হয়েছে। জীবনের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা যতীন্দ্রমোহনের ইতিবাদী কবিমানসটিকেও কখনো কখনো সংশয়ী করে তুলেছিল ; তাই 'রথের সারথি জগতের নাথ-নামাবলী-ঢাকা মুখ' (ব্যর্থ পূর্ণিমা : পাঞ্চজন্য : যতীন্দ্রমোহন) দেখে কবি শঙ্কিত। কারণ, দেবতার মুখের আবরণের আড়ালে কি আছে, কবি সে সম্বন্ধে সন্দিহান। লোকসমাজের নিত্য ব্যবহার্য 'গামছা'-ও [গা-মোছা] কবিতায় স্থান প্রাপ্ত। কোথাও শরত-কালের ছিন্ন মেঘের রূপকার্থে দেখি, আকাশে 'সাদা মেঘের গামছা ভাসে' (কন্যা শরৎ : বিস্মরণী : মোহিতলাল)। কোথাও বা 'বাঙালি বাবু'-র প্রতি কটাক্ষ সূত্রে তার 'নধর দেহে লাল গামছা' (কচুরিপানা : মাটির দেয়াল : অমিয় চক্রবর্তী) পরানো হয়েছে ; আবার কোথাও পথশ্রান্ত পথিকের মতো প্রেমিক 'মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস' [রাখালী (১৯৩০) : জসীমউদ্দিন]। সেই অবসরে প্রেমিকাকে দেখে নেওয়াই যার প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া সাধারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গেও একাধিক স্থানে 'গামছা'-র ব্যবহার মেলে [যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ধ্বনি' (আকাশ প্রদীপ / ১৯৩৯ / গ্রন্থভুক্ত), যতীন্দ্র-নাথের 'শ্যামলীর ট্রাঙ্ক' ('সায়ম/১৯৪১), জসীমউদ্দিনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯), প্রভৃতির কাব্য-কবিতা দ্রষ্টব্য।]

১।(২)[২] অলঙ্কার : লোক-অলঙ্কারের ভাণ্ডারটি যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের নানা অঙ্গের বহুবিচিত্র অলঙ্কারের ব্যবহার লোকসমাজে সুপ্রচলিত। আলোচ্য কাল পর্বের নানা কাব্য কবিতা এসব লোক-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত।

'টিকলি' হ'ল কপালের অলঙ্কার বিশেষ। সত্যেন্দ্রনাথের একটি কবিতায় অলঙ্কারটি জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের রূপকার্থে প্রযুক্ত—'অভ্র-চিকণ টিকলি জলের ঝলমলিয়ে যায় বাতাসে' (ভাদ্রশ্রী : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ), আবার কবির সুবিখ্যাত 'পাল্কীরগান' (ঐ) কবিতাটিতে চিত্রকল্প রচনা সূত্রে 'টিকলি' জাতীয় শিশুদের অলঙ্কার বিশেষ 'পুঁটে' ব্যবহৃত,—'ন্যাংটো খোকা মাথায় পুঁটে'।

নাকের সরু বলয়াকৃতি গহনা বিশেষ 'নথ' নামে সুপরিচিত। লৌকিক ঘরানার কবি জসীমউদ্দিনের কবিতায় দেখি, তরুণ নায়ক এক বালিকার হৃদয়-জয়ে প্রয়াসী, তাই সে 'বাঁশের পাতায় নথ গড়ায়ে গাবের গাঁথি হার' (সোজন বাদিয়ার ঘাট : জসীমউদ্দিন) তার প্রেম নিবেদন করে। ঐ কাব্যেরই অন্যত্র কাহিনী সূত্রে খাজনা অনাদায়ে জমিদারের অত্যাচারী নায়েবের ঘোষিত হুকুম,—'বধূর নাকের নথ কেড়ে আন্—(ঐ), কবির 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যের কাহিনীর একাধিক স্থানে 'নথে'র উল্লেখ মেলে।

'নাকছাবি' নাকের এক পাশে বিঁধোনো লোক-অলঙ্কার বিশেষ। মোহিতলালের 'কন্যাশরৎ' (বিস্মরণী/১৯২৬) কবিতায় কন্যা রূপে কল্পিত শরৎকাল নানা সাজে সুসজ্জিত; তার পায়ের 'চুটকি' হয়েছে দোপাটি ফুল, আর 'সন্ধ্যামণি' হয়েছে 'নাকছাবি'।

শুধু 'সন্ধ্যামণিই' নয়, 'বাবলা ফুল'-ও 'নাকছাবি' রূপে কল্পিত। নজরুলের রোমান্টিক কবিমানস 'রোদ-সোহাগী পউষ-প্রাতে' 'অজানিতার উদাস পরশ পেতে' গিয়ে দেখলেন, তার নাকে যেন 'বাবলা ফুলের নাকছাবি' (অ-কেজোর গান : ছায়ানট : নজরুল)।

'নোলক' হ'ল নাকের আর একটি ঝুলন্ত অলঙ্কার: কখনো বৃষ্টি কামনা করে লোকরমণীরা তাদের প্রিয় অলঙ্কার মানত করে; কবিতাতেও দেখি, অনাবৃষ্টির দিনে বৃষ্টিকে আহ্বান করে লোকরমণীদের প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত,—'নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথায় ছাতি' (নক্সী কাঁথার মাঠ : জসীমউদ্দিন)। উল্লেখ্য, কবিতায় এ ধরণের 'মানত' প্রয়োগ কবির লোকঐতিহ্য-সম্পৃক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা-র প্রভাব বলে মনে

হয়। অন্যত্র, 'নোলক' প্রেমের অভিজ্ঞান-স্বরূপ। সেখানে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে 'কলমী ফুলের নোলক দেবে' (রাখালী : ঐ) বলে স্থির করেছে। প্রসঙ্গত একথা স্বীকার্য, যে, লোক সমাজের নায়কের পক্ষে নায়িকাকে 'কলমী ফুলের নোলক' উপহার স্বাভাবিক ও সার্থক-প্রযুক্ত।

নাকের অলঙ্কার বিশেষ 'বুলক' বা 'বেশর'-ও জসীমউদ্দিনের কাব্যে প্রেমের স্মারক রূপে গৃহীত। বিদেশ যাত্রার পূর্বে প্রেমিকার 'নাকেতে বেশর' নেই দেখে প্রেমিক তাকে 'বুলক' (সোজন বাদিয়ার ঘাট : জসীমউদ্দিন) এনে দেবার আশ্বাস দিয়েছে।

আর এক প্রকার কর্ণাভরণ 'দুল'-এর প্রয়োগও কবিতায় দুর্লক্ষ নয়, কখনো নৃত্যদোদুল ছন্দে কিশোরীর বর্ণনায় দেখি 'কানে জোড়া দুল দেখে তার / ঝুমকোজবা দোলায় দুল' (কিশোরী : ফুলের ফসল : সত্যেন্দ্রনাথ)। 'দুল' জাতীয় এক ধরণের অলঙ্কার 'মাকড়ি'। কোনো কোনো লোকসমাজে নারীদের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরাও এ অলঙ্কারটি পরে থাকে। যতীন্দ্রমোহনের কবিতাতেও সাঁওতাল যুবার কর্ণ-লগ্ন 'মাকড়ি' লক্ষণীয়, তার 'ঝাঁকড়া চুলে পালক-অাঁটা মাকড়ি পরা কানে' (জটাই : অপরাজিতা : যতীন্দ্রমোহন)।

সত্যেন্দ্রনাথের 'পাল্কীর গান' (কুহু ও কেকা' / ১৯১২) কবিতায় বৈরাগীর চিত্রকল্পে বৈষ্ণবদের গলার তুলসী-মালা 'কণ্ঠী' অঙ্কিত,— 'বৈরাগী যে কণ্ঠি বাঁধা। গলার দুপাশের বাঁকা হাড় সদৃশ গলারই লোক-অলঙ্কার বিশেষ 'হাঁসুলি' বা 'হাঁসলি' দ্বিতীয়ার চাঁদের রূপকার্থে ব্যবহৃত। নজরুলের রোমান্টিক কবি মানসে কখনো মনে হয়েছে, 'সই' ধরণীর জন্য 'আকাশ এনেছে.. / দ্বিতীয়া চাঁদের হাঁসুলি' [রাখী বন্ধন : সিন্ধু হিন্দোল (১৯২০) : নজরুল]। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, জসীমউদ্দিনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' উভয় কাব্যেরই নায়ক তাদের নায়িকাকে 'হাঁসুলি' উপহার দিয়েছে।

যতীন্দ্রমোহনের কাহিনীমূলক কবিতা 'জটাই'-এ (অপরাজিতা/১৯১৩) সাঁওতাল যুবার গলায় "পলার মালা' চোখে পড়ে।

কোথাও 'নতুন পৈচি বাজুবন্দ পরে' চাষার বৌ কথা কয় না গুমোরে' [অঘ্রাণের সওগাত : জিঞ্জীর (১৯২৮) : নজরুল]। 'চাষার বৌ'-এর চিত্রটিতে লোকরমণীদের মনস্তত্ত্বটি যথার্থ বিবৃত।

বলয়াকৃতি হস্তালঙ্কার 'কাঁকন' আলোচ্য কাল-পর্বের কাব্য কবিতার নানা স্থানে লভ্য।

'পশ্চিমের সহর' থেকে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের চিত্রে দেখা যায়, 'বারান্দায় রূপোর কাঁকন পরা ভজিয়া / গম ভাঙছে জাঁতায়...' (স্মৃতি : পুনশ্চ : রবীন্দ্রনাথ)। রোমান্টিক আবহ রচনায় কাঁকনের বিশিষ্ট প্রয়োগ একাধিক কবিতায় লভ্য। যেমন, প্রিয়ার বিদায়-লগ্নে তাঁর দেওয়া কাঁকন দুটি হাতে না দেখে রবীন্দ্রনাথ বিষণ্ণ হয়েছেন। কারণ প্রিয়াকে দেওয়া সেই কাঁকন দুটি ছিল কবির প্রেমের স্মারক, তাই তাঁর আক্ষেপ, 'কাঁকন দুটি দেখি নাই তো হাতে। হয়তো এলে ভুলে' [দান : পূরবী (১৯২৫) : রবীন্দ্রনাথ]। কখনো কবির রোমান্টিক চেতনায় তাঁর মানস প্রিয়ার কাঙ্ক্ষিত বাস্তব-উপস্থিতির প্রতীক হয়েছে 'কাঁকন', সেই মানস-সুন্দরীর কাছে কবির আবেদন,—'আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,/এনো সচকিত কাঁকনের রিণি রিণ্' [নিমন্ত্রণ : বীথিকা (১৯৩৫) : রবীন্দ্রনাথ]। অনুরূপ ভাবে 'কাঁকন' অন্যান্য কোনো কোনো কবির কবিতায় ব্যক্তি-উপস্থিতির ইঙ্গিতবাহী। যেমন, যতীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিমূর্ত বিরহ-বেদনা 'কাঁকণ' অবলম্বনে মূর্ত হয়েছে,—'চলিয়াছ বাঁধি মোরে / ....কাঁকন বাজায়ে কোন্ নূতনের আশ' (বরনারী : সায়ম : যতীন্দ্রনাথ)। আবার অলীক স্বপ্নময় কল্পনায় 'সাত সাগরের ঘূর্ণি হাওয়ার বুকে' প্রবালদ্বীপের মায়াময় রাজ্যে জীবনানন্দ শুনেছেন,—'মূক মায়াবিনী-র কাঁকন শুধু বাজে' [সাগর বলাকা : ঝরা পালক (১৯২৮) : জীবনানন্দ], এভাবেই অন্যত্র কাঁকন অতীতের রূপকথাময় জগতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এনেছে, 'যেইখানে একদিন শঙ্খমালা মাণিকমালার / কাঁকন বাজিত, আহা, কোন দিন বাজিবে কি আর (৪ সংখ্যক কবিতা : রূপসী বাংলা : ঐ) ; দারিদ্র্যপীড়িত, রিক্ত গ্রাম-বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে কবির এ দীর্ঘশ্বাস 'কাঁকন'-কে এখানে অতীত-সমৃদ্ধির সূচক রূপেও চিহ্নিত করেছে।

বলয়াকৃতি সরু হস্তালঙ্কার 'চুড়ি'-ও নানা কবিতায় মেলে। 'চুড়ি'-র আবার বৈচিত্র্য আছে, তা কখনো গালার, কখনো কাঁচের, কখনো বা অন্য কোন উপাদানে গড়া।

সাঁওতাল মেয়ের চিত্রে সজীবতা পরিস্ফুটনে তার হাতের 'গালার চুড়ি'-র উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মেলে,—' '..দু-হাতে তার সাদা রঙ কয় জোড়া/গালা চালা চুড়ি' (সাঁওতাল মেয়ে : বীথিকা : রবীন্দ্রনাথ)।

ব্যক্তি-উপস্থিতির দ্যোতনা সৃষ্টিতেও চুড়ির বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষণীয়। স্মর্তব্য, রোমান্টিক আবহ-নির্মাণ সূত্রেই চুড়ির এ ধরণের ব্যবহার।

যতীন্দ্রমোহনের 'বেড়ার আড়াল' (পাকস্থলী'/১৯৪১) কবিতায় লভ্য। সামান্য বেড়ার ব্যবধানে দুটি কুটির। একটিতে কবির, অন্যটিতে অন্য এক পরিবারের বাস। সে পরিবারের এক তরুণীকে কবি মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছেন। তাই নিজের কুটিরে বসেই তরুণীর কন্ঠস্বর, তার নানা কাজকর্মের শব্দ শুনে তিনি নানা 'কল্পনার জাল' বুনে চলেন। এমন কি, 'কাঁচের চুড়ির আওয়াজটি কার বাসন-মাজার কাজে' তা বুঝতেও কবির অসুবিধা হয় না। 'কাঁচের চুড়ির আওয়াজ' এ কবিতায় কবিচিত্তে রোমান্টিক প্রেমোন্মেষের দ্যোতিনা সৃষ্টি করেছে।

কবির অন্য একটি কবিতায়, 'রেশমি চুড়ি' স্বামীর প্রেমের অন্যতন স্মারক রূপে চিহ্নিত। সেখানে এক গ্রাম্য বধূ তার 'দশ গাছা করে দুহাতের রেশমি চুড়ি' (অপরাধিনী : ঐ) ভেঙে যাওয়ায় বিষণ্ণ হয়েছে, কারণ তার স্বামী চুড়িগুলি 'মেলা হতে সবে এই তো সেদিন এনেছে বাজার চুঁড়ি' (ঐ)। কোথাও বা ঝরণার শব্দ শুনে কবির মনে হয়েছে, 'বালা আর চুড়িতে বাজে শিলনুড়িতে' [ঝরণা ধারা : নীহারিকা : (১৯২৭) : ঐ]। এছাড়া বহু কবিতায় 'চুড়ি'-র উল্লেখ পাওয়া যায়।

'নোয়া' হ'ল লোহার চুড়ি বিশেষ। এটি হিন্দু রমণীদের আয়াতির চিহ্ন-স্বরূপ। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুতে হিন্দু-বধূকে 'নোয়া' ত্যাগ করতে হয়। প্রচলিত এ লোকাচারটির প্রভাবে কবিতায় 'নোয়া' কোনো কোনো স্থানে স্বামীর প্রতীকে পরিণত।

যতীন্দ্রমোহনের 'প্রাচীনার প্রলাপ' (মহাভারতী) কবিতার কাহিনীতে দেখি, নিতান্ত অল্পবয়সে মেয়ের স্বামী মারা গেলে, প্রাচীনা জননীর খেদোক্তি,— '..একটা তো ঐ মেয়ে—/তাও বিধবা—ফিরে' এলেন হাতের নোয়া খেয়ে'। লক্ষণীয় বাস্তবতা পরিস্ফুটনে 'স্বামীর মৃত্যু' অর্থে এখানে 'নোয়া খাওয়া'র প্রচলিত লোক-বাক্‌ভঙ্গীটি গৃহীত।

আয়তিকে তার স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা করে আশীর্বাদ-প্রসঙ্গেও 'নোয়া'-র উল্লেখ লভ্য। আধুনিক নগরীর বুকে যান্ত্রিকতার ব্যাপক বিস্তারে ব্যঙ্গপ্রবণ যতীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হউক হাতের নোয়া অক্ষয়,/ সীমন্তে জ্বল জ্বল জ্বলুক রুদ্রানল/শুভসিন্দুর মৃত্যুঞ্জয়' (লৌহনগরী : ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ)। বলা বাহুল্য, নগরীকে নারী কল্পনা করে যান্ত্রিকতার এই সর্বগ্রাসী বিস্তারকে কবি রেলগাড়ীর প্রতীকে গ্রহণ করে তাকে 'নোয়া'র রূপকে পরিস্ফুট করেছেন।

করুণানিধানের 'নবযুব মৃত্যু' (ঝরাফুল' গ্রন্থভুক্ত) কবিতাটিতে সংসার-বন্ধনের রূপকার্থে 'লোহার বলয়' (নোয়া) করুণ মূর্ছনা সৃষ্টিতে সার্থক ভূমিকাসম্পন্ন। শর্ত অনুযায়ী বধূর পিতা পণ দানে অসমর্থ হওয়ায় তরুণী বধূ নবযুকে নানা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। 'লোহার বলয়' তার কাছে নিদারুণ শৃঙ্খলে পরিণত; অবশেষে লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে 'ফাঁকি দিল বালা লোহার বলয়'। কবিতাটিতে কবির পণ প্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতনতাও প্রকাশিত হয়েছে। পলার বা গালার সরু চুড়ি বিশেষ 'রুলি'-ও হিন্দু-রমণীদের আয়তির চিহ্ন। বঙ্গ-বধূর চিত্র রচনায় তাই তার হাতের 'রাঙা রুলি দুটি' (বঙ্গবধূ : নাগকেশর : যতীন্দ্রমোহন) বাদ পড়ে নি।

কখনো 'রুলি' আপাত অর্থে স্বামীর প্রতীক হলেও মূলত আনন্দ ঐশ্বর্যেরই ইঙ্গিতবাহী। 'বাসর রাত্রির বধূ' আজ তার সর্বস্ব হারিয়ে কঙ্কালের মতো নিঃস্ব রূপে প্রতিভাত। কবির মনে হয়েছে, তার 'নরম নালিমা/জ্বলে গেছে,—নগ্ন হাত,—নাই শাঁখা,—হারায়েছে রুলি' (ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল : ঝরা পালক : জীবনানন্দ); সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে যুগের আনন্দ, ঐশ্বর্যহীনতার ইঙ্গিত এখানে উল্লিখিত 'শাঁখা' ও 'রুলি'র অভাবে দ্যোতিত।

'শাঁখা' হ'ল বিবাহিতা স্ত্রী-লোকের শঙ্খ-নির্মিত বলয়াকৃতি হস্তালঙ্কার বিশেষ, বঙ্গরমণীদের কাছে শাঁখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ আয়তি-চিহ্ন। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গনারীদের অন্যান্য আয়তি-চিহ্ন-এর মতো এটিও ত্যাগ করতে হয়।

পূর্বে প্রচলিত 'সহমরণ' নামক নিষ্ঠুর প্রথাটির চিত্র-ও করুণ রসের আধারে সত্যেন্দ্রনাথের 'সহমরণ' কবিতায় (বেণু ও বীণা) পরিবেশিত। বর্ণনা সূত্রে এখানেও শাঁখার উল্লেখ পাই।

ভিন্ন প্রসঙ্গে শাঁখার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। গতানুগতিক কাব্যচর্চায় বীতশ্রদ্ধ যতীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, যথার্থ কবির অভাবে 'সদ্য বিধবা কবিতার আজ/শাঁখা-ভাঙা উৎসব' (সদ্য বিধবা : ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ)।

বিষণ্ণ রোমান্টিক জগতের আবহ-সৃষ্টি-কল্পে জীবনানন্দের কবিতায় 'শাদা শাঁখা' মানবিক গুণ সম্পন্ন,—'দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—সাদা শাঁখা ধুসর বাতাসে/শঙ্খের মতো কাঁদে' (২ সংখ্যক কবিতা : রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ)।

কটি দেশের রৌপ্যালঙ্কার 'গোট'-ও কবিতায় অনুপস্থিত নেই। শরৎকালকে কন্যারূপে কল্পনা করে মোহিতলালের মনে হয়েছে, সে যেন 'ঘোট পরেছে অপরাজিতার' (কন্যা শরৎ : বিস্মরণী : মোহিতলাল)। লোকরমণীর বলয়াকৃতি পদালঙ্কার বিশেষ 'খাড়ু' নামে অভিহিত। লৌকিক ঘরানার কবি জসীমউদ্দিনের কাব্য-কবিতায় একাধিক স্থানে এ লোক অলঙ্কারটি উল্লিখিত। যেমন, কবির 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে গ্রাম্য তরুণীর 'দুই পায়েতে কাঁসার খাড়ু' অলঙ্কৃত; সেখানে 'গোল খাড়ু'-ও উল্লিখিত। তাঁর 'রাখালী' কাব্যেও নায়িকার 'বর্ণনায় খাড়ু' প্রযুক্ত।

আবার মোহিতলালের 'স্মরগরল' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় 'মধু ঋতুর সঙ্গে মাধবের সখা এসে কবির দুয়ারে দাঁড়ালে—'নাচে চারিভিতে কলাবধূদল-পায়ে বাজে পাঁয়জোর'। বলা বাহুল্য, পায়েরই অলঙ্কার বিশেষ 'পায়জোর' এখানে আনন্দ মুখরতার ইঙ্গিতবাহী।

১। (২) [৩] প্রসাধনী : সিঁদুর হিন্দু বাঙালী সমাজে নারীদের সধবাত্বের প্রধানতম স্মারক ; এ সমাজে সধবা রমণীরা মাথার সিঁথিতে সিঁদুর লাগান। সাধব্যের প্রতীক এই সিঁদুর-চিহ্ন স্ত্রী মহলে অতি পবিত্র ও সমাদৃত প্রসাধনী।

শুধুমাত্র লোকসমাজেই নয়, 'বঙ্গবধূ' মাত্রেই তার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখতে চায়। এই চাওয়ার আবার দু'দিক আছে। প্রথমত, স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা ; দ্বিতীয়ত, তার নিজের সধবা অবস্থায় মৃত্যুর ইচ্ছা।

রবীন্দ্রনাথের 'ফাঁকি' [পলাতকা (১৯১৮)] কবিতায় মৃত্যুপথযাত্রিনী স্ত্রী তার স্বামীকে বলেছে, 'শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম/বৈকুন্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথির 'পরে নিত্য সিঁদুর সম।' মুমূর্ষু বিনুর আমৃত্যু 'আয়তি' থাকার বাসনা কবিতাটিতে করুণ সুরের আবহ সৃষ্টিতে সার্থক-প্রযুক্ত।

বার্ধক্যে উপনীত কবি 'সাবিত্রী' (পূরবী) কবিতায় অনুভব করেছেন, যে তাঁর সৃষ্টির স্রোতোধারা ক্রমশ ক্ষীয়মান। তাই তাঁর আকুল প্রার্থনা 'সীমন্তে গোধূলি লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর'। উল্লেখযোগ্য, 'সন্ধ্যার সিন্দুর' এখানে নিত্য নূতন সৃষ্টির উচ্ছ্বচ্ছ্বাসের রূপক। বলা বাহুল্য, গোধূলির রক্তিম আভাও এখানে 'সিঁন্দুর' ব্যবহারে প্রতিভাত।

করুণা নিধানের 'ভাববধূ' (প্রসাদী/১৯০৪) কবিতাটিতেও সিঁদুরের রূপকে গোধূলির আকাশের রক্তবর্ণ চিত্রিত,—'সাঁজের সিঁদুর ঢালি

দিগন্তের ক্রোড়ে'''; 'রূপস্নান' কবিতায়ও অনুরূপ প্রয়োগ লভ্য,—'লালে লাল পশ্চিম আকাশ/তপ্তসোনা সিন্দুরে হিঙ্গুলে' (বেণু ও বীণা : সত্যেন্দ্রনাথ) ; আবার 'সূর্যোদয়'-এ জলে প্রতিফলিত সূর্যালোক দেখে যতীন্দ্রমোহন তার বর্ণনা দিলেন,—'জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূর্য্যি পূর্বে (খেয়াডিঙি : রেখা/১৯১০)। কাব্যসৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে সিঁদুর এখানে বিশিষ্ট ভূমিকাসম্পন্ন।

'দুখবাদী' কবি যতীন্দ্রনাথ বিশ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে রাজী নন, তাঁর কাছে এ সৌন্দর্য নিছকই প্রহসনসম : কারণ তার আড়ালে জগত সংসারের নানা অসংগতি, বিকৃতি বিদ্যমান। তাই কবির স্বগতোক্তি-তেলে সিন্দূরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়' (দুখবাদী : মরুশিখা :)। উল্লেখযোগ্য, 'সুনীল আকাশ,' 'স্নিগ্ধ বাতাস,' 'বিমল নদীর জল' কবির কাছে এ কবিতায় 'তেলে সিন্দূরে' আঁকা ছবিতে প্রতিভাত।

দাম্পত্য প্রেমে রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি-সূত্রে যতীন্দ্রমোহন কল্পনা করেন, 'সীমন্তে সিঁদুর আঁকি বধূবেশে প্রেম আসে' (মিলন মঙ্গল : লেখা)। অনুরূপ সূত্রে যতীন্দ্রনাথের কবিতায় 'সিঁদুর' গৃহীত,—'সিঁথির সিঁদুর উজলিয়া তুলি/মধু যামিনীর স্মৃতি' (শুভ ফাল্গুনী : সায়ম)। লক্ষণীয়, 'সিঁদুর' এখানে স্মরণোপমা অলঙ্কার-সৃষ্টিতেও সার্থক।

বর্ণসচেতন কবি জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় লিচুর অনুষঙ্গে 'সিঁদুর' আগত। যেমন, 'দুপুরে ঘাসের বুকে সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু' (১৯ সংখ্যক কবিতা : রূপসী বাংলা) ইত্যাদি।

গ্রামবাংলার গৃহবধূর চিত্রকল্প রচনার অন্যতম অনিবার্য উপাদান সিঁদুর। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'বাঁশি' কবিতাটিতে জনাকীর্ণ শহরের কর্মব্যস্তার মধ্যেও সদাগরী আফিসের কনিষ্ঠ কেরাণীর চোখে ভেসে ওঠে, তার জন্য অপেক্ষমান বঙ্গবধূর মূর্তি যার 'পরণে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর'।

এছাড়া, মেঘকে মেয়ে কল্পনা করে তার উদ্দেশে বৃষ্টির কামনায় গ্রামবাসীদের মানত, 'কৌটে ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়' (নকসী কাঁথার মাঠ : জসীমউদ্দিন)। বলা বাহুল্য, এ বৃষ্টি কামনায় জীবনের স্বচ্ছলতার কামনাই অভিব্যক্ত। সিঁদুর উপহার দেবার প্রতিশ্রুতিতে কৃষিকর্মের সঙ্গে লোকরমণীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটিও উপলব্ধি করা যায়।

তবে সমাজ সচেতন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় 'সিঁদুর' প্রচলিত 'আয়তি-চিহ্ন' রূপে গৃহীত হলেও তার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য

অনস্বীকার্য। বনতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত গ্রামের বর্ণনায় দেখি, 'পথের দুধারে বাসা বেঁধেছে কঙ্কাল.' তাই 'শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছা / এয়োতির আরাধ্য সিঁদুর (এই আশ্বিনে : চিত্রকূট / ১৯৪১।) সৃষ্টি করেছে বিষাদ করুণ মূর্চ্ছনা।

নারীর কপালের শোভাবর্ধক প্রসাধনী 'টিপ'-এর উল্লেখ বহু কবিতায় মেলে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু ও বিষয় টিপের রূপকাবরণে বিধৃত। নিদর্শন-স্বরূপ,—সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় 'সিংহল দ্বীপ' 'সিঁদুর টিপ' (পথের স্মৃতি : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ) রূপে কল্পিত আবার নজরুলের 'রাখীবন্ধন' ('সিন্ধু হিন্দোল') কবিতায় তারকা'রা আকাশের' টিপ'-এ পরিণত ; অন্যত্র কবি 'উষার ললাটে সিঁন্দুর টিপ' (বধূবরণ : ঐ) দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

কখনো স্মৃতির কপালে 'টিপ' রচনা করে যতীন্দ্রনাথ অতীত স্মৃতি-চারণ করেন,—'অন্ধকারে রচি টিপ স্মৃতির কপালে' (শপথ ভঙ্গ : ত্রিযামা)। বলা বাহুল্য, কাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টিই এসব ক্ষেত্রে 'টিপ' ব্যবহারের কারণ।

রোমান্টিকতার প্রকাশ সূত্রে কবিতায় 'টিপ' এর প্রয়োগ মেলে। প্রেয়সীর প্রতি গভীর আকর্ষণের বর্ণনায় দেখি, 'কাঁচপোকা মেরে যেমন করে টিপ করে' [চোখের দেখা : স্বপন পসারী (১৯২১) মোহিতলাল] 'নারী কপালে পরে', অনুরূপ ভাবে প্রেমিকা কবির হৃদয় হরণ করে তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে।

গ্রামবাংলার প্রতি গভীর প্রীতি পরিস্ফুটনে করুণা নিধানের আঁকা 'বঙ্গনারী'র চিত্রকরে তাদের 'কারও বা কপালে কাঁচ পোকা টিপ' (বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত : ঝরাফুল : করুণানিধান) শোভা পায়।

'মুক্তি ঘুম' (মরুমায়া ১৯৩০) কবিতায় যতীন্দ্রনাথ মানব-মুক্তির প্রতিবন্ধকতা উপলব্ধি করে নিদ্রাকেই শ্রেয় বিবেচনা করেছেন, কবি বলেছেন, 'তাই আমি যারে ভালোবাসি তারে পরাই ঘুমের টিপ'।

চোখের প্রসাধনী বিশেষ 'কাজল' আলোচ্য কাব্য-কবিতায় সাধারণতঃ উপমারূপেই সমাগত। যেমন, 'কাজল-চোখে' [নতুন কাল : সেঁজুতি (১৯৩৮) : রবীন্দ্রনাথ], 'হাসির কাজল' (প্রথম হাসি : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ), ইত্যাদি।

'সুর্মা হ'ল কাজলেরই মতো এক প্রকার রসাঞ্জন-চূর্ণ : যতীন্দ্রমোহনের 'বিরাগী' (অপরাজিতা) কবিতায় তা জীবনের আনন্দ-আকর্ষণের ইঙ্গিত-বাহী। সংসারে নানা কারণে আশাহত কবির দীর্ঘশ্বাস,—'অন্ধনয়নে সুর্মাকে আঁকে, / তারহীন-কে সে রাখে সে তার'।

বঙ্গ-রমণীর রক্তবর্ণ তরল পদ-প্রসাধনী বিশেষ 'আলতা' একাধিক কবিতায় ব্যবহৃত। যতীন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টিতে সমকালীন 'ছন্দ-লোভী' কবিদের কাব্য-কবিতায় 'বাস্তবের অপলাপ' উপলব্ধি করে তাঁদের উদ্দেশে তীক্ষ্ম বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন এই ব'লে,--' 'গোলাপ জলে আলতা গুলি' / আকাশে দিস্ আলপনা' (ভাঙা বছর : ত্রিযামা:)। এখানে 'গোলাপ জলে' ও আলতা সহযোগে 'আলপনা' অন্তঃসার শূন্য, বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ কাব্যচর্চার দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

রূপদর্শী সত্যেন্দ্রনাথের 'কিশোরী' কবিতায় ('ফুলের ফসল' / ১৯১১) 'কিশোরী'র রূপে প্রকৃতিজগত অনুপ্রাণিত, তাই সেখানে তার 'আলতা পরা পায়ের লোভে কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল'।

প্রত্যুষের রক্তিম আকাশের রূপকাথে 'আলতা' একাধিক কবির কবিতায় মেলে। যেমন, ভোরের আকাশের বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আকাশকে উষারাণী আসি আলতা পরায়' (নীলকমল : ঐ). একই প্রসঙ্গে জসীমউদ্দিনের কল্পনায় উষাকালীন আকাশ যেন 'আলতা ছোপানো পায়ের আধর' (সোজন বাদিয়ার ঘাট)।

১। (২) [৪] শয্যাদ্রব্য : আলোচ্য কাল-পর্বের কাব্য-কবিতায় 'সিঁদুর কৌটা', 'চিরুণী', 'আয়না', 'গুজিকাঠি' প্রভৃতি শয্যাদ্রব্য চোখে পড়ে।

আগেই দেখেছি, 'সিঁদুর' হিন্দু-রমণীদের শ্রেষ্ঠ আয়তি-চিহ্ন। এ সূত্রে 'সিঁদুর কৌটা'-রও অনুরূপ অর্থে প্রয়োগ লক্ষণীয়। নবদম্পতির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ,--'তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা / অক্ষয় হয়ে থাক সিঁদুরের কৌটা' (পরিণয়মঙ্গল : প্রহাসিনী), বলা বাহুল্য, সিঁদুর এখানে দাম্পত্য জীবনেরই প্রতীক। আশীর্বাদের লৌকিক বাকভঙ্গিটিও এখানে লক্ষণীয়।

জসীমউদ্দিনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে 'সিঁদুর কৌটা' অব-লম্বনে অপূর্ব রোমান্টিক প্রেমানুভূতি প্রকাশিত। প্রেমিকাবধূ তার স্বামীকে হৃদয়ে একান্ত 'আপন' করে রাখতে চায়। বিবাহিতা রমণীর কাছে সিঁদুর হ'ল সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু, কারণ তা 'আয়তি-চিহ্ন'। তাই তার মনের বাসনা--'সোজনেরে সে যে লুকাইয়া রাখে সিঁদুর কৌটা ভরে'।

কেশবিন্যাস-সহায়ক সরঞ্জাম চিরুণীও কবিতায় অনুপস্থিত থাকে নি। অন্তত যতীন্দ্রমোহনের একটি কবিতায় তার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। সেখানে বিবাহযোগ্যা অথচ কৃষ্ণবর্ণা বলে অবিবাহিতা একটি মেয়ের নিরানন্দ মানসের পরিস্ফুটনে চিরুণীর কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়।

মেয়েটিকে তার বিধবা মা চুল আঁচড়ে দিয়েছেন। উভয়েই নিরানন্দ, নীরব,—'কথা যাহা কিছু--চিরুণী ও কেশে, দোঁহে চুপ করে থাকে' (আইবুড়ো কালো মেয়ে : পাঞ্চজন্য)। এ নির্বাক পরিবেশে চিরুণী ও কেশের সবাক ভূমিকা 'আইবুড়ো কালো মেয়ে'--র প্রেমাভাব-জনিত বিষণ্ণতার মাত্রা সৃষ্টিতে সার্থক।

'আয়না' (আর্শি / আরসি) একাধিক কবিতায় মাত্রান্তর সৃষ্টিতে সার্থক ভূমিকা-সম্পন্ন। তা কখনো আত্ম-সমীক্ষার প্রতীক। আধুনিক যুগ যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত মানুষ নিয়ত তার অন্তঃসার শূন্যতা গোপনে প্রয়াসী। এভাবে সে নিজেকেই প্রবঞ্চিত করে। তাই আত্ম-সমীক্ষায় সে সন্ত্রস্ত, 'ভয় পায় / আয়নায় তার ছবি দেখে' [পরস্পর : ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) জীবনানন্দ]। অন্যত্র, দূর অতীতের ইঙ্গিতবাহী রূপে 'আরশি'— উল্লিখিত,-পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে একা / বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা / রূপসীর সাথে এক,--' (সিন্ধুসারস : মহা-পৃথিবী : ঐ), 'মায়াবীর আরশি' এক্ষেত্রে সমকালীন যুগের বিধ্বস্ত রূপের বিপরীত মেরুর এক সৌন্দর্যময় কল্পলোকের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

আবার, আকাশ-প্রতিবিম্বিত 'পুকুর' 'ছোটো জলের আয়না'-র [পুকুর : খসড়া (১৯৩৬) অমিয় চক্রবর্তী] রূপকে বিধৃত। এছাড়াও অন্যত্র সাধারণ বর্ণনায়--'আয়না'-র উল্লেখ মেলে।

১। (৩) গৃহস্থালী দ্রব্য : আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতায় নানা স্থানে হাঁড়ি-কড়া থেকে শুরু করে কাঁথা-ছেঁড়া কম্বল প্রভৃতি বহুবিধ গৃহস্থালী দ্রব্যের বিচিত্র প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। বিচার-বিশ্লেষণ-এ দেখা যাবে, কাহিনীমূলক কাব্য-কবিতাতেই গৃহস্থালী দ্রব্যের প্রয়োগ আধিক্য। বাস্তবতা পরিস্ফুটনই যার প্রধান লক্ষ্য।

১। (৩) [১] তৈজস পত্র : 'কোপাই' নদীর তীরবর্তী গ্রামীণ জীবনের চিত্রে দেখি, 'হাটে যাবে কুমোর / বাঁকে ক'রে হাঁড়ি নিয়ে' (কোপাই : পুনশ্চ : রবীন্দ্রনাথ)। কোথাও বা 'কানা ভাঙা হাঁড়ি' দারিদ্র্যের সূচক। দুর্ভিক্ষ ও শোষণক্লিষ্ট সমাজের করুণ অবস্থা দেখে যুগসচেতন বিমল চন্দ্রের মনে হয়েছে, দশমহাবিদ্যার অন্যতম শক্তি ধূমাবতী 'কানাভাঙা হাঁড়ি খাতে' (ধূমাবতী : বিপ্রহর এবং অন্যান্য কয়েকটি কবিতা): 'ছিন্ন বসন' পরে গ্রামে-রাজপথে হাঁটছেন।

বেদেদের পরিত্যক্ত স্থানের বাস্তব চিত্র রচনায়-ও 'কানা ভাঙা হাঁড়ি' গৃহীত। বেদেরা গেছে চলে, তাদের তাঁবু-র শূন্যস্থানে 'ফুটো ভাঁড়

আর কানা ভাঙা হাঁড়ি / দূরে দূরে গড়াগড়ি' (বেদেনী : সায়ম : যতীন্দ্র-নাথ) যায়।

মৃৎপাত্র কলসীও নানা কবিতায় ব্যবহৃত। যেমন, গ্রামের মেয়ের চিত্রকল্পে,--'গ্রামের মেয়ে কলসি মাথায় ধরা' (চলতি ছবি : সেঁজুতি : রবীন্দ্রনাথ) ; করুণা নিধানের কবিতায়, প্রায় অনুরূপ চিত্র পাই,--'মরুভূমির তন্বী শ্যামারা / চলেন কলসী কক্ষে' (বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত : ঝরাফুল : করুণানিধান)।

রোমান্টিক প্রেম পরিস্ফুটনে-ও 'কলসী'র বিশিষ্ট ভূমিকা লভ্য। যতীন্দ্রমোহনের 'জটাই' (অপরাজিতা) কবিতাটির কাহিনী গ্রাম্যযুবক 'জটাই'-এর প্রতি যুবতী 'সরম'-এর প্রেমানুভূতিজাত দুর্বলতা 'কাঁখের কলসে'র স্থানচ্যুতিতে দ্যোতিত,--'সরম যেদিন প্রথম তারে দেখল চেয়ে ভয়ে / কাঁখের কলস পড়তে পড়তে গেল তাহার রয়ে'।

কুমুদরঞ্জনের একটি কাহিনীমূলক কবিতায় 'কলসী'-র বিশিষ্ট প্রয়োগে স্বামীর সঙ্গে বিরহী বধূর তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষা সূচিত। দীর্ঘ তিন বৎসর বাদে 'কুলীন' স্বামীর সঙ্গে আসন্ন মিলনের চিন্তায় উন্মনা বধূর 'সিনানে গিয়া কলসী চলে ভাসি', [উৎকন্ঠিতা : একতারা : (১৯১৪) কুমুদরঞ্জন]।

বিষ্ণু দে-র 'সাঁওতাল কবিতা'রও (সন্দীপের চর, / ১৯৪৭) 'কলসী'-র বিশিষ্ট প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। সেখানে প্রেমিকের বাঁশির সুরে মুগ্ধ প্রেমিকার স্বীকারোক্তি,--'হে প্রিয় আমার / পাহাড়ে বাজাও বাঁশি, / ঝর্ণার ধারে শুনবো বলে তা আসি, / কলসী ফেললে লোকে বলে হ'ল কি ও / যদি না-ই আসি, বকাবকি করে প্রিয়'। রোমান্টিক প্রেমের আবহ-নির্মাণে 'কলসী' এখানে অন্যতম উপাদান। কোনো কোনো স্থানে 'কলসী' ব্যক্তি-উপস্থিতি-ও সূচিত করেছে। বিরহিনী পূর্ণ-যুবতীর রূপকাথে দেখা যায়, 'ঘাটের ভরা কলসী ও কার কাঁদছে মাঠে মাঠে' (বনের চাতক মনের চাতক : ঝরাপালক : জীবনানন্দ), আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাগত' (চিরকূট) কবিতাটিতে দুভিক্ষকবলিত গ্রামের জনশূন্যতা পরিস্ফুটনে কলসী গ্রাম্যবধূর দ্যোতক। কবি দেখলেন গ্রামে, শূন্য ঘর শূন্য গোলা, 'একটি কলসীও জল ওঠায় না ঘাটে'।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সূত্রে 'কলসী'র উল্লেখে রূপকালঙ্কার সৃষ্ট। কখনো তা দুর্ভাগ্যের রূপক যেমন, 'ভাগ্য কলসী চির ছিদ্র' (সরলচণ্ডী মরুমায়া : যতীন্দ্রনাথ), কখনো বা তা চাঁদের রূপকাবরণে প্রযুক্ত,--'চাঁদের কলসী কাঁখে চলে বিভাবরী' (বরনারী : সায়ম : ঐ), জীবনানন্দের

একটি কবিতায় হৃদয়-ও কলসীর রূপকাশ্রিত,--'নদীর কলসী আছে রে তার কাঁচা বুকের কাছে' (বনের চাতক মনের চাতক : ঝরাপালক) ; কবিকল্পনায় নদীর 'ঢেউ'-ও 'কলসী'তে রূপায়িত,--'অঘোর ঘুমের ঘোরে চলে কালো নদী,--ঢেউয়ের কলসী' (অস্তচাঁদে : ঐ)।

'হাঁড়ি'র মতো 'কানা ভাঙা কলসী'-ও কবিতায় একেবারে অবহেলিত থাকে নি। বর্তমান ব্যবহারিক জীবনের হৃদয়হীনতার পরিপ্রেক্ষিতে কবি ব্যঙ্গের সুরে লিখেছেন, এ যুগে 'দেব প্রেম, আর পাব কলসীর কানা' (বিক্ষোভ : ঘুম নেই, সুকান্ত)। বলা বাহুল্য, এ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের উপর জগাই-মাধাই-এর হিংস্র আক্রমণের সুপরিচিত ঘটনাটি মনে পড়ে যায়।

'কলসী'-রই ক্ষুদ্র রূপ পাত্র বিশেষ 'ঘট' (ঘটি) কোনো কোনো কবিতায় জগত ও জীবনের রূপকে পরিণত। সমকালীন যুগ ও সমাজের নানা ভ্রষ্টাচারে পূর্ণ পৃথিবী সত্যেন্দ্রনাথের কাছে 'কীটে ভরে শস্যপূর্ণ ঘট' (সাগ্নিকের গান : হোমশিখা)।

মাটির তৈরী 'সরা', 'খুরি, 'ভাঁড়', 'উনুন' ইত্যাদিও আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় দেখা যায়।

একই সমাজ ও পরিবেশে গড়ে উঠলেও মানুষে মানুষে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে / তাতেই মানুষ মানুষ হয়' (মাটি : কুহু ও কেকা)।

কোথাও 'মাটির বাটি' মৃত্তিকার স্নেহরসধারার আধারে রূপায়িত। 'চম্পা' ফুলের বর্ণনায় রূপদর্শী মোহিতলাল দেখলেন, তার বিকাশ হয় 'মাটির বাটিতে স্নেহরস শুষি'। (দীপশিখা : বিস্মরণী)।

জীবনানন্দের 'পরিচায়ক' ('মহাপৃথিবী') কবিতায় গূর্ব হয়েছে, 'প্রভাতের গোধূলির রক্তচ্ছটা রঞ্জিত ভাঁড়'। এ কবিতাটিরই অন্যত্র 'উনুনের' প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। সমকালীন নৈরাশ্যময় যুগের বন্ধ্যাত্ব ও হিংস্রতায় কবি-হৃদয় নিদারুণ বিঘ্ন। তাঁর মনে হয়, 'নরকের আগুনের মতো অহরহ রক্তপাত'-এ ক্ষয়িত শক্তিই মনীষার স্পর্শে বর্তমানের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে মানুষকে কিছুটা স্থিতি এনে দিতে সক্ষম। এ সূত্রে উনুন সেই হিংস্র অগ্নিময়তার আধারে রূপায়িত,--'আগুনের দেয়ালকে প্রতিষ্ঠা করে যদি উনুনের অতলে দাঁড়িয়ে', তবে জীবন নাটকের 'শ্রুতি বিশোধন' সম্ভব। দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের ন্যূনতম সম্বলের প্রতীক 'ঘটি-বাটি' ও 'থালা-বাসন'-এর ব্যবহার লক্ষণীয়।

দুর্ভিক্ষ কবলিত, নিপীড়িত দরিদ্র গ্রামবাসীদের দুর্দশার বর্ণনায় দেখি, 'তিন সন্ধ্যা উপোস দিয়ে' তারা শুধু বুনো শাক খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। খাজনা দেওয়ার সামর্থ তাদের নেই। তাই জমিদারের কাছে তাদের কাতর আবেদন, 'ঘটি বাটি বেচেছি সব। নিজের বলতে ছিল যা' (চিরকুট : সুভাষ মুখোপাধ্যায়), উল্লেখযোগ্য, এই দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতির মূলে কবির সাম্যবাদী চেতনা বিদ্যমান।

অন্যত্র অনুরূপ সূত্রে ও অর্থে 'ঘটি-বাটি'-র স্থানে 'থালা-বাসন' প্রযুক্ত, 'জমি জমা গেছে, শেষে বন্ধক' 'থালা-বাসন' / উপবাসে দেখি একে একে মরে আপনজন' (গ্রামে : ঐ)।

একস্থানে সংসারের প্রতি গভীর মায়া-মমতার দ্যোতনা 'ভাঙা বাটি' ও 'ফুটো বাটি'-র বিশিষ্ট ব্যবহারে স্পষ্ট। সংসার যে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, মায়াময়--তা উপলব্ধি করে প্রাজ্ঞ অশ্বত্থ মৃত্যুমুখী মানুষের উদ্দেশে বলেছে, 'বোচকা বেঁধেছো ঢের,--ভোলো নাই ভাঙা বাটি, ফুটো ঘটিটাও' (বলিল অশ্বত্থ সেই : মহাপৃথিবী : জীবনানন্দ); স্পষ্টতই, 'ভাঙা বাটি' ও 'ফুটো ঘটির' মাধ্যমে মানুষের অনিবার্য সংসার প্রীতি ও অশেষ আকাঙ্ক্ষার বাণী বিধৃত।

এছাড়া 'হাতা-বেড়ি-খুন্তি', 'বেতের চুপড়ি' 'তাওয়া' প্রভৃতি বহু বিচিত্র গৃহস্থালী দ্রব্যাদির ব্যবহারও দুর্লক্ষ নয়।

১। (৩) [২] শয্যাদ্রব্য : বাংলার লোক সমাজের অতি পরিচিত শয্যাদ্রব্য 'কাঁথা' আলোচ্য কাল পর্বের কাব্য-কবিতায় বহুল প্রযুক্ত। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, পুরোনো পরিধেয় কাপড়ের কয়েক ফালি ওপর ওপর সাজিয়ে সেলাই করে 'কাঁথা' প্রস্তুত হয়।

কোনো কোনো কবিতায় 'কাঁথা' দারিদ্র্যের সূচক। 'ভূখা' ছেলের অনুষঙ্গে 'কাঁথা' ব্যবহৃত,--'আনন্দে ভূখা ছেলে / ছেঁড়া কাঁথা টেনে ফেলে' (দুঃখের পার : মরুমায়া : যতীন্দ্রনাথ)। কোথাও দরিদ্র সংসারের বর্ণনায়, 'দাওয়ায় শুকায় কাঁথা ছেলেটা পড়িয়া একপারে' (প্রসূতি : পাঞ্চজন্য : যতীন্দ্রমোহন), উভয় এই বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি সূত্রে 'কাঁথা' গৃহীত।

কোথাও বা 'কাঁথা' দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের ন্যূনতম সম্বলের প্রতীক, 'শীতের বাজারে জমে যায় দেহ। ছেঁড়া কাঁথাখানা কই' [ঘুমের ঘোরে--১ম ঝোঁক : মরীচিকা (১৯২৪) : যতীন্দ্রনাথ], অন্যত্র, একই ভাবে মৃত্যুর ব্যর্থ প্রতিরোধের প্রতীকার্থেও প্রযুক্ত,--'মরণের শীত করে নিবারণ বরফের কাঁথা ঢাকি' (হাট : মরুমায়া : ঐ)।

আবার রবীন্দ্রনাথের 'নাটক' ('পুনশ্চ' গ্রন্থভুক্ত) কবিতাটিতে গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নির্ণয়ে রূঢ় কঠিন বাস্তবতা 'কাঁথার রূপকাশ্রিত,--'গদ্য এলো অনেক পরে ছেঁড়া কাঁথা আর শাল দোশালা/এলো জড়িয়ে মিশিয়ে'।

বাস্তবের অনুসরণেই কবিতায়ও শিশুর সঙ্গে 'কাঁথা'র অনিবার্য যোগ পরিলক্ষিত হয়। কখনো তা শিশুর স্মৃতিবাহী, কখনো বা তা শিশুর প্রতীক। নিদর্শন স্বরূপ, যতীন্দ্রমোহনের 'কালো' (নীহারিকা গ্রন্থভুক্ত) কবিতাটি স্মর্তব্য। যেখানে শিশু বিয়োগের দ্যোতনা সৃষ্টিতে কাঁথার বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষণীয়,--'ঝিনুক বাটি চুষুনি কাঁথা রইল পড়ে'--কিছু না যায় বলি,/বস্তু যাহা তাইতো ফাঁকি, এক পলকে তাই তো পালায় ছলি'।

অন্যান্য লোক শয্যাদ্রব্যাদির মধ্যে 'মাদুর', 'শীতল পাটি', 'চাটাই' ইত্যাদির ইতস্ততঃ উল্লেখ মেলে। এ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর 'উদ্ভট' (মাটির দেয়াল) কবিতাটিতে 'চাটাই'-এর বিশিষ্ট ব্যবহার স্মরণযোগ্য। সেখানে 'চাটাই' হয়েছে বিশ্বের আবর্তন ভূমি। আবর্তিত বিশ্বকে কবি স্ব-নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে বলেন, '--বিছিয়ে চাটাই, / ঘোরাই আকাশ জোড়া লাটাই'।

১। (৩) [৩] অন্যান্য : 'বেদেনী'র চিত্রকল্পে সাপ রাখার বেতনির্মিত ঝাঁপি' চোখে পড়ে,--'সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে, / মাথায় সাপের ঝাঁপি' (বেদেনী : সায়ম : যতীন্দ্রনাথ)।

অন্যত্র, 'জ্বালি কেরোসিন কুপি' (মুক্তি-ঘুম : মরুমায়া : ঐ) কবি মানব জীবনের অন্তরস্থিত সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, 'জীবন মরণে কোনখানে কভু সত্য মুক্তি নাই' (ঐ)।

আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় 'প্রদীপ' বহু ক্ষেত্রে প্রজ্বলিত। যেমন, মৃত্যু সমাগত মনে করে রবীন্দ্রনাথ 'প্রদীপে'র রূপকে 'আপন তারা'টির সন্ধান করেছেন,--'ঘরে ফেরার প্রদীপ আমার রাখল কোথায় জ্বেলে' (তারা : পূরবী : রবীন্দ্রনাথ) কখনো 'প্রদীপ' শিশু ও আনন্দের প্রতীক। কবির 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'আকুল আহ্বান' কবিতাটিতে শিশু-হীন গৃহ মায়ের কাছে প্রদীপহীন অন্ধকার ঘরের সমতুল,--'সন্ধে হল গৃহ অন্ধকার / মা গো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না'।

শুধু 'শিশু'রই নয়, কবির অন্তরতম প্রেরণাদাতা জীবন দেবতার দ্যোতনা সৃষ্টিতেও 'প্রদীপে'র সার্থক ব্যবহার লক্ষণীয়, 'খেয়া' কাব্য-গ্রন্থের (১৯০৬) 'আগমন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন, 'নিবিয়ে

প্রদীপ ঘরে ঘরে / শুয়েছিলাম আলস ভরে', আর সে কারণে 'রাজা' তথা জীবন দেবতা দ্বারে করাঘাত করে ফিরে গেছেন।

১। (৪) বৃত্তি সরঞ্জাম : মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ-এ দেখা যাবে যে, সেখানে প্রকৃতি ও শ্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোকসমাজেও শ্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে, বিশ শতকের তীব্র গতিশীলতার যুগেও যে কোনো দেশ তার লোকসমাজের শ্রমের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অন্যদিকে বহু বিচিত্র বৃত্তি অবলম্বনে লোকসাধারণ তাদের অস্তিত্বকে আজও টিকিয়ে রেখেছে। এসব বৃত্তিবিচিত্র সরঞ্জামনির্ভর।

আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় নানা সূত্রে বহুবিধ বৃত্তি-সরঞ্জামের সাক্ষাৎ মেলে। কাব্য-কবিতায় নূতনতর মাত্রা সংযোজনে এগুলির প্রয়োগগত সার্থকতা অনস্বীকার্য।

১। (৪) [১] কৃষিভিত্তিক বৃত্তি সরঞ্জাম : বাংলার লোকসমাজ প্রধানত কৃষিনির্ভর। গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করে বাংলার লোক সাধারণ 'লাঙল', 'কাস্তে', 'জোয়াল' প্রভৃতি নানাবিধ সরঞ্জামের সাহায্যে মাটিতে সোনার ফসল ফলায়। কাব্য-কবিতাতেও মাত্রান্তর সৃষ্টিতে এসব সরঞ্জামের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নদী তীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রার চিত্রকল্পে দেখি, 'কৃষাণেরা পার হয়ে যায় / লাঙল কাঁধে ফেলে' (মাঝি : শিশু : রবীন্দ্রনাথ)। সরল জীবনের মুক্ত আনন্দের সন্ধানে করুণানিধান স্থির করেছেন, 'শিল কুড়ায়ে বাঁধব মোয়া লাঙল দেব ভুঁয়ে' (বাসনা : ঝরাফুল)।

যথার্থ সাহিত্যিকের হাতে যে লেখনী সাহিত্য রসসৃষ্টিতে মাধ্যম হয়ে ওঠে, অসাহিত্যিকের হাতে তাই হয়ে ওঠে লাঙল। কবি কুমুদরঞ্জন সেই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেন—'সকল লেখনী লাঙল হইলে উপবাসী হবে মন' (কবিতার দুঃখ)।

একাধিক কবির কবিতায় লাঙল শ্রমজীবী মানুষের প্রতীকে পরিণত। আবার কখনো তা সংগ্রামের হাতিয়ার, বিপ্লবের স্মারক। অমিয় চক্রবর্তীর 'তিন প্রশ্ন' (অভিজ্ঞান বসন্ত : ১৯৪৩) কবিতাটিতে সাধারণ মানুষের জীবন ও সমস্যার প্রতীকার্থে 'লাঙল' প্রযুক্ত। একদিন পরাধীন ভারতের জনসাধারণের মানসাকাঙ্খার প্রতীক ছিলেন গান্ধীজি ; সেদিনের দরিদ্র, লাঞ্ছিত ভারতবাসীর জীবনের নানা সমস্যাকে তিনি নিজের করে নিতে পেরেছিলেন। কবির ভাষায়, 'গান্ধীজির কাঁধে দেখো, কোটি কৃষকের লাঙলের চাপ' সেই সত্যেরই পরিচয়বাহী।

সনাতন, ঘুণ ধরা, বৈষম্য নির্ভর সমাজের বিরুদ্ধে নজরুলের বিপ্লবাত্মক আহ্বান এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য,--'ওঠ্‌রে চাষী, জগদ্বাসী ধর্ কসে লাঙল' (কৃষাণের গান : সর্বহারা) 'লাঙল' এখানে বিপ্লবের হাতিয়ার।

বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় রূপকথার সুপরিচিত 'সাত ভাই চম্পা'র কাহিনী-কে আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নতর মাত্রা দান করেছেন। সমকালের সামগ্রিক বিপর্যয়ে নিস্তেজ, অবরুদ্ধ জনগণকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে কবি 'চম্পা'-রূপ নেতৃত্বের কামনা করেছেন। সেখানে দেখি, বিপর্যস্ত মানুষ মুক্তির সন্ধানে ঘুরে মরছে,--'তোমাকে খুঁজছে জানো কি কৃষককে, নৃপে / অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে' (সাতভাই চম্পা : সাতভাই চম্পা : ১৯৪৪)। বলা বাহুল্য, 'রূপকথার 'চম্পা' এখানে মুক্তির প্রতীক। আর তার উদ্দেশেই কবির এ প্রশ্ন উচ্চারিত। আর সেই মুক্তি লাভের জন্য অন্যতম হাতিয়ার হ'ল 'লাঙলের ফলা'। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী বিপ্লব চেতনায় উদ্বুদ্ধ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঘোষণা--'দিন এসে গেছে / লাঙলের ফালে আগাছা উপড়ে ফেলবার' (অগ্নিকোণ : অগ্নিকোণ : ১৯৪৮)। সিঙ্গাপুরে 'ব্রিটিশের ফাঁসিকাঠে' তিনজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতীয়-র মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ কবি লাঙলের প্রতীকে এখানে শ্রমজীবী মানুষকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যত্র প্রায় অনুরূপ সূত্রে, নবান্নের প্রতীকে 'মুক্তি'র আহ্বান, মাঠে মাঠে ক্লান্তি নেই, অসংখ্য লাঙল নবান্নকে ডাকে' (স্বাক্ষর : চিরকুট : ঐ) : এখানেও 'লাঙল' শ্রমজীবী মানুষের ইঙ্গিতবাহী। সুকান্ত-র 'অনন্যোপায়' (ঘুম নেই) কবিতাতেও 'লাঙল' শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের ইঙ্গিতবাহী,--'অনেক গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ বহু উদ্যম আমার / নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, তাঁতী ঘরে, নিঃশব্দ কামার, / —চাষীর লাঙল ব্যর্থ, মাঠে নেই পরিপূর্ণ ধান'।

লাঙল দিয়ে চষা হয় মাটি। নতুন ফসলের সমারোহ দেখা দেয়। বর্তমান যুগের বন্ধ্যাত্বে বিপন্ন কবির কাছে তাই 'লাঙল' কখনও সৃষ্টি ও সজীবতার সূচক,--'আকাশের তলে / ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার মুছে গেছে,--' (মাঠের গল্প : ধূসর পাণ্ডুলিপি : জীবনানন্দ), স্মরণযোগ্য, অন্ধযুগের অবসরের গান গাইতে গিয়ে কবি অন্যত্র 'লাঙলে'র প্রায় অনুরূপ ব্যবহার করেছেন',--জমি উপড়ায়ে ফেলে চলে গেছে চাষা / নতুন লাঙল তার পড়ে আছে,--পুরোনো পিপাসা / জেগে আছে মাঠের উপরে' (অবসরের গান ২ : ঐ)। সৃষ্টি সজীবতার ইঙ্গিতের

সঙ্গে 'লাঙল' এখানে যে ভিন্নতর মাত্রা যোগ করেছে তা হল 'পুরোনো পিপাসা'র অর্থাৎ শস্যের স্বপ্নের। 'চাষা চলে গেছে' কিন্তু তার স্বপ্ন-আকাঙক্ষার মৃত্যু হয় নি। 'নতুন লাঙল' এখানে মানুষের চিরন্তন 'আশা আকাঙ্খার-ও ইঙ্গিতবাহী'। কখনও কবি অনুভব করেছেন 'কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই'। পরপর দুটি 'বিশ্ব-যুদ্ধ', দেশে দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ব্যর্থ সংগ্রাম, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিদারুণ নিষ্ঠুর চক্রান্ত, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত সৃষ্টি-সম্ভাবনাও যেন লুপ্ত করে দিয়েছে। ফলত কৃষাণের লাঙল হয়েছে বিবর্ণ,—'কৃষকের বিবর্ণ লাঙল, / ফালে ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি / পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ / সারাদিন অন্তহীন কাজ করে নিরুৎকীর্ণ মাঠে / —' (খেতে প্রান্তরে : সাতটি তারার তিমির : ঐ)।

চিত্রকল্প রচনা সূত্রেও 'লাঙলের ছায়া' প্রতিফলিত,'—একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে / ঈষৎ স্থবির ভাবে হাঁটে / লাঙল ও বলদের একগাল স্থির ছায়া খেয়ে / তাহার হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে' (দোয়েল : মহাপৃথিবী : ঐ)। বলা বাহুল্য, কয়েকটি শব্দের ইঙ্গিতে কর্মরত কৃষকের চিত্রটি তার পরিবেশ সমেত এখানে সুপরিস্ফুট।

কৃষকের ধানকাটার সরঞ্জাম 'কাস্তে'র প্রয়োগ-বৈচিত্র্যও উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন, 'হেমন্ত সন্ধ্যায়' 'দ্বিতীয়ার চাঁদখানি কাস্তের আধ-খানি' (হেমন্ত সন্ধ্যায় : ত্রিযামা) বলে যতীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। অন্যত্র, 'ভাঙা-গড়া' (ঐ) কবিতায় অঙ্কিত শিব-মূর্তির শিরস্থ অর্ধচন্দ্র কাস্তের রূপকে বিধৃত,—'আগে বায় ভাই, কাঁধে হল, শিরে / কাস্তে চাঁদের ফালা'; বলা বাহুল্য, শিবের এ মূর্তি যুগপৎ পৌরাণিক ও লৌকিক চেতনা-সমন্বিত। প্রকৃতপক্ষে, চাঁদ ও কাস্তের সাদৃশ্য-কল্পনা বিভিন্ন কবির কবিতাতেই লভ্য। যেমন, 'মেঠো চাঁদ কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা' (মাঠের গল্প : ধূসর পাণ্ডুলিপি : জীবনানন্দ)।

বিপ্লব ও তার প্রস্তুতির প্রতীক রূপে 'কাস্তে'র বহুল প্রয়োগ মেলে। সমগ্র বিশ্বেই শ্রমজীবী মানুষের অন্যতম স্মারক রূপে 'কাস্তে' অস্ত্র বিস্তর গৃহীত।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তে পৃথিবী আজ যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত। কিন্তু শ্রমের স্রোতোধারা নিত্যবহমান; তাই 'কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে / করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়' (খেতে প্রান্তরে : সাতটি তারার তিমির : জীবনানন্দ)। লক্ষণীয়, এ রক্তক্ষয়ের যুগে সৃষ্টিও যান্ত্রিক,

তাই কাস্তে 'করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়', অন্যত্র, একই সূত্রে,—'সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়' (বিভিন্ন কোরাস : মহাপৃথিবী : ঐ)।

শ্রমিক দিবসে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুভব করেন, দীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দিন সমাগত। এ সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকার প্রাধান্য উপলব্ধি করে কবি শুনতে পান, 'সাইরেণ শঙ্খে / গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে—' (মে দিনের কবিতা : পদাতিক ১৯৫০)। এখানে স্পষ্টত-ই 'হাতুড়ি' ও 'কাস্তে' শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক।

কখনো বিপ্লবের হাতিয়ার রূপেও 'কাস্তে'-র প্রয়োগ মেলে। মার্কসীয় দর্শনে আস্থাশীল কবির দৃঢ় বিশ্বাস,—শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে-ই শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কবিতায় রূপকথার 'লালকমল-নীলকমল' সেই সমাজের বার্তাবাহী হয়ে উঠেছে, তাদের হাতে 'প্রাণের লাল নিশান'। আর সেই লাল নিশানকে 'উন্নত-উড্ডীন' রাখতে 'কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে / কামারশালে মজুর ধরে গান' (সৌভোগ : সন্দীপের চর : বিষ্ণু দে), অনুরূপ প্রয়োগ সুকান্ত-র একটি কবিতায়ও লভ্য।—'তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার, / শুধু আজ কাস্তে দাও আমার হাতে' (ফসলের ডাক—১৩৫১ : ছাড়পত্র (১৯৪৯)) কখনো 'কাস্তে' জীবনের প্রাচুর্য-সমারোহের প্রতীক। নষ্ট যুগের বন্ধ্যাত্ব বিষণ্ণ কবির দীর্ঘশ্বাসে,—'যেখানে আসে নি চাষা কোন দিন কাস্তে হাতে লয়ে' (জীবন : ধূসর পাণ্ডুলিপি : জীবনানন্দ)।

সুকান্ত-র 'এই নবান্নে' (ছাড়পত্র গ্রন্থভুক্ত) কবিতাটিতে প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে 'কাস্তে' অতীত-স্মৃতির উদ্দীপক। 'গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন' : তাই এ' সনে ফসল ফলাতে গিয়ে অতীতের সেই দুঃখজনক স্মৃতিতে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে,' এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায়' (এই নবান্নে : ঐ)।

এছাড়া চিত্রকল্প নির্মাণেও 'কাস্তে'-র ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, কর্মরত কৃষকের চিত্রকল্পে দেখি, 'কোমর জলে দাঁড়িয়ে কসে কাস্তে চালায় চাষী' (খেয়াডিঙি : পাঞ্চজন্য : যতীন্দ্রমোহন), অন্যত্র, প্রান্তরের পথে কবির চোখে পড়েছে কৃষাণের মেয়েকে, যার 'শিরে আঁটি, কাস্তে হাতে, দ্রুতগতি মুখে মৃদু গান' (প্রান্তর পথে : নীহারিকা : ঐ, ইত্যাদি)।

এছাড়া কৃষি-বৃত্তি সরঞ্জাম 'মই', 'কোদাল', 'শাবল'-ও কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের পরিচয়। সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের জয়গান

করতে গিয়ে কবির ঘোষণা,--'হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়' (কুলি-মজুর : সর্বহারা : নজরুল) তারাই যথার্থ 'মানুষ', দেবতাও।

১। (৪) [২] ধীবর ও তার সরঞ্জাম : জেলেদের মাছ-ধরার প্রধান সরঞ্জাম 'জাল'। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় জগতের নিরন্তর কর্মপ্রবাহের দ্যোতনা সৃষ্টিতে অন্যতম উপাদানরূপে প্রযুক্ত,--'তাঁতী বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল / বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার' / তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার' (১০ সংখ্যক কবিতা : জন্মদিনে : ১৯৪২)।

নজরুলের 'ধীবরদের গান'-এ (সর্বহারা) 'জাল' হয়েছে সংগ্রামের হাতিয়ার বিশেষ,--'দৈত্য দানব ধরব রে ভাই। ডাঙাতে জাল ফেলে', উল্লেখযোগ্য ডাঙার 'দৈত্য দানব' বলতে বিদ্রোহী কবি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিকেই বুঝিয়েছেন।

বর্ষাসিক্ত গ্রাম কিংবা জেলেদের মাছ ধরার চিত্ররচনায় জাল-এর ব্যবহার লক্ষণীয়। বর্ষায় 'জাল ফেলে ফেলে জেলের ছেলেরা। বেয়ে নিয়ে চলে ডিঙে' (বর্ষায় : বেণু ও বীণা : সত্যেন্দ্রনাথ), যতীন্দ্রমোহনের নিপুণ বর্ণনায় মাছ ধরার অপর একটি চিত্রে দেখি, 'বোঁঠে চেপে করে তাক্ / মাথায় ঘুরায়ে পাক খেপলা ফেলে' (জেলের ছেলে : নাগকেশর :)।

'টেঁঠা' হ'ল মাছ-শিকারের জন্য বাঁশের বর্শা বিশেষ। যতীন্দ্র-মোহনের কাহিনী নির্ভর কবিতা 'জেলের ছেলে'-তে (নাগকেশর) নায়কের অসামান্য শক্তি ও দক্ষতার পরিচয়দান সূত্রে 'টেঁঠা'র উল্লেখ মেলে, সে নায়ক 'টেঁঠায় হানে শিকার গহন তলে'—এমনই তার শক্তি।

মাছ বা কাঁকড়া ধরার জন্য বাঁশের খাঁচা বিশেষ 'পাঁকালি'-ও কবিতায় উল্লিখিত। 'পাঁকাল বন্দনা'-য় (সায়ম) যতীন্দ্রনাথ দেখেছেন, পাঁকাল মাছ কোনো সময়েই আবদ্ধ থাকতে চায় না, পাঁকে থেকেও তাদের গায়ে পাঁক লাগে না। বিশ্বজগতে যুগে যুগে আবির্ভূত মহাপুরুষেরাও সংসারে এই পাঁকালের মতই দিনযাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম রসিকতার আবরণে কবির বক্তব্য, 'দেখতে পাবে ঝাড়লে পরে / সনাতনের পাঁকালি / যুগে যুগে কত পাঁকাল / করলে কত পাঁকালি'। 'পাঁকালি' এখানে লৌকিক সংসারের ইঙ্গিতবহ।

মাছ-শিকারের জন্য নানা লোভনীয় খাদ্য বঁড়শিতে দিয়ে টোপ ফেলা হয়। খাবারের গন্ধে প্রলুব্ধ হয়ে মাছ বঁড়শি-বিদ্ধ হয়। 'গয়দা' এ জাতীয় এক বিশেষ ধরণের টোপ। জগতের ছদ্ম-আনন্দের রূপকে 'গয়দারটোপ'

যতীন্দ্র কবিতায় ব্যবহৃত 'সুখে চাক দুখ, চিনি মাখা নিম। বঁড়শি বেড়িয়া গয়দার টোপ' (ব্যর্থ পূর্ণিমা : পাঞ্চজন্য : যতীন্দ্রমোহন)।

এছাড়া নিছক বর্ণনা সূত্রে 'ঝাংলা', 'বঁড়শি' ইত্যাদি মৎস্য-শিকারের সরঞ্জামাদিরও উল্লেখ মেলে।

তন্তুবায়-বৃত্তির নানাবিধ সরঞ্জাম-ও আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় গৃহীত। পূর্বেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতায় নিরন্তর কর্মপ্রবাহের দ্যোতনা সৃষ্টিতে 'জাল'-এর সঙ্গে তাঁতও উল্লিখিত।

দুর্ভিক্ষ-কবলিত গ্রামের বর্ণনায় 'তাঁত' হয়েছে কর্মমুখরতার প্রতীক—'তাঁতি তাঁত বোনে না কোন। কলু আর ঘোরায় না ঘানি' (স্বাগত : চিরকুট : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের পরাধীন ভারতবর্ষের জনমানসে গান্ধীর প্রভাব অনস্বীকার্য। এ যুগের কাব্যজগতেও সেই প্রভাব নানা সূত্রে প্রতিফলিত। গান্ধীর সঙ্গে চরকা'-র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুপরিচিত, এ কারণে চরকাও কোনো কোনো কবিতায় প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। কবিতায় কখনো তা মুক্তির, কখনো বা তা অহিংসার প্রতীক।

গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ যতীন্দ্রমোহনের আহ্বান,—'সব ছেড়ে আজ ঘোরাও চরকা চক্র সুদর্শন। কেটে যাবে সকল আঁধার বাধা ও বন্ধন' (চরকা-সঙ্গীত : জাগরণী)। 'চরকা ঘোরানো' এখানে গান্ধী-প্রদর্শিত পথেরই ইঙ্গিতবাহী।

ব্যক্তি ও দেশের যথার্থ মুক্তির পথ নির্ণয়ে সংশয়িত যতীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন,—'বল বল ভাই কোথায়? চরকা না বন্দুকে' (মুক্তি ঘুম : মরুমায়া)। স্পষ্টত-ই অহিংসা ও সহিংসার আদর্শ যথাক্রমে 'চরকা' ও 'বন্দুকে' বিধৃত।

'সুতা', 'মাকু'-ও কোনো কোনো কবিতায় সক্রিয় ভূমিকা-সম্পন্ন। সমাজ সচেতন যতীন্দ্রনাথের কবিতায় "তাঁত-বোনা' প্রক্রিয়াটির রূপকাশ্রয়ে শোষণভারে ন্যুব্জ সমাজের বাস্তব চিত্রটি বিধৃত। সেখানে 'মাকু' শোষিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক, সুতা সেই শোষণের উপাদানে রূপায়িত। আর সমাজের শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত,—'কার সুতা খুলে খুলে দিয়ে বুক থেকে কার তরে বুনে ধুতি' (ঘুমের ঘোরে—৩য় ঝোঁক : মরীচিকা), ঐ কবিতারই অন্যত্র,—'তাঁতীর টাকার বড় দরকার,' তাই 'মাকু ছুটাছুটি করে'।

কর্মকার-বৃত্তির অন্যতম সরঞ্জাম 'হাতুড়ি' ইতঃপূর্বেই 'লাঙল' ও 'কাস্তে' প্রসঙ্গে একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে। পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে অন্যত্র তার প্রয়োগ-বৈচিত্র্য আলোচনা করা যাক।

কাস্তের মতো 'হাতুড়ি'-ও নানা কবিতায় খেটে খাওয়া মানুষ ও বিপ্লবের প্রতীক রূপে চিহ্নিত। সমাজের সর্বহারা মানুষের শোষণ-ক্লিষ্ট দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণা পরিস্ফুটনে ক্ষুব্ধ যতীন্দ্রনাথের প্রশ্ন,—'হাতুড়ি পেটার পূর্বে লোহার আগুনে দেবার মানে' (ঘুমের ঘোরে—৫ম ঝোঁক : মরীচিকা)—এস্থানে 'হাতুড়ি' দুর্দশাক্লিষ্ট নিপীড়িত জনগণের প্রতিভূ। অন্যত্র কবির অপূর্ব দক্ষতায় একটি কামারশালার সাধারণ ক্রিয়াকর্মের রূপকাশ্রয়ে শ্রমক্লান্ত মানুষের করুণ মূর্তিটি ফুটে উঠেছে। সেখানে 'নেহাই' এর কান্না, 'আগুনের' অবসাদ, শাঁড়াসি'র শ্রান্তি-ই শুধু নয়, 'হাপরে'র হাঁপানি, ও হাতুড়ির ছুটি প্রার্থনা কর্মক্লান্ত, নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণাময় অসহায় দিনযাপনের-ই দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃতিযোগ্য,—'ঠক ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে, / শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে / দেখ গো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি', (লোহার ব্যথা : মরুশিখা : ঐ)। উদ্ধৃতাংশে যতীন্দ্রনাথের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

শ্রমিকের শ্রমই তার বিপ্লবের হাতিয়ার, তাই 'হাতুড়ি'-ও কাস্তে, লাঙলের মতোই সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে চিহ্নিত। একটি কবিতায় দেখি, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত শোষিত মানুষেরা মুক্তির পথ খুঁজেছে,—'হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে' (সাত ভাই চম্পা : সাত ভাই চম্পা : বিষ্ণু দে), অনুরূপ ভাবে সুকান্ত-র কবিতায় শুনি, 'আজকে মজুর হাতুড়ির সুর ক্রমশই করে দৃপ্ত, / আসে সংহতি, শত্রুর প্রতি খুন হয় নিক্ষিপ্ত' (উদ্যোগ : পূর্বাভাস : সুকান্ত), আবার কখনো কবি সংগ্রামের এই হাতিয়ারের অমিত ক্ষমতার ইঙ্গিতও দিয়েছেন,—'হাতুড়ির কড়া ঘায় যন্ত্র জীবন পায়' (কামার : মাধ্যমিক : বিমলচন্দ্র ঘোষ)। লক্ষণীয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'হাতুড়ি'-কে সংগ্রামের প্রতীক বা হাতিয়ার রূপে প্রয়োগে কবিদের বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিরই প্রতিফলন। কখনো রূঢ় বাস্তবতার প্রতীকার্থেও 'হাতুড়ি'-র সাক্ষাৎ লভ্য। সমকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সাম্যবাদী সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুভব করেছেন,—'ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'। রূঢ় বাস্তবের দাবানলে আজ রোমান্টিকের স্বর্গোদ্যান

ভস্মীভূত, কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতেও কোনো কোনো কবি যখন রোমান্টিক ভাববিলাসিতায় মগ্ন হন, তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো বাস্তব সচেতন কবির কন্ঠে ধ্বণিত হয় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি, 'কুঁজো হয়ে যারা ফুলের মূর্চ্ছা দেখে / পৌঁছয় নাকি হাতুড়ি তাদের পিঠে'? (সকলের গান : পদাতিক)। লক্ষণীয়, 'হাতুড়ি' এখানে রূঢ় বাস্তবের ধারক। 'হাতুড়ি'-র ব্যবহারে অনুরূপ ইঙ্গিত সুকান্ত-র কবিতাতেও লভ্য। সুকান্ত উপলব্ধি করেন, এযুগে,—প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা', মহাজীবনের কাছে তাঁর প্রার্থনা,—'গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো' (হে মহাজীবন : ছাড়পত্র)। ভাববিলাসিতা বর্জন করে রূঢ় রুক্ষ জীবনকে বরণ করেন তিনি।

এযুগ যন্ত্রের যুগ। যন্ত্র হরণ করেছে দেবতার মহিমা। তাই সকল মন্ত্রের আদ্যবীজ 'ওঁ' 'ছেনি ও হাতুড়ি'র উদ্দেশে উচ্চারিত, 'ভাস্কর করে ওঁ ছেদনী ওঁ হাতুড়ি' (পঞ্চরতি : ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ)। 'হাতুড়ি'কে যন্ত্রযুগের প্রতীক কল্পনা করে কবির ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবটি ছদ্ম-ভক্তির আবরণে এখানে প্রকাশিত।

অমিয় চক্রবর্তীর 'রুদ্রকামার' (মাটির দেয়াল) কবিতাটিতে বিশ্ব-স্রষ্টা হয়েছেন 'রুদ্রকামার'। আর প্রকৃতি-সৃষ্ট উল্কার বিদ্যুৎ তাঁরই 'হাতুড়ির' সৃষ্টি রূপে কল্পিত।

নল-সংযুক্ত চামড়ার থলি বিশেষ, 'হাপরে'র সাহায্যে কর্মকার যেমন উনুনের আঁচ টিকিয়ে রাখে, তেমনি প্রকৃতির নিত্য প্রাণরসধারাও বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখে বলে কবির মনে হল,—'প্রকৃতির প্রাণ দেওয়া প্রাচীন হাপরে / গঠিত পল্লব তোর শ্যামল কোমল' (নরেল : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ)।

কখনো চিত্রকল্প রচনায় 'হাপরে'র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। জীবনানন্দের কবিতায় দেখি,—'পুবের হাওয়ায় হাপর জ্বলে, আগুন দানা ফাটে' (বনের চাতক : মনের চাতক : ঝরা পালক)। বলা বাহুল্য, গ্রীষ্মের দাবদাহের দ্যোতনা সৃষ্টিতে হাপরের সক্রিয়তা এখানে অনস্বীকার্য।

নৌ-চালনা-সম্পর্কিত বহু বিচিত্র সরঞ্জামের উল্লেখও কাব্য-কবিতায় অলভ্য নয়। যুগে যুগে দেশে দেশে শাসকের পরিবর্তন হলেও শ্রমের প্রবাহ নিরন্তর বহমান। শ্রমজীবী মানুষেরাই সমাজ-কে নিত্য গতিশীল রাখে। সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে, দেশে দেশে 'রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের

কর্মের মধ্য দিয়ে নিতান্ত আড়ম্বরহীন ভাবেই স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে,—'ওরা চিরকাল। টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল' (১০ সং কবিতা : আরোগ্য / ১৯১০)। লক্ষণীয়, 'হাল' এখানে নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারার প্রতীক। অন্যত্র, 'দাঁড়ের' অনুরূপ প্রয়োগ মেলে,—'জেলে ডিঙি চিরকালের নৌকা মহাজনি, সেখানে নিত্যদিনই 'উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি' (নতুন কাল : সেঁজুতি : ঐ) বলে কবির বিশ্বাস।

কবিতায় রোমান্টিক আবহ সৃষ্টিতেও 'দাঁড়' ও 'হালে'র বিশেষ সহায়ক ভূমিকা দেখা যায়। সুন্দরবনবাসী প্রেমিকের বাসনা, 'আমি দাঁড়ে পিয়া হালে, থাক্‌বে না আর কেউ', (সুন্দরবনের গান : মরুমায়া : যতীন্দ্রনাথ)।

বর্তমান যুগের অস্থির, বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি পরিস্ফুটনে 'হালে'র প্রয়োগ ঘটেছে। কবি বিমলচন্দ্রের অন্তোপলব্ধি,—'ভাবের নৌকা হাল ভাঙা / তবু ভেসে চলি সাগর পার' (দক্ষিণায়নে : মাধ্যমিক :)। অনুরূপ উপলব্ধির প্রকাশসূত্রে সুকান্তের একাধিক কবিতায় 'হাল'-এর ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন, 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটিতে সঠিক নেতৃত্বের অভাবে যুব শক্তির নিদারুণ অপচয়ে বিষণ্ণ কবি বুঝেছেন, যুগের এই 'দুর্যোগে হাল ঠিক রাখা ভার'।

বায়ুর গতিবেগকে ব্যবহারের জন্য নৌকায় 'পাল' ব্যবহৃত হয়। বাতাসের বেগে লাগানো 'পাল' ফুলে ওঠে, এর ফলে বাতাসের অনুকূলে নৌকার গতি বৃদ্ধি পায়। আর 'হাল' সেই গতিবেগকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করে। কবি হাওয়ার স্রোতের সঙ্গে আমাদের আবেগকে তুলনা করে 'পাল'-এর ব্যবহার করেছেন। আবেগপূর্ণ হৃদয় যেন ঐ দুরন্ত বাতাসে ফুলে ওঠা পাল, আর 'হাল' সেখানে কার্যকারণবাদী যুক্তির প্রতীক। 'রসের সাগরে পাল তুলে ধরে মানি না হালের যুক্তি' (লীলা-কীর্ত্তন : মরুমায়া : যতীন্দ্রনাথ); 'সাদা পাল' কখনো পরম বিশ্বাসের স্থল তথা ঈশ্বরের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে,—'নিঃশ্বাস হরি দৃষ্টি আবরি' ঘন তিমিরে; / কোথা সাদা পাল? কই তরী তব? হে কাণ্ডারী।...'(সংসার : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ)।

আবার জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী সুকান্ত কবিতায় 'পাল'-এর বিশিষ্ট প্রয়োগে জনসাধারণের অমিত শক্তির ইঙ্গিত দান করেছেন; 'বর্তমান নিষ্পন্দমান সমাজ-প্রসঙ্গে কবির দীর্ঘশ্বাস,—' আজ আর তোলে না কোন জনতরণীর পাল' (সেপ্টেম্বর / ৪৬ : ছাড়পত্র)।

'নোঙর' হ'ল 'নৌকা' তীরস্থ করার জন্য মাটিতে পোতার লোহা বা বাঁশের অঙ্কুশাকৃতি দণ্ড। কবিতায় তা কখনো প্রতিকূলতার ইঙ্গিত-বাহী। বামপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী কবি বিপ্লবের দুর্বার শক্তি উপলব্ধি করেছেন / সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিপ্লবের জয় অনিবার্য। তাই জীবন রূপ নৌকাকে তীরে আটকে রাখতে রক্ষণশীল 'নোঙর' ব্যর্থ,—'সামনে মৃত্যু কবলিত দ্বার, / থাক অরণ্য, থাক না পাহাড়, / ব্যর্থ 'নোঙর, নদী হব পার, খুঁটি শিথিল' (আমরা এসেছি : ঘুম নেই : ঐ)।

তৈলজীবীর সরঞ্জামও প্রয়োজনে কবিতায় ব্যবহৃত। সরিষা, তিল, প্রভৃতি পিষে তেল নিষ্কাশনের যন্ত্র 'ঘানি' সাধারণভাবে আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় গতানুগতিক ক্লান্তিকর জীবনযাত্রার প্রতীক রূপে প্রযুক্ত। বাস্তব জীবনের নানা অবিচার-ভ্রষ্টাচারে বীতশ্রদ্ধ 'দুঃখবাদী' যতীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে জগত ও জীবন যেন আলো আঁধারের গরাদে বসানো অনন্ত কারাগার। সেখানে সাধারণ মানুষ "অকূল জেল-এ টানিছে বিপুল ঘানি" (ঘুমের ঘোরে : ৫ম ঝোঁক : মরীচিকা)।

শিকার-বৃত্তির সরঞ্জামাদিও কাব্য-কবিতায় ব্যবহৃত। কখনো রোমান্টিক প্রেমের দ্যোতনা সৃষ্টিতে ধনুকের 'গুণ'-এর রূপকাবরণে বসন্তের তথা যৌবনের দূত মদনের সাক্ষাৎ মেলে। বিগত-যৌবন কবির আক্ষেপ —'আজ কি কাহারো ধনুকের গুণ / জাগাতে পারে না ক্ষণিক ফাগুন?' (সমাধান : ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ) ; আবার প্রেম-মুগ্ধতার প্রকাশে 'অকস্মাৎ বিদ্ধ যেন বাণে'র (সোম : হোমশিখা। ১৯০৭ : সত্যেন্দ্রনাথ) ব্যবহারও দুর্লক্ষ নয়। কখনো বজ্র 'খরশান বিধাতার বাণ' এর (অকারণ : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ) রূপকার্থেও কবিতায় নিক্ষিপ্ত।

জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় 'তীর' বা 'বাণ'-এর তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ অনস্বীকার্য। সমকালীন যুগের মানুষের সমস্যা-জটিল জীবনে বিলুপ্ত স্থিতিবোধ তাদের মানসলোকে এনেছে নিদারুণ সংশয়, অস্থিরতা। মানুষের এ করুণ অবস্থা জীবনানন্দের 'অনেক আকাশ' ('ধূসর পাণ্ডুলিপি') কবিতায় তীর বিদ্ধ পাখির প্রতীকে বিধৃত,—এই কবিতাটিতেই 'বাণ' শব্দটি হয়ে উঠেছে গভীরতর তাৎপর্যময়। সেখানে দেখি,— 'ঘুমন্ত বাঘের বুকে বিষাক্ত বাণের মত বিষম সে ক্ষত'। উল্লেখযোগ্য, প্রকৃত শক্তিমানের বিরুদ্ধে শক্তিহীন কুচক্রীদের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের বাস্তব যুগচিত্রটি এখানে 'বাণে'র প্রয়োগে স্পষ্টতর হয়েছে। আবার যান্ত্রিক যুগের ছকে বাঁধা অবরুদ্ধ জীবন যাপনের প্রতীক হয়ে উঠেছে ধনুকের

দৃঢ় বদ্ধ ছিলা',—'কেরোসিন কাঠ, গালা, গুণচট চামড়ার ঘ্রাণ / ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে / ধনুকের ছিলা রাখে টান, / টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে, / টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা' (রাত্রি : সাতটি তারার তিমির ১৯৭৯ : ঐ)।

বর্শা হ'ল শিকার-বৃত্তির অন্যতম উপকরণ, এটি যুদ্ধাস্ত্র বটে। 'বল্লম' নামেও এই বেধনাস্ত্রটি পরিচিত। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বানে 'বর্শা' হয়েছে বীরত্বের ইঙ্গিতবাহী। পরাধীনতার "লোহার নিগড় ছিঁড়ে" বর্শা শানায়ে নিয়ে [আশীর্বাণী : বঙ্গমঙ্গল : (১৯০১) করুণানিধান] আগুন ছোটাতে কবি জনগণকে ডাক দিয়েছেন। প্রায় একই অর্থে 'বর্শা'র প্রয়োগ বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' (চোরাবালি : ১৯৩৭) কবিতায় লভ্য। মার্কসীয় দর্শনে গভীর আস্থাশীল কবি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বানে 'বর্শা'কে সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করেছেন,—'দীপ্ত বিশ্ব বিজয়ী বর্শা তোলো, / কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো'।

'বর্শা' জাতীয় বেধনাস্ত্র 'কামঠা' ও 'সড়কি'-ও কবিতায় দুর্লক্ষ নয়। যতীন্দ্রমোহনের একটি কাহিনীমূলক কবিতার নায়ক চরিত্রে সাহসিকতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে 'কামঠা'র সার্থক ব্যবহার মেলে। সেখানে দেখি, নায়ক 'জটাই',—'কামঠা হাতে বজ্রডাকে হাঁক দিয়ে সে ফেরে' (জটাই : অপরাজিতা), এছাড়া নিছক বর্ণনাসূত্রে 'সড়কি' প্রয়োগের দৃষ্টান্ত,—'সড়কি হাতে সঙ্গীরা সব চলল ছাতে তেতালায়' (প'ড়ো বাড়ি : মহাভারতী : ঐ)।

এছাড়া 'কোদাল', 'দা', 'কাটারী'র প্রয়োগও লভ্য। কঠিন শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ শিশুর কাছে মালীর কোদাল চালানো মুক্ত জীবনের প্রতীক রূপে প্রতিভাত। তার মনে হয়, 'কেউ তো তারে মানা নাহি করে কোদাল পাছে পড়ে পায়ের পরে' (বিচিত্র সাধ : শিশু : রবীন্দ্রনাথ)।

খেজুর রস সংগ্রহের চিত্র রচনায় বাস্তবানুসরণে 'কোদাল' ও 'দা' যতীন্দ্রনাথের 'খেজুর বাগান' (মরুশিখা) কবিতায় লভ্য।

১। (৫) **যানবাহন:** গোরুর গাড়ি, নৌকা প্রভৃতি লোকসমাজ নির্মিত ও ব্যবহৃত যানবাহনই এ পর্যায়ভুক্ত।

১। (৫) [১] **স্থলযান:** লোকসমাজে গোরুর গাড়ি, পালকি ও ডুলি-ই প্রধান স্থলযান হিসাবে ব্যবহৃত। বর্তমানে পালকি ও ডুলি বাংলার লোকসমাজে প্রায় নেই বললেই চলে। তবে গোরুর গাড়ি আজও এই বিশ শতকের বাংলা তথা ভারতের গ্রাম জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে চলেছে। এমন কি শহরেও গোরুর গাড়ি একেবারে বিরল-দৃষ্ট নয়। বিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতায় জগত সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য।

'গোরুর গাড়ি' বাঁশের তৈরী অরযুক্ত পশুবাহিত লোকযান। উল্লেখযোগ্য, নামে 'গোরুর গাড়ি' হলেও এ লোকযানটি অনেক সময় মহিষবাহিত-ও।

যতীন্দ্রনাথের 'মরুশিখা' কাব্যগ্রন্থের 'কাণ্ডারী' কবিতায় কবি 'গোরুর গাড়ি'র রূপকাবরণে ক্লান্ত, নিরাশ্বাস জীবনের ইঙ্গিত দান করেছেন। গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনযাপনে অবসন্ন কবি 'চিরকাণ্ডারী'র কাছে আবেদন জানান এই বলে,—'পারিবে বন্ধু, চালাতে কি মোর জীবন গরুর গাড়ি?'

জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় এই লোকযানটি গভীর ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। গ্রাম বাংলায় গোরুর গাড়ি শস্য বহনেও ব্যবহৃত। শস্য মানুষের জীবন। শস্যই সমাজের মুক্তির স্বর্ণ-সম্ভাবনার বীজ নিহিত। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী থেকে সেই স্বর্ণ-সম্ভাবনা যেন লুপ্ত হতে থাকে। যুগের এ বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ থেকে কেউ-ই রক্ষা পায় নি। তাই 'রাতের নক্ষত্রে'র কাছে 'কোন পথে যাবো'? —এ প্রশ্নের উত্তরে নক্ষত্র মৃত্যুর ইঙ্গিত করেছে,—'অথবা তাকায়ে দ্যাখো গরুর গাড়িটি ধীরে চলে যায় অন্ধকারে / সোনালি খড়ের বোঝা বুকে, (নিরালোক : মহাপৃথিবী : জীবনানন্দ)। এযুগে মানুষের স্থিতি বোধ-ও যেন অন্ধকারে ক্রমবিলীয়মান। 'সোনালি খড়' মানুষের স্বর্ণ-সম্ভাবনার প্রতীকতা করে আধুনিক যুগের নিরাশ্বাস বন্ধ্যাত্বের যন্ত্রণা অপূর্ব ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছে, আবার নিস্তব্ধ শান্তির প্রতীক হিসাবেও 'গোরুর গাড়ি' গৃহীত। "গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে / লাল বট ফলে ধাঁধাঁতা মেঠোপথে জারুল ছায়ার নিচে নদীর সুমুখে / কতক্ষণ থেমে আছে,....../ ....। এই সব নিস্তব্ধতা শান্তির ভিতর / তোমাকে পেয়েছি আজ এতদিন পরে এই পৃথিবীর 'পর', (জার্নাল : ১৩৪৬ : ঐ), শুধু শস্য-ই নয়, কখনো 'গোরুর গাড়ি' কবিতায় কালের-ও ইঙ্গিতবাহী। 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যগ্রন্থের 'কথা' কবিতাটিতে অতীতচারণা সূত্রে অমিয় চক্রবর্তীর আক্ষেপ, পুরোনো দিনের কত কথা 'গোরুর গাড়ির চাকায় গুঁড়িয়ে যায় নন্দীগ্রামের বাঁধের পাশে'।

আর একটি কবিতায় কবির মনে হয়েছে, তাঁর আন্তরসত্তাটি আর গঙ্গা পারের গ্রামে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তা হারিয়ে গেছে কোন্

কালে ছাউনি দেওয়া গোরুর গাড়ির চাকাতলে' (দরজা : একমুঠো : ঐ)। লক্ষণীয়, এখানেও 'গোরুর গাড়ি' কালের গতিশীলতার ব্যঞ্জনা এনেছে। আবার দীর্ঘ বিদেশ-প্রবাস-সূত্রে কবির চোখে গ্রাম বাংলার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, সেখানে দেখি,—' ....লন্ঠন ঝোলানো গরুর গাড়ি / ছায়ায় ছায়া এঁকে চলে' (প্রবাসী : মাটির দেয়াল : ঐ)। গ্রাম বাংলার অনুরূপ চিত্রকর বিমলচন্দ্রের কবিতায়ও লভ্য,—'দিগন্তে গোরুর গাড়ি দুই চাকা যাত্রী যায় মেঠো গান গেয়ে / ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ শুধু দূর থেকে সুদূরে মিলায়' (দিগন্ত আধার : বিগ্রহর এবং অন্যান্য কবিতা : বিমলচন্দ্র ঘোষ)। এছাড়া অন্যত্রও চিত্র রচনা সূত্রে 'গোরুর গাড়ি' উল্লিখিত।

পাল্কি / 'পাল্কি' হলো মানুষবাহী যান বিশেষ। দরজা-জানালা বিশিষ্ট 'কাঠের ছোট্ট ঘরের দুপাশে কাঠের দণ্ডের সাহায্যে, 'বেহারা'রা এই লোকযানটি বহন করে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, যাত্রী পালকির ভিতরে উপবিষ্ট থাকে।

কবিতায় কখনো এই 'পালকি' হয়ে উঠেছে কবির তথা 'কবিতা-সরস্বতী'-র রূপক। সমসাময়িক সনাতনপন্থী কাব্যচর্চাকে কটাক্ষ করে ভিন্ন কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী যতীন্দ্রনাথ সেই সনাতনপন্থী কবিদের 'বাণীর পাল্কিবাহী বুড়ো উড়ে বেহারা' (স্বরূপ : ত্রিযামা :) আখ্যা দিয়েছেন :

এই পাল্কিকে কেন্দ্র করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য চিত্র-ধ্বনিময় বিখ্যাত 'পাল্কির গান' (ফুলের ফসল) কবিতাটি রচনা করেছেন। এছাড়া নানাস্থানে 'পাল্কি' নিছক বর্ণনা সূত্রেও গৃহীত হয়েছে।

'ডুলি'-ও মানুষবাহী লোকযান বিশেষ। সত্যেন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকেলি' কবিতায় এই 'ডুলি' ফুলের সবুজ বৃতির রূপক হিসাবে গৃহীত,—'সবুজ ডুলিতে আসি মোরা সবে / বর বরণের লাগি'। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃতাংশটি 'কৃষ্ণকেলি' ফুলের জবানীতে উক্ত।

১। (৫) [২] জলযান : বিশ শতকের প্রথম পাদের বাংলা কাব্য-কবিতায় বহুবিচিত্র জলযানের সাক্ষাৎ মেলে। তবে তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে যে, মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় জলযানের বৈচিত্র্য অধিকতর। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় জলযানের প্রয়োগ বৈচিত্র্য তেমন না থাকলেও বিচিত্র জলযানের প্রয়োগ অনেক বেশি। এর পেছনে অবশ্য আর্থ-সামাজিক কারণও আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নৌকার ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ও রাজনৈতিক

কারণেও বিশ শতকের বাংলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। ফলতঃ তুলনামূলক ভাবে জলযানের গুরুত্বও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হ্রাস পায়। বলা বাহুল্য, নৌ-জীবী, কিংবা মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়।

নৌকা, ডিঙি, ডোঙা, ভেলা, সাম্পান ইত্যাদি জলযানের প্রয়োগ আলোচ্য কাব্য-কবিতায় দেখা যায়।

কাষ্ঠ নির্মিত 'নৌকা' একটি অতি সুপরিচিত লোকযান। আলোচ্য কবিদের প্রায় সকলের কবিতাতেই নানাসূত্রে ও নানা অর্থে নৌকা-র প্রয়োগ দেখা যায়।

কখনও রোমান্টিক পরিবেশের অনুসরণে 'নৌকা' অবসন্ন দেহের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে,--'--এলিয়ে পড়া দেহটা / 'ডাঙায় তোলা ভাঙা নৌকোটা যেন' (শেষ পহরে : শ্যামলী ১৯৩৬ : রবীন্দ্রনাথ) ; আবার কখনও বা রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের প্রতীক হিসাবেও 'নৌকা'র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'সেদিন যে মনটা ছিল নোঙর ফেলা নৌকা / বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় করে' (কাঁচা আম : আকাশ প্রদীপ : ঐ) ; মনের সাবলীলতার উপমা সূত্রেও নৌকার আগমন ঘটেছে। যেমন, 'দুষ্টু' 'তিনু'-র স্বভাব নির্দেশ প্রসঙ্গে কবি বলেন, 'মনটা ওর হালকা ছিপছিপে নৌকো / হু হু করে চলে যায় ভেসে' (অপরাধী : পুনশ্চ : ঐ) ; কোথাও দেখি, 'পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরাণী'-র বিষন্নতার সূচক হয়ে উঠেছে 'নৌকা'। বছরের পর বছর যায়। কালো বলে নন্দরাণীর বিয়ে হয় না। ভাঙা জানালার মরচে-পড়া গরাদের পাশে সে বিষণ্ণ হয়ে বসে কাল কাটায়। সমাজ সংসার থেকে সে যেন পরিত্যক্তা। তাকে দেখে তাই কবির মনে হয়, সে 'শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকো খানি ঠেকা'। (কালো মেয়ে : পলাতকা : ঐ)।

কোথাও বা যুগের বিশৃঙ্খল, বিধ্বস্ত রূপটি আধুনিক কবির মানসে নৌকার চিত্রকল্পে প্রতিভাত,--'মাঝি রইল মাঝ দরিয়ায়, নৌকা তবু ঘাটে' (মন্তব্য : একমুঠো : অমিয় চক্রবর্তী)। মাঝি ছাড়া নৌকা চলে না। সুতরাং তাকে ছাড়া নৌকায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোও অসম্ভব। সমকালীন যুগের অস্থির অনিশ্চিত লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনযাপনের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কবি মাঝি ও নৌকাকে বিচ্ছিন্ন করে, যথাক্রমে মাঝিকে মাঝ দরিয়ায় ও নৌকাকে ঘাটে লাগিয়েছেন।

'নৌকা' রূপক হিসাবেও ব্যবহৃত। কখনো দুর্ভাগ্যের রূপকার্থে,-- 'ভাগ্যের ফুটো-নৌকা ভাসায়, (মারামারীচ : দ্বিপ্রহর এবং অন্যান্য কবিতা :

বিমলচন্দ্র), কখনো বা নিঃস্বতার সূচক,—'ভাবের নৌকা হাল ভাঙা' (দক্ষিণায়নে : ঐ)।

'ডিঙা' / 'ডিঙি' / 'ডোঙা /। 'ডোঙা'-র ব্যবহারও কাব্য-কবিতায় দেখা যায়। দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্লান্তির ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে ডিঙ্গা গৃহীত হয়েছে, 'আমি আমার নিয়ম মত ঘাটের ডিঙা বাই' (খেয়াডিঙি : রেখা : যতীন্দ্রমোহন)। জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় 'মধুকর ডিঙা'র দেখা মেলে। স্মরণযোগ্য, 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-তরী হিসাবে এই মধুকর ডিঙা সুপরিচিত। এ জলযানটি কবিতায় অতীত ঐশ্বর্যের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে,—'মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে / এমনই হিজল বা তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ / দেখেছিল' . . . . (৩ সংখ্যক কবিতা : রূপসী বাংলা)। অনুরূপ উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যাবে।

অমিয় চক্রবর্তীর 'প্রাগতিক' (একমুঠো) কবিতায় কবিমানস ডোঙার রূপকাশ্রিত,—'কাদার নোঙর ভাঙা মানস ডোঙার ধরে হাল'। আবার যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় সন্ধ্যাকালীন নদীতীরের চিত্রকল্পে ডোঙার উল্লেখ ঘটে,—'ডোঙাগুলি কূলে বাঁধা শিহরিয়া কাঁপে সন্ধ্যার সমীরে' (সরোবরে সন্ধ্যা : রেখা)।

কাঠের তক্তা-নির্মিত 'ভেলা'র উল্লেখও দেখা যায়। সুপ্রচলিত লৌকিক একটি ছড়া অবলম্বনে কবি বিষ্ণু দে পার্থিব ঐশ্বর্যের তুলনায় জীবনকে অধিকতর মূল্যবান রূপে চিত্রিত করেছেন। সেখানে 'যে কন্যাটি রাঁধেন বাড়েন, তিনি বলেন সেধে / সিন্দুকটা ভেঙে এসো ভেলা ভাসাই বেঁধে' (ছড়া—১ : সন্দীপের চর)। লৌকিক ছড়ার হালকা চালের মধ্যেও জীবনবাদী কবি এখানে জীবনের এক গভীর সত্য উচ্চারণ করেছেন ; তিন কন্যার মধ্যে যিনি রাঁধেন বাড়েন, তিনি 'নদেয় বান' দেখে জীবন-রক্ষাকেই শ্রেয়তর মনে করেছেন। তাই সিন্দুক ভেঙে 'ভেলা' বানাতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত নন। স্বভাবতই 'ভেলা' এখানে জীবনের মহার্ঘতার দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

পিছনদিকে দুটি হাল বিশিষ্ট ছোট নৌকা, 'সাম্পান'-ও অপাংক্তেয় হয়ে থাকেনি। রোমান্টিক কবি মানস 'আঁকাশ'কে প্রিয়া কল্পনাসূত্রে তৃতীয়ার চাঁদের সঙ্গে সাম্পানের সাদৃশ্য খুঁজে পায়,—''তৃতীয়া চাঁদের 'সাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া' (চাঁদনী রাতে : সিন্ধুহিন্দোল ১৯২৭ : নজরুল)।

১। (৬) বাদ্যযন্ত্র : আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতায় বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

১। (৬) [১] আনদ্ধ শ্রেণীভুক্ত বাদ্যযন্ত্র : ফাঁপা কাঠের খোলের দুই মুখে পুরু চামড়া দিয়ে 'ঢাক' তৈরী হয়। বাংলার লোকসমাজের প্রায় সমস্ত পুজা-উৎসব অনুষ্ঠানেই ঢাকের বাজনা শোনা যায়। প্রাচীনকালে, এমন কি মধ্যযুগেও যুদ্ধ উপলক্ষে বা কোনো বিশেষ ঘোষণা-সূত্রে 'ঢাক' বাজানোর প্রচলন ছিল। কবিতায়-ও নানা সূত্রে ঢাকের ধ্বনি প্রতি-ধ্বনিত। যেমন, চৈত্র মাসের 'গাজন' উৎসবের চিত্র রচনায়, রবীন্দ্রনাথ ঐ ধ্বনিটাকে পাঠকের শ্রুতিগম্য করে তোলেন,—'চড়ক ডাঙায় ঢাক বাজে ঐ / ড্যাডাং ড্যাঙ' (ছড়া : ৫ সংখ্যক)। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাতেও সমসূত্রে 'ঢাকে'র উল্লেখ, 'কাঁটা ঝাঁপের বাজনা বাজে / ঢাকের পিঠে পাখনা দোলে' (কাঁটা ঝাঁপ : কুহু ও কেকা) ; 'ঢাকের' অনুরূপ প্রয়োগ যতীন্দ্রনাথের 'শিবের গাজন' (মরীচিকা) কবিতাটিতেও লভ্য।

কোনো কোনো কবিতায় 'ঢাক' গভীরতর তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। যেমন, বিপ্লবাত্মক চেতনা-সম্পন্ন সুকান্ত-র কবিতায় প্রতিক্রিয়াশীল ধনী-শ্রেণীর ষড়যন্ত্রে সমাজের সাধারণ মানুষের করুণ অবস্থা পরিস্ফুটনে 'ঢাক' ধনবানের ঐশ্বর্য ও আত্মপ্রচারের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত,—'বড়-লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায়' (পুরনো ধাঁধা : মিঠেকড়া). উল্লেখ্য, শোষণতান্ত্রিক সমাজের চিত্র প্রত্যক্ষ করে কবির মনে হয়েছে, নিহত পশুর চামড়ায় প্রস্তুত 'ঢাক' যেমন সাধারণ মানুষকে আনন্দ দান করে, তেমনি চতুর চক্রান্তে ধনীশ্রেণী সাধারণ মানুষকে শোষণ করে শুধু আরও ধনবানই হয়ে ওঠে না, প্রচারের মাধ্যমে সমাজে নিজেদের 'মহান' রূপে প্রতিষ্ঠার-ও প্রয়াসী হয়। প্রায় অভিন্ন সূত্রে আর এক কবি লিখলেন, 'বাজে মৃদঙ্গ বাজে ঢাকঢোল / ....বেতারে বেতারে প্রচারের হীন চাতুরী' (মহাসাময়িক : মাধ্যমিক : বিমলচন্দ্র ঘোষ)। বেতার একটি গণমাধ্যম। শাসকগোষ্ঠী স্ব-স্বার্থে তাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। রচনায় সমকালীন পরিস্থিতির পরি-প্রেক্ষিতে 'ঢাক'-এর এই ব্যবহার বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

কখনো বা 'ঢাক' যুদ্ধশেষের কলরোল-বিশৃঙ্খলা ও প্রচারের প্রতীক। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে দুর্ভাগ্যজনক রক্তক্ষয়ী বিপর্যয় ঘটেছিল, তা দেখে কবিরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মানুষের অপরিসীম

লোভ ও অসাম্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে কবি দেখেছেন, উদ্দাম ঢাকের শব্দে সে প্রশ্নের উত্তর কোথায়' ৮ (দিন বদলের পালা : ঘুম নেই :)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মুখবন্ধ' ('চিরকুট') কবিতাটিতেও 'ঢাক' আত্মপ্রচারের প্রতীকার্থে প্রযুক্ত। ঐতিহাসিক 'স্বরাজ' আন্দোলনের নেতাদের প্রতি গণবিপ্লব চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবির কটাক্ষ,—'স্বরাজে' সেলামী মিলবে ; প্রভুরা পেটায় ঢাক'। 'স্বরাজ আন্দোলন' কবির কাছে প্রহসন বলে মনে হয়েছে। কবি তাই এ প্রয়াসকে নিছক প্রচার ধর্মী মনে করে ঢাকের প্রতীকে তার আভাস দিলেন।

জগত ও জীবনের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেবতার প্রতি আস্থাহীন যতীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি,....."দেবতার পেট,.....না হ'লেও ঢাক। অন্ততঃ ফুলে' হবেই কচুরি" (খিচুড়ি : মরুশিখা)। 'ঢাক' এখানে বিশাল অর্থে গৃহীত, তা দেবতার স্বার্থপরতারও ইঙ্গিতবাহী।

'ঢাক' জাতীয় বাদ্যযন্ত্র 'জয়ঢাক'-এর জয়ধ্বনিও কবিতায় অশ্রুত থাকেনি। প্রতিমা বিসর্জনের চিত্ররচনায় তা একমাত্রিক ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে,.....'.....প্রতিমা বিসর্জনের জয়ঢাক বাজে দূরে' (বিজয়া দশমী : ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ)।

'ঢাক' জাতীয় আর একটি বাদ্যযন্ত্র 'ঢোল'ও কবিতায় এনেছে বিচিত্র দ্যোতনা। তুলনামূলকভাবে আকৃতিতে ছোটো এ লোকবাদ্যটির দু-দিকেই বাজানো হয়। নাম-সংকীর্তনের ক্ষেত্রে বাংলার লোক সমাজে 'ঢোল' বহুল-ব্যবহৃত, বিবাহোপলক্ষেও 'ঢোল' বাজানোর প্রচলন নানা স্থানে দেখা যায়।

বাস্তব সচেতন যতীন্দ্রনাথ জগত ও জীবনের নানা বঞ্চনা, দুঃখ-দুর্দশায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে, অন্ততঃ 'একসন্ধ্যা' সুন্দরের 'আরতি' করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে প্রার্থনাতেও সমাজের বাস্তব রূপকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুন্দরের মূলে যে অসুন্দর রয়েছে, তা তাঁর প্রার্থনাতেই তাই ধরা পড়ে,—'মরণান্তে প্রগাধিত / অবোলা পশুর চামড়ায় / কাড়া ও নাকাড়া ঢোল / করিয়া উঠুক কলরোল' (উৎসব : ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ)।

'কাড়া-নাকাড়া-ঢোল' এখানে অন্যকে শোষণ করে আনন্দোৎসবের নিষ্ঠুর বর্বরতার পরিচায়ক। আবার সাম্যবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ আশা-বাদী বিষ্ণু দের কবিতায় 'ঢোল' উৎসব তথা আনন্দের, আশার প্রতীক,.....' .....আশাহতও / আশায় জেগে ওঠে, ঢোল বাজে / নাচের ফুল ঝরি.....'

(প্রতীক্ষা : অন্বিষ্ট। ১৯৫০ বিষ্ণু দে)। এ প্রসঙ্গে জসীমউদ্দিনের 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' কাব্যটি স্মরণযোগ্য। এ কাব্যে উল্লিখিত বিবাহানুষ্ঠানের পরিবেশ চিত্রণসূত্রে 'ঢোলের' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত।

কখনো 'খোল' শ্রী' যুক্ত হয়ে কবির ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশের সহায়ক হয়েছে। যেমন, যতীন্দ্রনাথের কাছে জীবনের সমস্ত আনন্দ-ই কৃত্রিম বলে মনে হয়। তাই কবি যখন বলেন, 'লাগে বন্ধু লাগে মিঠে, ...ভাড়াটে শ্রী খোলে উঠে তাধিনি তাধিনি ধিনি বোল' (দোলে দোলে উঠি : ত্রিযামা), তখন তাঁর ক্ষোভ ও ব্যঙ্গটুকু গোপন থাকে না। কখনো বা খোল করতাল সহযোগে 'নগর সংকীর্তনে কবি ছদ্মভক্তির আড়ম্বর লক্ষ্য করেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে কবি তাই বলেন, "যোগাড় করিয়া খোল করতাল সঙ্গী দু' একজন, / পথে পথে গেয়ে বেড়াব তোমার বদনামকীর্তন" (নবপন্থা : মরুশিখা : ঐ) ; তথাকথিত ভণ্ড ঈশ্বর ভক্তদের প্রতি কবির বিরূপতাটুকু এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জগত ও জীবনের সর্বত্র অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-উৎপীড়ন দর্শনে ব্যথিত কবি ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে সংশয়গ্রস্ত হন ; ঈশ্বরের নিন্দাকীর্তনে প্রবৃত্ত হন।

এযুগের কাব্য-কবিতায় 'ঢোল' জাতীয় বিশেষ 'মাদল'-ও অপাংক্তেয় হয়ে থাকেনি। নিত্যতার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে মানুষ অনন্তের আহ্বান শুনতে পায় না। উৎসবের দিনে সেই অনন্তের আহ্বানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বলে কবি মনে করেন। উৎসবের দিনে তাই কবি নিত্যতার সঙ্গে অনিত্যের সম্মিলনের সাধনা করেছেন,—'মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল / যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল / অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন, / যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন' (উৎসবের দিন : পূরবী : রবীন্দ্রনাথ)। 'মাদল' এখানে মুক্ত আনন্দের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে।

কখনো বা রোমান্টিক কবি বর্ষার রাতে হৃদয়ে এক অদ্ভুত আবেগময় আলোড়ন অনুভব করেন, যা বস্তুতপক্ষে প্রেমানুভূতিরই নামান্তর,—'শ্রাবণ রাতে----বেসুরা এই মনের মাঝে বেতাল তালে মাদল বাজে' (কেয়াফুল : পাঞ্চজন্য : যতীন্দ্রমোহন)। মেঘ গর্জনের রূপক হিসাবেও 'মাদল' গৃহীত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের অকাল-প্রয়াণে নজরুলের মনে হয়েছে,—'স্বর্গে বাদল মাদল বাজিল ; বিজলী উঠিল মাতি' (সত্য কবি : ফণি মনসা : নজরুল)।

রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' ('পুনশ্চ') কবিতাটিতে 'মৃদঙ্গ-এর' 'কেটে যাওয়া তাল প্রেমিকের বিরহবেদনাজাত উদাসীনতার ইঙ্গিতবহ। 'প্রেয়সী

মধুশ্রী গেছে সুমেরু শিখরে / সূর্য প্রদক্ষিণে'। তাই প্রেমিক শৌরসেনের মন উদাসী, 'অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে'। বলা বাহুল্য, এর জন্য শৌরসেন চূড়ান্ত শাস্তি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, প্রেমের অপূর্ব রোমান্টিক আবহ নির্মাণে 'মৃদঙ্গে'র এ ব্যবহার সুপ্রযুক্ত।

কখনো বা কল্পনাপ্রবণ কবি মানস মেঘলোক পরিভ্রমণ ক'রে দেখেন, মেঘেদের কেহ মৃদঙ্গ করে মৃদুধ্বনি / কেহ নর্তনে রত' (মেঘলোকে : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ),—'মৃদঙ্গে মৃদুধ্বনি' মেঘগর্জনেরই ইঙ্গিতবাহী।

'ডমরু' শিব বা নটরাজের নিত্যসঙ্গী বাদ্যযন্ত্র; প্রলয়ের পূর্বমুহূর্তে নটরাজ তাঁর ডমরুর বাদ্যে ত্রিলোককে আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত প্রদান করেন,.....এ পৌরাণিক চিত্র সুপরিচিত। কবিতায়ও প্রলয়ের সংকেত বাহী রূপে 'ডমরু' চিহ্নিত।

রবীন্দ্রনাথের 'সানাই' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের 'বিপ্লব' কবিতাটিতে দেখি, 'ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল' তা আশু বিপ্লবেরই দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। আবার কবি অমিয় চক্রবর্তী সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছাসের শব্দে ডমরুধ্বনি শুনেছেন,—'ফ্যান তলে ডেক-এ শুনি নিরন্ত ডমরু' (ইলেকট্রিক ফ্যান : খসড়া)।

'খাপছাড়া'র 'ভূমিকা' কবিতায় যাদুকর তার যাদুপ্রদর্শনের পূর্বে ডুগডুগি বাজিয়ে দর্শকদের আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত সে চিত্রটি এই রকম, 'ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে / ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে / পথের ধারে বসল জাদুকর। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, করুণানিধানের 'রেণু' (ঝরাফুল) কবিতায় রথের মেলায় শিশুর জন্য কেনা 'রাঙা ডুগডুগি'র উল্লেখ।

১। (৬). [২] **ঘন শ্রেণীভুক্ত বাদ্যযন্ত্র :** পিতল নির্মিত সহগ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ 'করতাল' কোথাও ঐশ্বর্যময় আড়ম্বরের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে,—'রাজা করে রণযাত্রা, বাজে ভেরি, বাজে করতাল, / কম্পমান বসুন্ধরা' (যাত্রা : বিচিত্রিতা : (১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ), কোথাও বা নির্মল কৌতুকরস সৃষ্টি সূত্রে 'করতাল' হয়েছে 'গলদা চিংড়ির দাঁড়া' (৭ সংখ্যক কবিতা : ছড়া : ঐ)।

কবিতায় কাঁসা—নির্মিত 'কাঁসর' ও 'ঘন্টা' কোন কোন স্থানে বহ্বাড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিভাত করেছে। অনেক সময়েই লক্ষ্যের তুলনায় উপলক্ষ মুখ্য হয়ে ওঠে, তাই "একান্ত নিষ্ঠায় যদি গৃহীস্মরে নিত্য নারায়ণ, / গৃহ তুলসীর মূলে, পূজার কাঁসর ঘন্টা বাজে, / শঙ্খের

উদাত্ত স্বরে শিহরি 'সে মরি' যায় লাজে'' (সম্বর্ধনা সভায় : পাঞ্চজন্য : যতীন্দ্রমোহন)। স্মরণযোগ্য, 'রসচক্র নামক সংস্থার পক্ষ থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদ্র কবিকে যে জন-সংবর্ধনা দেওয়া হয় তার উত্তরে কবি এ কবিতাটি পাঠ করেন।

১। (৬) [৩] তত শ্রেণীভুক্ত বাদ্যযন্ত্র : 'একতারা', এক তার বিশিষ্ট একটি অতি পরিচিত বাদ্যযন্ত্র। 'একতারা' বলতেই আমাদের চোখের সামনে বাউলের মূর্তিটিই ভেসে ওঠে। অবশ্য বাউল ছাড়াও বৈষ্ণব বৈরাগী, কিংবা মুসলমান ফকিরের হাতেও এই লোক-বাদ্যযন্ত্রটি দেখা যায়।

আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় একাধিক স্থানে 'একতারা' এনেছে নিঃসঙ্গতার দ্যোতনা। 'একতারা' নামটির মধ্যেই একাকীত্ব তথা নিঃসঙ্গতার ইঙ্গিত বিদ্যমান। কবিরা এ ইঙ্গিতকেই আরও অর্থবহ করে তুলেছেন।

কবি উপলব্ধি করেছেন যে, মানুষকে একদিন নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে এ জগত সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে, 'যেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সংগীত মন্দিরে / একাকীর একতারা হাতে' (৪ সং কবিতা : প্রান্তিক ১৯৩৬ : রবীন্দ্রনাথ)। স্পষ্টতঃই 'একতারা' এখানে নিঃসঙ্গতার মাত্রা যোজনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কখনো বা প্রবাস জীবনের নিঃসঙ্গতা বোঝাতে-ও 'একতারা' কবিতায় প্রযুক্ত হয়েছে,--'এমনি করে সারা প্রবাস জীবন / একতারাটি নিয়ে গাইল একই গান' (প্রবাসী : মরীচিকা : যতীন্দ্রনাথ)।

অন্যত্র, যুগের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, হিংস্রতায় জীবনানন্দের অন্তরে দ্বন্দ্ববিক্ষোভ এক চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে, 'একটি নীরব লোকের মাঠের উপর দিয়ে চুপে' হেঁটে যাওয়া থেকে শুরু করে 'সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন'?—এ প্রশ্নের উত্তর একই সূত্রে নিহিত,—'সে-সব কোরাসে একতারা' (দোয়েল : মহাপৃথিবী : জীবনানন্দ)। 'কোরাস' ও 'একতারা'-র সহাবস্থান আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন মনে হলেও 'একতারা' এখানে অভিন্ন অর্থেই গৃহীত। আর কোরাস বহুজনে গাইলেও গানের কথা ও সুর তো একই থাকে। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে এখানে যুগের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতাও দ্যোতিত হয়েছে। 'কোরাস' হল অনেকের সমাবেশ, আর সে সমাবেশের একজন হয়েও মানুষ আজ একতারার মতই একান্ত একাকী।

দুঃখ দুর্দশাময় বাস্তব জীবন করুণানিধানের 'বাসনা' কবিতাটিতে (ঝরাফুল) 'একতারার কর্কশ রূঢ় গিটকিরির' রূপকাশ্রয়ে প্রতিভাত।

এছাড়া বাউলের চিত্র রচনায় 'একতারা'র উল্লেখ মেলে। সেখানে 'ঘুঙুর গাথা একতারাটি নিয়ে / ঘুর-পাকে সে ভঙ্গী করে নাচে' (বাউল : একতারা : কুমুদরঞ্জন)। উল্লেখ্য, পল্লীবাসী কবির একটি কাব্যগ্রন্থের নামই 'একতারা'।

. ১। (৬) [৪] শুষির শ্রেণীভুক্ত বাদ্যযন্ত্র : আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতায় 'শুষির' শ্রেণীর লোকবাদ্য বাঁশির সর্বাধিক ব্যবহার দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য কবিগণের প্রায় প্রত্যেকের কাব্য-কবিতাতেই কোনো না কোনো সূত্রে 'বাঁশী'-র উপস্থিতি ঘটেছে।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাঁশির যোগ অনিবার্য। তিনি প্রেমিক, 'প্রেমামৃত সিন্ধু'; তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী এই বাঁশি। স্বভাবতই 'বাঁশি' কখনো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের, কখনো বা তাঁর প্রেমের প্রতীকার্থে কবিমানসে প্রতিফলিত।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতার মতো আলোচ্য পর্বের কবিতাতেও 'কালার' বাঁশি শ্রীরাধিকাকে পাগলিনী করেছে,—যতীন্দ্রমোহন নিজ জীবনে শ্রীরাধিকার সেই আধ্যাত্মিক প্রেম প্রার্থনা করেছেন, 'আজ সব ভুলিয়ে বাজুক কালার পাগল করা বাঁশি' (বৃন্দাবনী : নাগকেশর ১৯১৭)। অন্যত্র, শ্রীরাধিকার প্রেম বর্ণনায় 'বাঁশি' শ্রীকৃষ্ণের প্রতীকে পরিণত, 'কোথায় বেজেছে বাঁশি যমুনা কূলে'—তাই 'গৃহত্যাজি' সবে চলে'। রাধাও চলেছেন—'সেথা বাঁশিতে ভুলে' / কালো জলে ভরা সেই যমুনা কূলে' (শ্রাবণী : জাগরণী : ঐ); অনুরূপ, 'কোন্ বনে বাজে বাঁশি' ব'লে (সোম : হোমশিখা) সত্যেন্দ্রনাথ কৃষ্ণের উপস্থিতিরই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দান করেছেন। এর পূর্ব পংক্তিটিতে তার প্রমাণ মেলে। সেখানে দেখি, 'কোন্ গোপী করে অভিসার' (ঐ)। এরকম প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'ব্রজের বাঁশী বাজে সে আজ কোন্ মথুরায়' (অবসান : ফুলের ফসল : ঐ)। বাঁশীর উল্লেখে এখানে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান সূচিত।

রোমান্টিক প্রেমের আবহ পরিস্ফুটনেও 'বাঁশি'-র ব্যবহার ঘটেছে। যেমন, 'বিবাহের প্রথম বাসরে / দিকে দিগন্তরে শাহানায় বেজেছিল বাঁশি / উঠেছিল কল্লোলিত হাসি' (৮ সংখ্যক কবিতা : শেষলেখা। ১৯৪২ : রবীন্দ্রনাথ), 'বাঁশি' এখানে জীবনের প্রথম প্রেমের মধুরতার ইঙ্গিতবাহী।

বিরহের শেষে মিলনের ইঙ্গিতও 'বাঁশি'র প্রয়োগে সূচিত,—'বাঁশি বাজে ওই এবার নয়নে লেগেছে ঘোর / এতদিনে বুঝি বিরহ যামিনী হয়েছে ভোর' (মিলনোৎকণ্ঠা : স্মরগরল : মোহিতলাল)। আবার অন্ধকার রাতে টিটি পাখির টিটকারির মধ্যেও যতীন্দ্রমোহন ইমনবেহাগে

বাঁশি বাজিয়ে প্রেম-কামনায় রত,--'তারি মাঝে আমি ইমনবেহাগে সেধেছিনু বাঁশিখানি' (মিলন : রেখা)।

বিরহেই প্রেমের সৌন্দর্য। তাই যখন, 'মাঝে মাঝে রাখাল পাড়ার একটি শুধু বাঁশি, / গভীর রাতে প্রাণের পাতে পরশ করে আসি' (অপরূপ প্রেম : জাগরণী : ঐ), তখন বিরহ কাতরা নায়িকার দয়িতের মূর্তিটি 'বাঁশি'র প্রতীকে বিধৃত, কখনো প্রেমপিয়াসী রোমান্টিক নজরুল তাঁর মানস-প্রিয়ার উদ্দেশে বলেন, 'তোমায় পেলে থামত বাঁশি' (গোপন প্রিয়া : সিন্ধু হিন্দোল)। 'বাঁশি' এখানে কবির তীব্র বিরহ কাতরতার ব্যঞ্জনা এনেছে।

অনুরূপ সূত্রে মোহিতলালের কবিতায়ও 'বাঁশি' প্রযুক্ত,—'বাঁশির ও সুর বলছে না ত' আমার তরেই সে বিবাগী' (ঘরের বাঁধন : স্বপন পসারী)। রোমান্টিক মানস চির-অতৃপ্ত বাস্তব লোকের পাশে তার গড়ে তোলা কল্পলোকের সঙ্গে সে কোনো দিনই মিলিত হতে পারে না। তাই রোমান্টিকেরা, চিরচঞ্চল, 'সুদূরের পিয়াসী', চির পথিক। তাঁদের এই সুদূরপিয়াসা 'বাঁশি'র মধ্য দিয়ে বহু কবিতায় দ্যোতিত। কবি অনুভব করেন, তাঁর মানসীর অবস্থান যেন সুদূর অতীত রাজ্যে। সেই সুদূরের ইঙ্গিতবাহী হ'ল 'বাঁশি',—'বুকে যে তার বাজল বাঁশি বহু যুগের ফাগুন দিনের সুরে / কোথায় অনেক দূরে / রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপনজন' (পলাতকা : পলাতকা : রবীন্দ্রনাথ); কখনো বা 'বাঁশি' নিরন্তর পথ চলার ইঙ্গিতবহ—'পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা' (ফাঁকি : ঐ) / 'বাঁশি' এখানে সুদূরের প্রতীক। অনেক ক্ষেত্রে 'বাঁশি' সুদূরের আহ্বানের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'শুনিতেছে কে সে কার উদ্দেশে / সাহানায় বাঁশি বাজে' (আগমনরাতি : বীথিকা : রবীন্দ্রনাথ)। একই সূত্রে 'বাঁশি'র ব্যবহার যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় লক্ষণীয়। যেমন, 'খাঁচার পাখিরে কেন ডাকে তব নীল আকাশের বাঁশি' (বাসন্তী : নীহারিকা)। কখনো বার্ধক্যে উপনীত কবি মৃত্যু সমাগম ভেবে বলেন, 'আসিছে বাঁশীর ডাক' (নও জোয়ার : ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ)। বলা বাহুল্য, এ ডাক মৃত্যুরই ইঙ্গিতবাহী, Mystic চেতনা-সূত্রেও কবিতায় 'বাঁশি'র বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষণীয়। সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্লোকে এক অপূর্ব প্রেরণা শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। এই প্রেরণা শক্তিই তাঁর কাব্যে কখনো জীবন দেবতা কখনো বা সৌন্দর্যলক্ষ্মী প্রভৃতি নানা মূর্তিতে প্রতিভাত।

কবি উপলব্ধি করেছেন যে, অন্তর্লোকের সেই প্রেরণা শক্তি একদিকে যেমন তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করেন, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বজগতও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই স্বীয় রসসৃষ্টির ক্ষমতা সম্বন্ধে কবির স্বীকারোক্তি,—'হে রাজন্— তুমি আমারে / বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার / তোমার সিংহ দুয়ারে', (১৯ সংখ্যক কবিতা : উৎসর্গ। ১৯১৪) ; নিত্যনবসৃষ্টি ধারার দ্যোতনা সৃষ্টিতে 'বাঁশি' এখানে সার্থক-প্রযুক্ত। স্মরণযোগ্য, 'খেয়া'র 'বাঁশি' কবিতায় বাঁশি সৃষ্টি প্রতীক রূপে ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত, '—তোমার বাঁশিখানি / শুধু ক্ষণেক তরে / দাও গো আমার করে'।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থের ৬ সংখ্যক কবিতাতেও 'বাঁশি' অনুরূপ প্রতীকী তাৎপর্যে বিধৃত, 'যে বাঁশি বাজিয়েছি / ভোরের আলোয়—— / তার শেষ সুরটি বেজে থামবে / রাতের শেষ প্রহরে' ; কবির 'দিনাবসান' (পরিশেষ : ১৯৩২) কবিতাটিও সমসূত্রে স্মরণযোগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় 'ব্যর্থ জীবন' ভাঙা 'বাঁশি'র রূপকাশ্রিত। 'ভাঙা বাঁশি আর কি কাজে লাগিবে' (যথার্থ সার্থকতা : কুহু ও কেকা) ; আবার জীবনের আন্তর সম্পদ ও আকর্ষণের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি সূত্রে,—'বাঁশি ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি' (সত্য-কবি : ফণিমনসা : নজরুল)।

বিপ্লব চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবির লেখনীতে 'বাঁশির ছন্দ' সচেতকের ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে, প্রথম প্রয়োজন আত্ম-সচেতনতার। 'বাঁশি' সেই সচেতনতার উদ্বোধক।—'ঠাণ্ডা হাওয়ায় তীব্র বাঁশির ছন্দ / মনেরে জাগায় সাবধান হুঁশিয়ার' (প্রতিদ্বন্দী : পূর্বাভাস : ১৯৫৫ সুকান্ত)। জীবনের নানা ভ্রষ্টাচারে ব্যথিত যতীন্দ্রনাথের কাছে অসহায় মানবজীবন 'বাঁশি'র বন্দীদের রূপকে বিধৃত। কবির মনে হয়েছে, 'পড়িয়া মোদের ফাঁদে যে বাঁশি হাসে ও কাঁদে' (মরানুষ : ত্রিযামা) সেই বাঁশির মতই মানুষও আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম, কখনো বা বাঁশির উন্মেষে শিশুর কলকাকলি আভাসিত,— 'হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশি' (ছিন্নমুকুল : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ)।

বিশিষ্ট সামুদ্রিক শামুকের খোলস নির্মিত বাদ্য / 'শঙ্খ' বা 'শাঁখ' বাংলার সমাজে অতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলার লোকসমাজের সমস্ত শুভানুষ্ঠানেই 'শঙ্খ' ধ্বনিত হয়। একারণে লোক সমাজে 'শঙ্খ' শুভসূচক হিসাবে চিহ্নিত। প্রাচীনকালে যুদ্ধ

বিরতি উপলক্ষেও 'শাঁখ' বাজানো হত। শঙ্খ তাই লোকসমাজে শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক। যেমন, সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি শুনে কবি মানসিক শান্তি লাভ করেন,—'গৃহমন্দিরে বেজে ওঠে শাঁখ—শ্রান্তি ভুলানো শান্তির ডাক' (জীবন সঙ্গিনী : পাঞ্চজন্য : যতীন্দ্রমোহন)। স্পষ্টতই শাঁখ এখানে শান্তির প্রতীক।

কোনো কোনো কবিতায় 'শঙ্খ' বা 'শাঁখ' শান্তি ও মহামিলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'ত্রিকুটে' কবি করুণানিধান যে অপূর্ব অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, সেখানে জন্ম-মৃত্যু তাঁর কাছে সমার্থক হয়ে উঠেছে। 'অব্যয় অখণ্ডে'র সঙ্গে মিলনেই যে জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা, তা অনুভব করে কবি সকলকেই সেই সার্থকতা অর্জনে আহ্বান করেছেন,—'বাজাও শাঁখ, বাজাও শাঁখ, মিলাও তায় প্রাণের ডাক' (ত্রিকূট : শতনরী : করুণানিধান), আবার অভিনব উল্লাসে উদ্দীপ্ত হবার জন্য অন্যত্র অনুরূপ আহ্বান সূত্রে 'শঙ্খে'র ব্যবহার লক্ষণীয়,—'বাজাও শঙ্খ, বাজাও বিষাণ,··অভিনব উল্লাসে' (জীবন বন্যা : বেণু ও বীণা : ১৯০৬ সত্যেন্দ্রনাথ)।

কোনো কোনো কবিতায় 'শাঁখ' প্রেমের দ্যোতনাও সৃষ্টি করেছে। যেমন,—'হঠাৎ শুনে সন্ধ্যারতির শাঁখ / পড়ল মনে আজ কি তবে আসবে না আর ডাক' (ডাক : নীহারিকা : যতীন্দ্রমোহন)। সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি এ কবিতায় প্রিয়াবিরহিত কবিকে স্মৃতিব্যাকুল করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র (১৯১৭)-র 'শঙ্খ' কবিতায় শঙ্খ বিশ্ব-স্রষ্টার মঙ্গল-আহ্বানের প্রতীকে পর্যবসিত।

সমাজ সচেতন বাস্তববাদী কবির চোখে কখনো বা এই শাঁখ সম্পদ-ঐশ্বর্য-আনন্দের প্রতীক। দুর্ভিক্ষ-কবলিত বাংলার গ্রামের করুণ দুর্দশা-গ্রস্ত রূপচিত্রণে কবির আক্ষেপোক্তিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়,—সেখানে 'শূন্য ঘর শূন্য গোলা, / ধান বোনা জমি আছে পড়ে',/বিনা শাঁখে সন্ধ্যা হয় / সূর্য বসে পাটে' (স্বাগত : চিরকুট : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

আবার জনগণের মুক্তিকামী কবি কারখানার সাইরেণের রূপকার্থে শাঁখকে গ্রহণ করে, তাকে মুক্তির ইঙ্গিতবাহী করে তুলেছেন,—'অদূরে হঠাৎ বাজে কারখানার পাঞ্চজন্য ধ্বনি, / দেখি দলে দলে লোক ঘুম ভেঙে ছুটেছে তখনি, / মনে হয়, যদি বাজে মুক্তি কারখানার তীব্র শাঁখ' (জনরব : ঘুম নেই : সুকান্ত)।

কখনো 'শঙ্খধ্বনি'-তে মেঘ গর্জন বা বর্ষাগম সূচিত। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহনের পর বর্ষা যখন 'নতুন কুমার' এর রূপকে কবির চোখে

ধরা পড়ে, তখন তিনি বলেন, 'পূর্বতটের সূতিকা কুটির / সহসা ভরিল শঙ্খরবে, / মৃতবৎসার নতুন কুমার' (বৈশাখ : সায়ম : যতীন্দ্রনাথ)। গ্রীষ্মের তাপ-দহনে-দগ্ধা পৃথিবীর আবির্ভাব এখানে 'মৃতবৎসা' রূপে। সেইসূত্রে পূর্ব আকাশ এবং মেঘ গর্জন যথাক্রমে 'সূতিকাকুটির' ও 'শঙ্খ-রবে'-র রূপকে বিধৃত। এছাড়া কবিতায় বর্ণিত বিবাহানুষ্ঠানাদির চিত্র রচনা সূত্রেও 'শঙ্খধ্বনি' প্রতিধ্বনিত।

'শিঙা' হ'ল মহিষের শিঙের তৈরি লোকবাদ্যযন্ত্র বিশেষ। এর দেখাও কবিতায় মেলে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'তপোভঙ্গ' (পূরবী) কবিতায় 'শিঙা'র বিশিষ্ট প্রয়োগে কালের চক্রাবর্তন সূচিত, 'কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে, / দিন ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠ গৃহ মাঝে, / উৎকণ্ঠিত বেগে'।

যতীন্দ্রনাথের 'মরুশিখা'-র 'শিবস্তোত্র'-তে শিবের রূপ বর্ণনা সূত্রে 'শিঙা' 'ডুগডুগি'-র ব্যবহার লক্ষণীয়।

আবার যুগ সচেতন সুভাষ মুখোপাধ্যায় যুগের ভ্রষ্টাচার ও বন্ধ্যাত্বে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, এযুগে 'বাতাস পিঠে চাবুক হানে, আকাশ আনে বজ্র। শান্তি কবে ফুঁকেছে 'শিঙে' (কাব্য জিজ্ঞাসা : চিরকুট ১৯৯৫); লক্ষণীয়, 'ফুঁকেছে শিঙে' উক্তিতে শান্তি-সম্ভাবনার বিলুপ্তি ব্যঞ্জিত।

২। বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি :

২। (১) ছড়া : লোকসমাজে সুপ্রচলিত কিছু ছড়া সব দেশের নগর সমাজেই যথেষ্ট জনপ্রিয়। বাংলার লৌকিক ছড়া সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

বাংলার শিশুর সাহিত্য রস-আস্বাদন শুরু হয় ছড়াকে আশ্রয় করে। চিত্রধ্বনিময় ছড়ার প্রতি শিশুদের আকর্ষণ অপরিসীম। শিশুর স্নান, ভোজন, ঘুম, খেলা, ভ্রমণ ইত্যাদির সঙ্গেও ছড়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বভাবতই বাংলার শিশুমহলে ছড়ার বিপুল আধিপত্য। বাংলার লৌকিক ছড়াগুলির প্রতি বিদ্বৎসমাজের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। শৈশবে শোনা প্রচলিত কোনো কোনো লৌকিক ছড়া তাঁর জীবনে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তার প্রমাণ পাই তাঁর নানা রচনায়। উল্লেখযোগ্য, 'ছেলে ভুলানো ছড়া' (লোক সাহিত্য) প্রবন্ধে তিনি ছেলে ভুলানো ছড়ার আলোচনা কালে সেই বাল্যস্মৃতির রোমন্থন করেছেন।

তাঁর অধিকাংশ শিশু-কেন্দ্রিক কবিতায় লৌকিক ছড়ার ছন্দ, আবহ ও চরিত্রাদি অনুসৃত হয়েছে। সম্ভবত, শিশু ও বালক মনের কাছে পৌঁছোনোর এ এক কৌশল। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'ছড়ার ছবি' 'ছড়া' প্রভৃতি কাব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

তাঁর 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে অবশ্য লৌকিক ছড়ার প্রভাব-প্রতিফলনের আরো একাধিক কারণ বিদ্যমান। প্রথমত, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' (১২৯২) পত্রিকার উদর পূরণার্থে কবিকে এ ধরণের শিশু উপযোগী কবিতা লিখতে হয়; ইতঃমধ্যেই তিনি লৌকিক ছড়ার বিচিত্র সম্ভারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যার প্রমাণ 'মেয়েলি ছড়া', 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রভৃতি রচনা, ছড়া সংগ্রহের প্রয়াস ইত্যাদিতে লভ্য। বলা বাহুল্য, যে এই লোকঐতিহ্য-চর্চার প্রভাব শুধু 'শিশু'তেই নয়, কবির অন্যান্য নানা কাব্যগ্রন্থেও প্রতিফলিত। তৃতীয়ত, স্ত্রী-র মৃত্যুতে পিতা হিসাবে নিজের শিশু পুত্র-কন্যাদের মাতৃবিয়োগজনিত গভীর বেদনা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। আর সে কারণে শিশুর জগতটিকে সম্যক প্রতিবিম্বনে ছড়ার অনুসৃতি লক্ষণীয়; এছাড়া কবির নিত্য-নতুন সৃষ্টির প্রবণতা তো ছিলই।

কিন্তু প্রৌঢ় কবির পক্ষে একেবারে যথাথ 'শিশু' হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তা হয়ও নি। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে তাই অনেক ক্ষেত্রেই ছড়ার হালকা ভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্য-গ্রন্থভুক্ত ছড়াধর্মী রচনাগুলি সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

'শিশু' কাব্যভুক্ত 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতায় কবি শৈশব স্মৃতির ঋণ স্বীকার করে একটি জনপ্রিয় লৌকিক ছড়ার অনুসরণে কালের নিরন্তর বহমানতার ইঙ্গিত দান করেছেন। এখানে শুধু ছন্দই নয়, ছড়ার বিষয়, চরিত্রাদিও উপস্থাপিত। স্থানান্তরে এই লৌকিক ছড়াটি অবলম্বনে লৌকিক ছড়াগুলিতে 'বিস্মৃত ইতিহাসের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের' সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কবিতাটির এক স্থানে 'কবে বিষ্টি পড়েছিল, / বান এল সে কোথা, / শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, / কবেকার সে কথা, / কিংবা 'কোন্ ছেলের ঘুম পাড়াতে / কে গাহিল গান----' ইত্যাদি প্রশ্ন যেমন একদিকে শিশুর জিজ্ঞাসু মনটিকে পরিস্ফুট করে, তেমনি অতীতের অলিখিত ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসাও এখানে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতার একাধিক স্থানে এই বিশেষ লৌকিক ছড়াটির প্রতিধ্বনি শ্রুতিগম্য। যেমন চিত্র রচনা সূত্রে দেখি,—'বিষ্টি

পড়ে টাপুর টুপুর / মেঘ করেছে আকাশে / উষায় রাঙা মুখখানি আজ / কেমন যেন ক্যাকাসে' (বিচ্ছেদ : শিশু : ঐ) ; 'শিব ঠাকুরের বিয়ে'-তে 'তিন কন্যে দান' শুধু লৌকিক ছড়াতেই নয়, অন্যত্রও অনুষ্ঠিত। 'চড়িভাতি'-র বর্ণনায় এই 'তিন কন্যে'-র সাক্ষাৎ লভ্য,—'তিন কন্যে লেগে গেল রান্না করার কাজে' (চড়িভাতি : ছড়ার ছবি : ঐ), আবার বিষ্ণু দের একটি কবিতায় ছড়াটির সিদ্ধরস চূর্ণ করে স্বকীয় ভাবনা প্রতিষ্ঠার স্মরণযোগ্য প্রয়াস উল্লেখ্য। সমাজ-সচেতন কবি লৌকিক ছড়াটিকে ঈষৎ পরিবর্তন করে লিখলেন, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, তার ওপরে বান' (ছড়া···১ : সন্দীপের চর ১৯৪৭)। এখানে সমকালীন উপর্যুপরি সামাজিক বিপর্যয় পরিস্ফুটনে কবি লৌকিক ছড়ার 'বৃষ্টি' ও 'বান'-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটিকে পারম্পর্য-সূত্রে গ্রথিত করেছেন। শুধু তাই নয়, ছড়াটির পরবর্তী অংশেও এ-ধরণের রূপান্তর লক্ষণীয়,···'এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান / খেয়ে দেয়ে বিলেত গিয়ে জমান পেনসান' (ঐ) ; উদ্ধৃতাংশটিতে ব্যক্তি চরিত্রের স্বার্থপরতার প্রতি হালকা চালে কবির ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবটি প্রকাশিত।

যতীন্দ্রনাথের 'কন্যাদান' ('ত্রিযামা') কবিতাটিতেও এই লৌকিক ছড়াটির অনুসরণ লক্ষণীয়।

আবার অর্থের বিশেষ পরিবর্তন না ঘটিয়েও সামান্য পরিবর্তিত রূপে লৌকিক ছড়ার প্রয়োগ নানা স্থানে লভ্য। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থের ৬ সংখ্যক কবিতায় 'আতা গাছের তোতা পাখি' ; ডালিম গাছে মৌ'···অংশটিতে সব অর্থে লৌকিক ছড়া অবিকৃত থেকে গেছে। ঐ কবিতারই ছড়া প্রভাবিত অংশ বিশেষ,--'খোকা গেছে মেষ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে, / কোথায় গেল গমের রুটি শিকের পরে তুলে' ;···সুপরিচিত ছড়ার-পংক্তির ঈষৎ পরিবর্তন সাধন করে এখানে উপভোগ্য কৌতুক রস সৃষ্টি করেছেন কবি।

প্রায় ৬৯ বছর বয়সে রচিত 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থের বহু স্থানে লৌকিক ছড়ার দ্বারস্থ হয়েছেন। যেমন, 'ডালিম গাছে পিরভু কেমন নাচে'···এই লৌকিক ছড়ার প্রতিফলন দেখি, 'রাজা ও রাণী' কবিতাটিতে ; সেখানে কবি বলেছেন, 'আমি গিয়েছিলুম ছুটে / দেখতে ডালিম গাছে / বনের পিরভু কেমন নাচে'। আবার 'সেঁজুতি'র 'নতুন কাল' কবিতায় 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর'-এর অত্যন্ত তাৎপর্যপূণ প্রয়োগ লৌকিক আবহ নির্মাণে সার্থক প্রযুক্ত। এক প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের মানস-দূরত্ব এ কবিতায় ছড়ার অনুষঙ্গ-ব্যবহারে সুপরিস্ফুট।

কবির মনে হয়েছে, 'কালের নটরাজা' নিত্য নুতন রূপ পরিগ্রহ করেন, আর এককালের ছেলেমেয়ের সঙ্গে আর এককালের ছেলে-মেয়েদের এক অনিবার্য পার্থক্য তাই কবির চোখে ধরা পড়ে, 'অনেক বাণীর বদল হল, অনেক বাণী চুপ, / নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ / তখন যে সব ছেলেমেয়ে শুনেছে এই ছড়া / তারা ছিল আর এক ছাঁদে গড়া…'।

'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'সময়হারা' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। উত্তরবঙ্গ বাস কালে রবীন্দ্রনাথ যে লোকসংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তার প্রভাব এ কবিতায় বিধৃত। শুধু লৌকিক ছড়ার পরিবেশটিই নয়, প্রত্যক্ষ ভাবে ছড়ার অংশবিশেষও এ কবিতায় গৃহীত, 'ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে / আউরে চলি শুধু আপন মনে— / উড়কি ধানের মুড়কি দেব, বিন্নে ধানের খই, / সরু ধানের চিড়ে দেব, কাগমারে দই'। এ কবিতারই অন্যত্র একটি লৌকিক ক্রীড়া-কেন্দ্রিক ছড়ার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত,…'সজনে গাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে… / গোধুলিতে সূয্যি মামার বিয়ে' (ঐ) কিংবা 'কলুদ ফুল যে কাকে বলে, ঐযে খোলো খেলো / আগাছা জঙ্গলে…' (ঐ) ; বলা বাহুল্য, 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' এই সুপরিচিত লৌকিক ছড়াটিতে এই 'কমলা-পুলির টিয়ে', 'সূয্যি মামার বিয়ে', 'কলুদ ফুল' ইত্যাদির সাক্ষাৎ মেলে।

লৌকিক ছড়ার সীমিত কলেবরে যে চরিত্রগুলির দেখা মেলে, সেগুলিও নানা সূত্রে আলোচ্য কাব্য-কবিতায় আবির্ভূত। ইতঃপুর্বে উদ্ধৃত কোনো কোনো কবিতার স্থান-বিশেষে লৌকিক ছড়ার 'শিব ঠাকুর', 'তিন কন্যা', 'খোকা'র দেখা পেয়েছি। এবার নিদ্রাকর্ষণকারিণী 'মাসি পিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাক।

কোথাও দেখি, 'ঘুম পাড়ানিয়া মাসি' কাগজের নৌকায় বিহাররতা, —'ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে / ঘুম পাড়ানিয়া মাসি'। (কাগজের নৌকা : শিশু : রবীন্দ্রনাথ) ; কোথাও বা দূরাতীত শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নময় মানসলোক পরিণত বয়স্ক কবির কাছে মনে হয়েছে, 'ছেলে বেলায় ছিল তারা কোথায় গেল শেষে / গেছে বুঝি ঘুম-পাড়ানি / মাসি পিসির দেশে' (পুরোনো বট : ঐ), কখনো এই 'মাসিপিসি' 'নয়ন চুলানী বুড়ি'-তে রূপান্তরিত, 'ঘুমের বুড়ি আসছে উড়ি / নয়ন চুলানী' (খেলা : ঐ)।

আবার যতীন্দ্রমোহনের 'ঘুমহারা' ('অপরাজিতা' ১৯১৩) কবিতায় বিনিদ্র শিশুর প্রশ্ন, 'ঘুম কোথায় থেকে আসে ? / দিনে বুঝি লুকিয়ে থাকে…মা, সে- / কোথায় ঘুমের বাড়ি'।

লৌকিক ছড়ার ছন্দের অনুরণন আলোচ্য কাল-পর্বের বহু কবিতায় ধ্বনিত। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া' ইত্যাদি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লৌকিক ছড়ার ছন্দের বহুল ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'ছড়ার ছবি' কাব্য গ্রন্থভুক্ত 'ভজহরি' কবিতাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য 'হঙ্কঙেতে' সারা বছর আপিস করেন মামা- / সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের শ্যামা / ...' ইত্যাদি। বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যাবে, রবীন্দ্রকাব্য ধারায় লৌকিক ছড়ার ছন্দের প্রভাব সুবিস্তৃত। শুধু শিশু-কেন্দ্রিক কবিতাই নয়, ভিন্ন বিষয়-সম্বলিত কবিতাও লৌকিক ছড়ার ছন্দাশ্রয়ী। 'পূরবী'-র 'আশা' কবিতাটির ভূমিকাংশটি এর অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন,—'মস্ত যে সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয়, / জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময় / ...' ইত্যাদি।

'ছন্দের যাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-চর্চাতেও লৌকিক ছড়ার ছন্দের স্বতন্ত্র ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা', 'ফুলের ফসল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা লৌকিক ছড়ার ছন্দে দোলায়িত। যেমন, 'ফুলের বনে ফুল ফুটেছে / কোকিল গাহে তায় / কিরণ কোলে লহর দোলে, / সলিল বহে যায়' (নববসন্তে : বেণু ও বীণা) ইত্যাদি। 'কাব্য সঞ্চয়ন'-ভুক্ত 'ভোরাই' কবিতাটির অংশ বিশেষ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ভোর হ'ল রে, ফর্সা হ'ল, দুলল উষার ফুল-দোলা / আল্‌কো আলোয় যায় দ্যাখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা ...' ইত্যাদি। ছন্দ নিয়ে নানা বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সূত্রে তাঁর কাব্যে লৌকিক ছড়ার ছন্দ অনুসৃত। উদাহরণ স্বরূপ,— 'বর' ('লেখা') 'খেয়া-ডিঙি' ('রেখা') প্রভৃতি কবিতা স্মরণযোগ্য। আবার গ্রামীণ জীবনের মুক্ত আনন্দময় আবহ-নির্মাণে করুণানিধান তাঁর 'বাসনা' (ঝরাফুল) কবিতার তৃতীয় পর্যায়ে লৌকিক ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

কুমুদরঞ্জনের কবিতাতেও লৌকিক ছড়ার অল্প-বিস্তর প্রভাব দেখা যায়। তাঁর 'বনমল্লিকা' (১৯১৯), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮), 'একতারা' (১৯১৪) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় এর প্রমাণ মেলে। 'একঘরে', 'খোকা' (বনমল্লিকা) 'বাদল সর্দার' (একতারা) প্রভৃতি কবিতাগুলি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

নজরুল ইসলামের বহু কবিতা লৌকিক ছড়ার ছন্দাশ্রয়ে রচিত। এ ছন্দে বেশ কিছু শিশু-কেন্দ্রিক কবিতাও লিখেছেন তিনি। বলা বাহুল্য,

শিশুর সরল, ছন্দময় প্রাণের ঘনিষ্ঠতা লাভের প্রয়াসেই কবি এসব কবিতায় লৌকিক ছড়ার ছন্দানুগামী। 'ঝিঙে-ফুল' (১৯২৮) কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় লৌকিক ছড়ার দ্রুতগামী ছন্দ প্রয়োগ করে শিশুকে আনন্দ দানের প্রয়াস দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুবিখ্যাত 'খাদু-দাদু' কবিতাটি স্মরণযোগ্য। নির্মল কৌতুকরস সৃষ্টিতে ছড়ার ছন্দের এ জাতীয় সার্থক ব্যবহার সহজ-দৃষ্ট নয়।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসম্ভারেও লৌকিক ছড়ার প্রভাব ইতস্তত মেলে। 'যথাস্থানে সংস্কার' (মরীচিকা), 'বাঁচা চাই' (ত্রিযামা), প্রভৃতি কবিতায় এর সমর্থন লভ্য।

কবিতার আঙ্গিকে অভিনবত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লৌকিক ছড়ার রূপ-রীতির আশ্রয়ে গভীর উপলব্ধির বাণী বিষ্ণু দে-র একাধিক কবিতায় শ্রুতিগম্য। কখনো কবি সমকালীন যুগের পটভূমিকায় সুপ্রচলিত লৌকিক ছড়ার মাত্রান্তর ঘটান। কখনো বা ছড়ার ছন্দানুসরণে হালকা চালে সমাজ জীবনের রূঢ় রূপটি উদ্‌ঘাটন করেন। তাঁর 'ছড়া : ১' (সন্দীপের চর), 'বুড়ো ভোলানো ছড়া' (সাত ভাই চম্পা : ১৯৪৪) প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। 'আয় বৃষ্টি হেনে' সুপরিচিত এই মানবধর্মী লৌকিক ছড়া-আশ্রয়ে শেষোক্ত কবিতাটিতে বিষ্ণু দে সমকালীন যুগের বিপর্যস্ত পরিস্থিতি পরিস্ফুটনের প্রয়াসী।

সুদীর্ঘকালের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, শোষণ ও ভীরুতার বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়। যেমন--'আয় বৃষ্টি হেনে, / ধান বিছালি মেনে / জবাব দেব বোমায় / ডাকাত যেথা ঘুমায়' / --উদ্ধৃত অংশটিতে একদিকে কবির ক্ষোভ, অন্যদিকে বৃহত্তর বিপ্লবের আকাঙ্খা ইঙ্গিতপূর্ণভাবে প্রকাশিত। লক্ষণীয়, এ কবিতায় 'মানত' হিসাবে 'ছাগল' ছাড়া 'ধানবিছালি', 'চরকা' ও পরমায়ু প্রদত্ত। এবং এসব প্রতিশ্রুতি দানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমকালীন দুর্দশাগ্রস্ত চিত্রটিও ছড়ার ছন্দে অঙ্কিত।

একথা অনস্বীকার্য যে, আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতায় বাংলার লৌকিক ছড়ার ছন্দের সচেতন-চর্চা বাংলা কবিতাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

২। (২) প্রবাদ : লোকসমাজে সুপ্রচলিত বহুবিচিত্র প্রবাদ, প্রবাদ-মূলক বাক্যাংশ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ নানাভাবে আলোচ্য কালপর্বের বাংলা কাব্য-কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যতীন্দ্রনাথ,

—যাঁর অসাধারণ মুন্সীয়ানা, বিস্ময়কর যাঁর প্রবাদ-প্রীতি; প্রবাদ-প্রয়োগে তাঁর কবি-ভাষণ হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী; তাৎপর্য-বিস্তারীত। জগত ও জীবনের প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাত ও বাস্তব সচেতনতা-সূত্রে লৌকিক প্রবাদের প্রাধান্য তাঁর কবিতায়। লোকসমাজে প্রচলিত এসব প্রবাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ যেন তাঁর কবিতায় নতুনভাবে প্রকাশ পেলো।

লৌকিক প্রবাদ বাক্য 'নুন আনতে পান্তা ফুরোনো' দারিদ্র্য প্রাবল্যের পরিচয়বহ। রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গভূমির প্রতি' প্রশস্তিমূলক একটি কবিতার ব্যঙ্গানুকরণে যতীন্দ্রনাথ দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট শরতের 'বঙ্গভূমি'-র বাস্তব চিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হয়ে দেখলেন, সেখানে 'লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত, / পান্ত,--আনিতে লবণে' (শরতে বঙ্গভূমি : মরুশিখা)।

'গরু মেরে জুতো দান'--বাংলার লোকসমাজে সুপ্রচলিত এই প্রবাদ-মূলক বাক্যাংশ সাধারণভাবে 'অপ্রতুল ক্ষতিপূরণ' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যতীন্দ্রনাথ জগৎস্রষ্টার সমালোচনা সূত্রে কবিতায় এর প্রয়োগ করলেন। 'ক্ষুধিত মানব'-এর দুর্দশা দেখে ঈশ্বরের প্রতি ক্ষুব্ধ কবির শ্লেষোক্তি,--'ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন' ''গরু মেরে জুতো দান'' অপেক্ষা নহে কভু বেশী পুণ্য' (ঘুমের ঘোরে / ১ম ঝোঁক : মরীচিকা)। 'দেবতার সৃষ্ট মানবের ক্ষুধা' এখানে 'গরুমারা'র সামিল এবং তাঁর 'অন্নদান', 'গরু-মারার' পর জুতো দানেরই সমান। অনুরূপ,--'মরুশিখা'র নবপন্থা কবিতায় কবি ঈশ্বরের প্রতি অবিচল ভক্তিতে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। এই অভক্তি প্রকাশে কবি আদৌ আশঙ্কিত নন। তাঁর মতে, জীবন যেখানে এমনিতেই দুর্দশাময়, সেখানে ঈশ্বর কবিকে আর নতুন করে কি-ই বা দুঃখ দিতে পারেন।--তাই তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা,--''আমি রয়ে গেনু বিনাশের আশে দুষ্কৃতদের দলে, / দেখিব বন্ধু, মড়ার উপরে কত খাঁড়ার ঘা চলে''। বলা বাহুল্য, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'-র প্রচলিত অর্থ-উপর্যুপরি বিপর্যয়। এখানে প্রচলিত অর্থটিই রক্ষিত। অনুরূপ অর্থে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' এই প্রবাদ মূলক বাক্যাংশের প্রয়োগও যতীন্দ্র-কবিতায় লক্ষণীয়। জগতের সর্বত্রই দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-নিপীড়ন লক্ষ করেছেন তিনি। আর নানা বস্তু বা বিষয়ের রূপকাবরণে কবিতায় তার চিত্ররূপ দান করেছেন। 'বীণা-বেণু' (মরু-শিখা) কবিতাটিতে বীণার রূপকাশ্রয়ে কবি দেখেছেন, সৌন্দর্যের অন্তরালে রয়েছে দুঃখ ও লাঞ্ছনার ইতিহাস। তাই ''বাঁধন বেদনে কাতরায় বীণা,

তত উঠে সুর মিঠা, / টনে তারে যন হানে 'মেজরাপ'--কাটা ঘায়ে নুন-ছিটা"। স্মরণযোগ্য, পরিবেশ পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রমোহনের একটি কবিতাতেও প্রবাদটি ব্যবহৃত। কন্যার অকাল বৈধব্যে কবিতাটিতে প্রাচীনা জননী এ বিপর্যয়ের জন্য তাঁর মৃত স্বামীকে দোষারোপ করেন। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে সমগ্র পুরুষজাতি-ই ধিক্কারযোগ্য হয়ে উঠে। প্রাচীনার বক্তব্য,--'পুরুষ কখন্ আপন হয় না? শত্রুর চিরকাল, / কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে--সগ্গে গেলেও ছাল' (প্রাচীনার প্রলাপ: মহাভারতী ১৯২৮)।

'পাকা ধানে মই দেওয়া'-র প্রচলিত অর্থ, প্রায় সুসম্পন্ন কোনো কর্মকে পণ্ড করে দেওয়া। এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি যতীন্দ্রনাথ অভাবনীয় দুঃখদুর্দশা চিত্রণে ব্যবহার করেছেন। নবান্নের উৎসব পাড়ায়-পাড়ায় পালিত হলেও কবির পক্ষে তা পালন করা হয়ে ওঠে না; কারণ 'কাল রাতে মোর মই পড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে' (নবান্ন: মরুমায়া:)। বলা বাহুল্য, 'পাকা ধানে মই পড়ে যাওয়া' এখানে দুর্ভাগ্যেরই ইঙ্গিতবহ।

'হাটে হাঁড়ি ভাঙা'-র প্রচলিত অর্থ হ'ল কোনো গোপন কুকীর্তি সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দেওয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা অসংগতি, অন্তঃসার শূন্যতা কবির তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়ে। কবি মঙ্গলময় জগত-স্রষ্টার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কবি জানেন, ঈশ্বর এই সমালোচনায় নগ্নসত্যের উদ্‌ঘাটনে খুশি নন। কেমন করেই বা তা হবেন? কারণ 'সৃষ্টির পচা ঝুনা নারিকেল যে-জনা দেখিল নাড়ি', / হাটের মাঝারে স্পর্ধা করিয়া যে জন ভাঙিল হাঁড়ি' (ভক্তির ভারে: মরুশিখা: ঐ)—তার প্রতি ঈশ্বর কখনো প্রসন্ন হতে পারেন না। অঙ্কুশের উপর্যুপরি আঘাতে ঈশ্বর তাঁকে তাই পর্যুদস্ত করেন। প্রায় অনুরূপ প্রয়োগ নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' (সর্বহারা) কবিতায় মেলে।

দারিদ্র্য ক্লিষ্ট বঙ্গভূমির ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনায় দেখি, বঙ্গজননীর 'ভবনে ভবনে' 'রোগে বন্যায়' 'ভাণ্ডে ভবানী' (শরতে বঙ্গভূমি: মরুশিখা: যতীন্দ্রনাথ)। উল্লেখযোগ্য, এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছে সমধর্মী যাদু বিশ্বাস প্রতিফলিত'। 'ভাঁড়ার' শূন্য বলতে নেই; তাই সুভাষণ রীতির প্রয়োগে 'ভবানী' শূন্যতার ইঙ্গিতবাহী।

'রাবণের-চিতা' সুপ্রচলিত এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি চিরকালীন বা চিরন্তন অর্থেই ব্যবহৃত। রাবণ-বিনাশের পর রামচন্দ্র মন্দোদরীকে

বৈধব্য রক্ষার্থে বর দেন যে, রাবণের চিতা অনির্বাণ থাকবে। বাস্তব-বাদী যতীন্দ্রনাথ জীবনে আগত নানা দুঃখবরণে প্রস্তুত, কিন্তু সে কারণে ঈশ্বর-প্রদত্ত সান্ত্বনা তাঁর কাছে অপমানজনক। তাই কবির আক্ষেপোক্তি, ...'দুঃখ আমার দিয়েছো বন্ধু, সে নিঠুরতা ত ক্ষমেছি আগে, / দুঃখের মোর হ'ল অপমান, / রাবণের চিতা চিত্তে জাগে' (অপমান : মরুশিখা); অপমানের চিরন্তন জ্বালা অর্থে এখানে 'রাবণের-চিতা' গৃহীত হয়েছে।

'মান্ধাতার আমল' অর্থে সুদূর অতীতকাল বোঝায়। পৌরাণিক ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা মান্ধাতাকে কেন্দ্র করে প্রবাদমূলক বাক্যাংশটি লোকসমাজে সুপরিচিত। যতীন্দ্রমোহনের একটি কবিতায় বিবাহ-লগ্নে বরবধুর প্রেমোন্মেষের চিরন্তন অবেগাপ্লুত চিত্ররচনায় দেখি, 'মান্ধাতারি আমল থেকে / যত লোকেই করছে বিয়ে... / বর কনে সে থাকে, দেখি, / বিভোর আপন খেয়াল নিয়ে' (মিলন : রেখা : যতীন্দ্র-মোহন), বলা বাহুল্য, 'বন্ধু বিবাহে' লিখিত কবিতাটিতে বন্ধুর প্রতি কবির নির্মল পরিহাস রস-রসিকতাই এখানে প্রকাশিত। আবার রোমান্টিক প্রেমের আবহ-নির্মাণেও লৌকিক প্রবাদের সক্রিয় প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রকৃত প্রেমে কোন অবস্থাতেই শান্তি নেই। বিচ্ছেদ যেমন অসহনীয়, তেমনি বিরহাশঙ্কা হেতু মিলনও অসম্পূর্ণ। প্রসঙ্গত, বৈষ্ণব পদাবলীর সেই বিখ্যাত পংক্তিটির কথা স্মরণে আসে,—'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া;' যতীন্দ্রমোহনের কবিতাতেও দেখি, 'মিলনে নাহিক তৃপ্তি, অমিলনে চিত্ত তার ফাটে, / শাঁখের করাত সম আসিতে যাইতে নিত্য কাটে' (আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে : পাঞ্চজন্য : ঐ)। বলা বাহুল্য, এখানে 'উভয় সঙ্কট' অর্থবাহী' শাঁখের করাতে'র প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য।

শোনা যায়, বনবাসকালে রামচন্দ্র-প্রদত্ত ফল লক্ষণ না খেয়ে রেখে দিতেন, কারণ রামচন্দ্র লক্ষণকে ফল ধরতে বলতেন, খেতে নয়। এর থেকে প্রবাদ মূলক ব্যাক্যাংশ 'লক্ষণের ফল ধরা' গভীর আনুগত্যের ইঙ্গিতবাহী রূপে গৃহীত। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় কিন্তু তা কোনো বিষয় বা বস্তুর যথোপযুক্ত ব্যবহারে ব্যর্থতা অর্থে প্রযুক্ত। কবির মনে হয়েছে, "সুখ শৈশবে অতসী পলাশে সেবিয়া সরস্বতী / লভিনু যা 'ফল'—ধর লক্ষণ, 'লাভ নাই একরতি'। (শেষ অর্ঘ : নাগকেশর) ।

নিতান্ত অলীক, অসম্ভব কোনো কিছু বোঝাতে বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ 'সোনার পাথর বাটি'র উল্লেখ করা হয়। মোহিতলালের বিশ্বাস, কবিরা আনন্দের স্রষ্টা; স্বভাবতই যতীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ

ছিল অনিবার্য। 'হেমন্ত গোধূলি'র 'দুঃখের কবি' কবিতায় মোহিতলালের মনে হয়েছে, যতীন্দ্রনাথের কবিতায় দুঃখবাদ নিতান্তই প্রহসন,—'দুঃখের কবি শুনে হাসি পায়--সোনার পাথর বাটি'।

'দশচক্রে ভগবান ভূত' এই লৌকিক প্রবাদটির উৎস দশ অবতারের কাহিনী ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভারে ক্লান্ত সান্ত্বনা-পিয়াসী লোক-মানস। স্বয়ং ভগবানকে পর্যন্ত বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল, সেখানে মানুষ তো কোন ছার্...এ মনোভাবই প্রবাদটিতে প্রতিফলিত। সমকালীন যুগের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বিদ্রোহী কবি নজরুলের মনে হয়েছে, "ভগবান আজ ভূত হ'ল যে পড়ে দশচক্র ফেরে" (পথের দিশা 'ফণি মনসা' ১৯২৭)। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যাবে, এ প্রবাদ প্রয়োগে কবি এক নূতন যুগ তথা 'যুগান্তরের' ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, ভগবান যুগে যুগে এক এক অবতার রূপেই জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং দশচক্র ফেরে' ভগবানের আজ ভূত হওয়া এক যুগাবসান তথা নূতন যুগের আগমনের সম্ভাবনারই ইঙ্গিতবাহী।

আবার যুগজীবনের অসত্যাচারিতা, অনাচার, বিবেকহীনতায় জীবনানন্দ বিধ্বস্ত হলেও তাঁর সুদূরপ্রসারী কবি দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে, "বাতাসে ধর্মের কল ন'ড়ে ওঠে...ন'ড়ে চলে ধীরে,/সূর্যসাগর তীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে/কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হ'লো রক্তে...উপেক্ষায়,/বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজো আসে।" (মনোসরণি: সাতটি তারার তিমির)। লক্ষণীয়, অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে কবি সত্যের অনিবার্য প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছেন,—'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'— এ লোকপ্রবাদটির প্রয়োগে।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ-জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, ভ্রষ্টতা, কৃত্রিমতা, প্রেম-হীনতা উপলব্ধি করে কবি আর একটি কবিতায় বলেছেন, 'রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়/চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়', (বিভিন্ন কোরাস:।৩:ঐ)। জ্ঞান ও প্রেমহীন জীবনযাত্রার অর্থহীনতা এখানে 'ভাবের ঘরে চুরি' (মূল স্থানে কপটতা অর্থে) এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের প্রয়োগে প্রতিভাত। 'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ'--এ বিশিষ্ট শব্দগুচ্ছের প্রচলিত অর্থ সর্বাতিশয়ী বিপদ তথা নিরুপায়তা। একাধিক কবির কবিতায় এর দেখা মেলে। লৌকিক ছড়া অবলম্বনে বিষ্ণু দে জলমগ্ন শিবসদাগরের যে মূর্তি এঁকেছেন, সেখানে দেখি ডুবন্ত নৌকা থেকে শিবসদাগর নামবেন, কিন্তু 'এই বিপদে জলে

কুমীর, ডাঙাতে বাঘ জানি / ওৎ পেতে রয়...' (ছড়া ১ : সন্দীপের চর)। যুগের সর্বগ্রাসী বিপন্নতা বোধও এখানে দ্যোতিত। আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সর্বগ্রাসী চরিত্রের ইঙ্গিত দান সূত্রে, —'ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর'-এর (ঝড় আসছে : অগ্নিকোণ / ১৯৪৮) সাক্ষাৎলভ্য। সুদীর্ঘকালের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছে। কবি সেই আসন্ন বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন, 'ঝড় আসছে, উঠে দাঁড়ায় / যে যেখানে আছে / ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর / যে মারে সেই বাঁচে' (ঐ)।

জড়বৎ অবস্থানকারীকে সাধারণত 'জড়ভরত' বলা হয়ে থাকে। রাজর্ষি ভরতের পরবর্তী জন্মের কাহিনী কেন্দ্র করে এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি কবিতায় সমকালীন যুগের নিষ্কর্মা যুবকদের স্থবির স্বভাবের ইঙ্গিতবাহী। সেই সব বেকার যুবকেরা যেন 'জড়ভরতের দল বসে আছে পার্কের বেঞ্চিতে' (পরিবেক্ষণ : পূর্বাভাস : সুকান্ত)। গঞ্জনার তীব্র জ্বালা সহ্য করে বেকার যুবকদের এই বসে থাকার চিত্রে কবির সমাজ সচেতনতাও পরিস্ফুট।

সামাজিক বিশৃঙ্খলার যুগে মহাত্মাদের বাণী যে নিতান্তই মূল্যহীন, যুগ-সচেতন বিমলচন্দ্র তা অনুভব করেছেন। তাই সমকালীন বিশৃঙ্খল যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মনীষীদের 'বাণী বিতরণ' তাঁর কাছে 'বেণাবনে মুক্তো ছড়ানো-র (অজগর ও উর্বশী : দ্বিপ্রহর এবং অন্যান্য কবিতা), সামিল বলে মনে হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'বেণাবনে মুক্তো ছড়ানো'-র লৌকিক অর্থ—নিষ্ফল প্রয়াস; অন্যত্র মধ্যবিত্তের দুর্বল চিত্ত ও চরিত্র প্রসঙ্গে, 'বিষ নেই কুলোপানা চক্র' প্রবাদটির ব্যবহার লক্ষণীয়,...... '...যত ঢোঁড়া সাপ / আত্মম্ভরী মধ্যবিত্তদের অভিশাপ / বিষ নেই কুলো-পানা চক্র তুলে' (রক্তদিন : ঐ)। উল্লেখযোগ্য, অন্তঃসার শূন্য আত্মম্ভরিতা অর্থেই প্রবাদটি লোকসমাজে সুপ্রচলিত। কবি সে অর্থই বজায় রেখেছেন।

আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় এরকম আরও বহু প্রবাদ-প্রয়োগের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, মধ্য যুগ বা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যেমন বহু সাহিত্যিক প্রবাদ সৃষ্ট ও কালক্রমে লোকসমাজে স্বীকৃত হয়েছিল, বিশ শতকের প্রথমার্ধের কাব্য-কবিতায় তা লক্ষ করা যায় না। এ কালপর্বে অনেক সাহিত্যিক প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই নগর ও গ্রাম জীবনের

সংস্কৃতিগত দুরত্ব বৃদ্ধি পাবার ফলে লোক-সমাজ কর্তৃক সেগুলি গৃহীত হয় নি।

২। (৩) কথা: বিশ শতকের প্রথম ভাগের কাব্য-কবিতায় অন্যান্য শ্রেণীর কথার প্রভাব একেবারে দুর্লভ না হলেও, সীমিত।

২। (৩) [১] পুরাকথা: যথার্থ অবিমিশ্র লোক পুরাণের উল্লেখ আমাদের আলোচ্য কাব্য-কবিতায় নিতান্তই বিরল-দৃষ্ট। আদিম যুগের লোক-সমাজ-সৃষ্ট সৃষ্টি-সংক্রান্ত পুরাকথা সেখানে প্রায় নেই বললেই চলে। তবে লোক সমাজে প্রচলিত, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে সৃষ্ট পুরাকথার সাক্ষাৎ নানা ক্ষেত্রে মেলে। উল্লেখযোগ্য, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, বিষ্ণু দে, প্রমুখ কবিগণ কবিতা রচনা করলেও সে কাহিনীগুলি যথার্থ লোকপুরাণাশ্রিত বলা যায় না, কারণ এদের অবলম্বন প্রত্যক্ষত লোকশ্রুতি নয়, সম্পূর্ণতই পরিশীলিত পুরাণ সাহিত্য।

২। (৩) [২] রূপকথা: আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় রূপকথার প্রয়োগ-বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। এ পর্বের বহু কবিতায় রূপকথার উল্লেখ বা অনুষঙ্গ কবিতায় নতুন মাত্রা যোজনা করেছে।

শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ রূপকথার প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করতেন। ঠাকুর বাড়ির পরিবেশটিও এ ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সন্ধ্যাবেলায় তেলের প্রদীপের সামনে বসে বুড়িদাসীর কাছে শোনা রূপকথাগুলি সে পরিবেশে শিশুর মানস-লোকে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, পরবর্তীকালের কাব্যচর্চায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিণত বয়সেও তিনি দেশবিদেশের বহু বিচিত্র রূপকথার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। রূপকথা-সংগ্রহে নানা ক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছেন। নিজের কবিতাতেও রূপকথার প্রসঙ্গ, চরিত্র ও অনুষঙ্গ ব্যবহার করে রূপকথার কালজয়িতা, সৃষ্টিশীলতা, ও আকর্ষণীয়তা প্রমাণ করেছেন।

কবির 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' (শিশু) কবিতায় রূপকথার কাহিনী নেই, শুধু অতীত-স্মৃতি চারণায় 'মনে পড়ে সুয়োরাণী / দুয়োরাণীর কথা, / মনে পড়ে অভিমানী / কঙ্কাবতীর ব্যথা'।—স্মৃতিচারণা সূত্রে কবিতাটিতে রূপকথার যে কল্পলোক গড়ে উঠেছে তার অমোঘ আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের অতি পরিচিত রূপকথা 'সাত ভাই চম্পা'র প্রয়োগ একাধিক কবির রচনায় মেলে। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা 'সাত ভাই চম্পা' নামাঙ্কিত।

আবার বিষ্ণু দে-র একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'সাত ভাই চম্পা'; সন্দেহ নেই, বাংলা কাব্য-কবিতায় 'সাত ভাই চম্পা'-র কাহিনীর প্রভাব বিস্ময়কর। সুদূর অতীতে গড়ে ওঠা এসব রূপকথার অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তিই এদের আজও সজীব, প্রাণময় করে রেখেছে।

রবীন্দ্র-কবিতায় এই রূপকথার কাহিনীটি না থাকলেও রেখাচিত্রের মতো গল্পের একটা আভাস লক্ষ করা যায়। 'সাত ভাই চম্পা' এবং দিদি পারুলকে নিয়ে কবি এক অপূর্ব বিষাদ-করুণ সৌন্দর্য জগত সৃষ্টি করেছেন। স্ত্রী-র মৃত্যুতে পুত্রকন্যার বিষাদগ্রস্ত মানসলোকের প্রতি-ফলনে 'সাত ভাই চম্পা' রূপকথাটি এক শিহিত মাত্রা লাভ করেছে।

বিষ্ণু দে-র 'সাত ভাই চম্পা'-র কাব্য-নামও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ নামের প্রথম কবিতায় জনগণের যৌথ শক্তিতে বিশ্বাসী কবি সমকালীন যুগের নিপীড়িত জনসাধারণকে 'সাত ভাই চম্পা'-র প্রতিবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন। গণজাগরণের স্বপ্ন দেখেছেন। 'সাত ভাই চম্পা' নামাঙ্কিত দ্বিতীয় কবিতাটিতে ('সাত ভাই চম্পা' কাব্যগ্রন্থে একই নামে দুটি কবিতা আছে) লোকসমাজে প্রচলিত রূপকথাকে কবি এক বৃহত্তর মাত্রা দান করে রূপকথার মানস-মুক্তি ঘটিয়েছেন। কবির কাছে গণজাগরণের প্রতীক 'চম্পা'। তাই তাঁর প্রতি কবির উক্তি,—'তোমাকে খুঁজেছে জানো কি কৃষকে নৃপে, / অশ্বের খুরে লাঙলের ফলা টেনে, / হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে / ...' ইত্যাদি। লক্ষণীয়, শ্রমজীবীদের সঙ্গেই এখানে চম্পার জাগরণ ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত।

পক্ষান্তরে, 'অপরাহ্নিক চেতনায়' বিগত যৌবনের রূপকার্থে 'সাত ভাই চম্পা'র অবতারণা যতীন্দ্রনাথের কবিতায় লভ্য। যৌবনে অস্বীকৃত প্রেম-সৌন্দর্য, মঙ্গল ইত্যাদি বিগত-যৌবন কবির কাছে যখন স্বীকৃতি পেল, তখন বেলা অবসান প্রায়। অপগত যৌবন আর ফিরে পাবার উপায় নেই। একারণে বিগত যৌবন রূপ নিদ্রিত 'সাত ভাই চম্পা'-র কাছে কবির আকুল প্রার্থনা,—'বসন্ত গেছে গেছে, হাত নাই, হাত নাই / ...... / চম্পা গো চম্পা গো জা-গো-। / জাগো মোর সাত ভাই জা-গো-।' (পারুলের আহ্বান : সায়ম / ১৯৪১)।

প্রসঙ্গত, বিষ্ণু দে-র 'সন্দ্বীপের চর' গ্রন্থভুক্ত 'পারুলের ছড়া' কবিতাটি স্মরণে আসে। রূপকথার গল্পে সাধারণত সুজন প্রথম পর্যায়ে অত্যা-চারিত হলেও শেষে তারই জয় হয়, দুর্জন পরাস্ত হয়ে নির্বাসিত বা নিহত হয়। রূপকথার এই গঠন ভঙ্গিটি কবি সমাজ জীবনেও লক্ষ

করেছেন। অর্থলোভী, স্বার্থপর, প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের দল সুয়োরাণীর মতই দুয়োরাণী আর তার পুত্র কন্যারূপ সাধারণ মানুষের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারে মত্ত। কিন্তু মার্কসীয় দর্শনে আস্থা-প্রসূত জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী কবি জানেন, সুয়োরাণীর মতই এ অশুভ শক্তির পরাজয় অনিবার্য। তাই সুয়োরাণী তথা সেই শাসক শ্রেণীর প্রতি কবির হুঁশিয়ারি…'দেশের কপালে তুমি দিনেকের সাজা / সুয়োরাণী তুমি জানো না তোমার দুয়ো / জানো কি আমরা আসলে তোমারও রাজা / আমরাই সাত ভাই / কাল তুমি ভুয়ো / …' রূপকথা এখানে সমাজের বাস্তব চিত্রের প্রতীক রূপ লাভ করে অতীতের গর্ভ থেকে সরে এসে বর্তমানের সজীব ভূমিতে অবতীর্ণ।

আলোচ্য পর্বের বেশ কিছু কবিতায় রূপকথার বহু বিচিত্র চরিত্র ও অনুষঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। 'সাত সমুদ্দুর তের নদী', 'পক্ষীরাজ ঘোড়া', 'রাজপ্রাসাদ', 'সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি', 'রাক্ষস' ও তার 'প্রাণ ভোমরা' প্রভৃতি বহু বিচিত্র বস্তু ও বিষয়ের সংযোগ বহু কবিতাতেই লভ্য।

উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্র-কবিতায় শিশুর জগত প্রায়শই রূপকথার স্বপ্ন-জগতে পর্যবসিত। উদাহরণ-স্বরূপ, 'ছুটির দিনে' (শিশু) কবিতাটি স্মর্তব্য; এ কবিতায় শিশুর বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশে রূপকথার 'তেপান্তরের মাঠ', 'রাজার দেশ', 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী', 'দুয়োরাণী', 'রাজপুত্তুর' ইত্যাদির প্রয়োগ লভ্য। আবার 'পলাতকা'-র 'মালা' কবিতায় রূপকথার বাতাবরণে কবির মানসলোকবাসিনী অনুপ্রেরণাদাত্রীর আবির্ভাব। সিংহাসনে উপবিষ্টা রাণীর কাছে কবির প্রশ্ন,—'ওগো রাণী, তোমার হাতে আর কিছু কি নেই / শুধু কেবল বিজয় মালা এই? / জীবন আমার জুড়ায় না যে, / বক্ষে বাজে / তোমার মালার ভার, / এই সে পুরস্কার'। তাঁর 'আসল' কবিতায় আট বছর বয়স্ক বালকের কল্পলোক চিত্রণে রূপকথার অনুষঙ্গ গৃহীত। বালকের সেই জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের ব্যবধান ঘটলেও সেই কল্পনা জগত তার কাছে উপভোগ্য ছিল, সে জগতের বর্ণনার অংশ বিশেষ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য,—'বসুন্ধরা দাঁড়িয়ে হোথায় দেখা দিতেন এই ছেলেটির কাছে। / মাথার পরে উদার নীলাঞ্চল / সোনার আভায় করত ঝলমল। / সাতসমুদ্র তেরো নদীর সুদূর পারের বাণী / আমার কাছে দিতেন আনি।' কবির 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার নাম 'সাত সমুদ্র পারে'। ঐ কাব্যের 'জ্যোতিষী' কবিতায় রূপকথার 'রাক্ষস', 'রাজকন্যা', 'সোনার কাঠি' প্রভৃতির দেখা

মেলে। রবীন্দ্র-কাব্যে রূপকথা-রঞ্জিত এ জাতীয় বহু কবিতাই লভ্য। নিছক শিশুর জগত সৃষ্টির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র কবিতায় রূপকথার আশ্রয় নেন নি, কবির রোমান্টিক মনও এর অন্যতম কারণ। কল্পনার মুক্ত পক্ষ-বিহারে রূপকথার জগত পরিভ্রমণ করে কবির রোমান্টিক মানসও যেন তৃপ্ত হয়েছে। 'পত্রপুট' কাব্যের ২ সংখ্যক কবিতা যার অন্যতম নিদর্শন,—যেখানে কবি বলেছেন,—'আমার ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল / দিগন্ত প্রসারী বিরহের জনহীনতায়, / তার তেপান্তরের মাঠে কল্প-লোকের রাজপুত্র / ছুটিয়েছে পবন বাহন ঘোড়া / ……'। লক্ষণীয়, রোমান্টিকের সুদূরের প্রতি আকাঙ্খা এখানে সুপরিস্ফুট।

বাংলার প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ, রূপ দক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ রূপকথার আবরণে সে প্রকৃতি এভাবে বর্ণনা করেছেন,—'শিয়রে তাঁর সূর্য এসে / সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে / নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি / বুলায় পায়ে রূপার কাঠি' (গান : কুহু ও কেকা)। বঙ্গভূমি যেন কবি-কল্পনায় রূপকথার সেই বন্দিনী, সুন্দরী রাজকুমারী,—যার নিদ্রা ও জাগরণ যথাক্রমে রূপো ও সোনার কাঠির স্পর্শনির্ভর। প্রায় অনুরূপ সূত্রে কবির 'বেণু ও বীণা'-র 'বঙ্গজননী' কবিতায় 'সোনার' ও রূপোর কাঠি' ব্যবহৃত। কখনো জন্মভূমির প্রতি গভীর প্রীতিবশে কুমুদরঞ্জনের মনে হয়, তাঁর গ্রাম রূপকথার মায়াপুরী, অসম্ভবের রাজ্য। সেখানে রূপকথা-রাজ্যের 'বিহঙ্গমা ও বিহঙ্গমীরা / বাস করে গাছে পাকুড়ের রাক্ষস নর পরীর সঙ্গে / দেখা পাওয়া যায় ঠাকুরের'। (রূপকথার রাজ্য : অজয় / ১৯২৭)।

আবার স্বাধীনতা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহী কবি নজরুল পরাধীন দেশ-জননীকে রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর মূর্তিতে কল্পনা করেছেন; সেখানে রূপকথার 'রক্ষপুর' হয়েছে 'আন্দামান',—'সপ্ত-সিন্ধু তের নদী পার / দ্বীপান্তরের আন্দামান, রূপের-কমল রূপার কাঠির কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান' (দ্বীপান্তরের বন্দিনী : ফণিমনসা)। অনুরূপ সূত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রূপকথার সেই রাক্ষসরাজের রূপকাবরণে চিত্রিত, যে রাজকুমারীকে করে রেখেছে বন্দিনী; যার প্রাণবায়ু অতল জলের নীচে কিংবা প্রাসাদের অন্দর মহলের স্তম্ভের মধ্যে লুকোনো থাকে। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে কবির আহ্বান,—'দিন এসে গেছে ভাই-রে / বিদেশীরাজের প্রাণ ভোমরাকে / নখে নখে টিপে মারবার' (অগ্নিকোণ : অগ্নিকোণ)। লক্ষণীয়, কবির বিপ্লব-চেতনার রোমান্টিক উদ্ভাসন এখানে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে। সুকান্ত-র

কবিতায়-ও অনুরূপ পটভূমিকায় একই রূপকথার অনুষঙ্গ আবর্তিত,—'তোমার ফসল, তোমার মাটি / তাদের জীয়ণ ও মরণ কাঠি / তোমার চেতনা চালিত হাতে / এখনও কাঁপবে আশঙ্কাতে? / স্বদেশ প্রেমের ব্যঙ্গমা পাখি / মারণ মন্ত্র বলে, শোনো তা কি?' (বোধন: ছাড়পত্র / ১৯৪৯)। সমাজের শ্রমজীবী মানুষেরাই দেশের প্রধান শক্তি; এদের জাগরণেই দেশের পরাধীনতা ঘুচবে বলে কবির বিশ্বাস, 'জীয়ণকাঠি' ও 'মরণ কাঠি' এখানে শক্তি ও শক্তিহীনতার প্রতীক।

বিষ্ণু দে-র 'মৌভোগ' (সন্দীপের চর) কবিতায় রূপকথা-আশ্রয়ে শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখেন কবি। এ কবিতায় পুঁজিবাদী শোষণ, অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় রাজকুমারেরা। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক চেতনা-সম্পন্ন কবির এ সংগ্রামে শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত সমস্ত শ্রমজীবীর মুক্তির আকাঙ্খাই প্রচ্ছন্ন থাকে।

সেখানে 'নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে / তৈরী হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল, / লাল তিলকে ললাট রাঙা, উষার রক্তরাগে / কার এসেছে কাল?' উল্লেখযোগ্য, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি এ মনোভাব কবির মার্কসীয় দর্শনে গভীর বিশ্বাস-প্রসুত। অন্যত্র, শ্রমিক দিবসে কবি যে গণজাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন, তারও নেতৃত্ব বাংলার রূপকথার 'লালকমল-নীলকমল' বর্তমান,—'মে-দিনের গানে আসন্ন ত্রাণে / হে লালকমল হে নীলকমল / নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে / স্বর্ণলঙ্কা চুর্‌...' (মে-দিন: ঐ)। বিপ্লবের নবতর মাত্রা যোজনায় রূপকথার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য এখানে অনস্বীকার্য। রূপকথার জগত বাস্তব জগত নয়, স্বপ্নের জগত। রূঢ় বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে শোষণ-ক্লিষ্ট সমাজ থেকে শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের আকাঙ্খায় সেই স্বপ্নলোকের রাজকুমারের নেতৃত্ব দান তাই অপূর্ব শিল্প-সার্থকতা অর্জন করেছে।

জীবনানন্দের কবিতাতেও রূপকথার বহুবিচিত্র অনুষঙ্গের সার্থক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কখনো রূপকথার 'শঙ্খমালা' কবির স্বপ্ন-লোকের কাঙ্খিতা রমণীতে রূপান্তরিত। সমকালীন যুগের পরিবর্তিত মূল্যবোধে যথার্থ প্রেমের অবকাশ নেই। তা যেন আজ দূরাতীত স্মৃতি; 'শঙ্খমালা' সেই সুদূর অতীতের পরম শান্তিময় প্রেমের Idol। কিন্তু এ যুগে তাকে আর পাওয়া যাবে না, যায় না; কারণ শান্তিহীন, প্রেম-হীন বর্তমানের প্রভাবে 'চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম / চিতা জ্বলে,

দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায় / সে আগুনে হায় / চোখে তার / যেন কত শতাব্দীর নীল অন্ধকার, / স্তন তার / করুণ শঙ্খের মতো দুধে আর্দ্র-কবেকার শঙ্খিনী মালার! / এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর' (শঙ্খমালা : বনলতা সেন)। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬)-র 'পরস্পর' কবিতায় প্রেম-মমতারিক্ত যুগচিত্রণে বৈপরীত্য সূত্রে রূপকথার পরিবেশ ও অনুষঙ্গ গৃহীত। এ কবিতায় অন্তত তিনটি রূপকথার রূপরেখা আভাসে-ইঙ্গিতে পরিস্ফুট। প্রথমটিতে, 'ঘুমানো সে এক মেয়ে,—নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে / সেইখানে আর নাই কেহ,··· / এক ঘরে পালঙ্কের' পরে শুধু একখানা দেহ······' ইত্যাদিতে 'ঢের আগেকার' এক রূপকথার স্পন্দন অনুভূত। এরকমই অনির্দিষ্ট, অসম্পূর্ণ তিনটি কাহিনীর সূক্ষ্ম সংকেতে বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর চিরন্তন প্রেমবোধের নিদারুণ অভাব ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। লক্ষণীয়, রূপকথার সমান্তরালে হতাশাগ্রস্ত, গ্লানি-জর্জর বর্তমান যুগ-জীবনের চিত্র রচনা করে রূপরেখার সঙ্গে তার মেলবন্ধনের চেষ্টা করেছেন তিনি। 'ঘুমন্ত কন্যার কথা শুনেছি অনেক আমি, দেখিলাম তবু চেয়ে চেয়ে এ ঘুমোনো মেয়ে / পৃথিবীর,—মানুষের দেশের মতন'; (ঐ)। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কবি-প্রয়াসের ব্যর্থতা আভাসিত হয় শেষ তিনটি শব্দে। 'রূপসী বাংলার' কবির অতীতচারিতা অনেক ক্ষেত্রেই রূপকথাশ্রয়ী। এ কাব্যগ্রন্থে রূপকথার 'শঙ্খমালা', 'চন্দ্রমালা', 'মানিক মালা' 'কেশবতী কন্যা', 'কঙ্কাবতী' প্রমুখ রাজকন্যার বিষণ্ন পদসঞ্চারণ অনুভূত হয়।

গ্রাম বাংলার অতীত সমৃদ্ধি-রূপে কবি দেখাতে চেয়েছেন, যে রূপ-কথার ঐশ্বর্যময় রাজ্য ও প্রেমময়ী রাজকুমারীরা একদিন বাস্তব সত্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন লৌকিক ছড়ার অন্তরে বাস্তব-ইতিহাসের ভগ্নাংশ উপলব্ধি করেছিলেন, অনুরূপ ভাবে বর্তমান যুগের গ্রাম বাংলার রিক্ত রূপের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দও রূপকথার অতীতের বাস্তব লোকের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। নিদর্শন স্বরূপ, রূপসী বাংলার ৪ সংখ্যক কবিতাটি লক্ষণীয়।—দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় ক্লান্ত কবি 'বাংলার ঘাসে বসতে গিয়ে অনুভব করলেন', 'যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ গাঢ় বিষন্নতা; / যেখানে শুকায় পদ্ম—বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব, / যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার / কাঁকণ বাজিত, আহা, কোনো-দিন বাজিবে কি আর।' উল্লেখযোগ্য, আবার ৯ সংখ্যক কবিতায় রূপকথার চরিত্রগুলি অভিন্নতা সূত্রে সমুপস্থিত,—' ···সীতারাম রাজারাম

রামনাথ রায়···/ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙ্গে চলে যায়—/এই ঘাস; এরি নিচে কঙ্কাবতী, শঙ্খমালা করিতেছে বাস'; বলা বাহুল্য, 'রূপসী বাংলা'-র বহু কবিতায় রূপকথার নানা উপাদান-আশ্রয়ে অতীত-সমৃদ্ধির স্মৃতিচারণায় এক ধূসর বিষণ্ন জগত-সৃষ্টিতে জীবনানন্দ অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন।

২। (৩) [৩] পশুপাখি কথা: লোকসমাজে সুপ্রচলিত পশু-পাখি-কেন্দ্রিক কথার নানা অনুষঙ্গ আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় স্থান-প্রাপ্ত। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের 'পথহারা' কবিতায় পশু-কথার প্রভাবে 'শেয়াল' ও 'সিংহ'-কে যথাক্রমে 'ভায়া' ও 'মামা' সম্বোধন করা হয়েছে,—"শেয়াল ভায়া,/মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ/দেখিয়ে দে-না মোরে', ঐ কবিতারই অন্যত্র, 'সিঙ্গি মামা কোথা থেকে/হঠাৎ কখন এসে ডেকে/কে জানে মা, হালুম করে/পড়ল যে কার ঘাড়ে"।

রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' (১৯৩৬) কাব্যের একাধিক কবিতায় বিবিধ প্রাণী সংক্রান্ত লোককথার প্রভাব অল্পবিস্তর বিদ্যমান। পশু কথার অনুসরণে এখানে 'কোলা ব্যাঙ্', (৬৭ সং: কবিতা), 'জিরাফ' (৮০ সং: কবিতা), বিড়াল, (৯৪ সং: কবিতা) প্রভৃতি প্রাণীগণ—শুধু সবাকই নয়, অন্যান্য আচার-আচরণে রীতিমত মানবিক গুণ-সম্পন্নও।

আবার কৌতুকরস-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জসীমউদ্দিনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে 'খালুই' মাথার শিয়ালের বরবেশে শিয়াল-সম্পৃক্ত লোককথা স্মরণে আসে।

২। (৪) গীতি: গীতিপ্রাণ বাংলার কাব্য-কবিতায় গীতির প্রভাব দুর্লক্ষ নয়। অনেক ক্ষেত্রে লোক সমাজে প্রচলিত বিচিত্র গীতি-সম্ভারের অনুরণনও বাংলা কাব্য-কবিতায় লক্ষণীয়। আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

রবীন্দ্র-কাব্য ধারায় লোকগীতির প্রভাব অনস্বীকার্য। কবির বহু গানও লোকগীতির প্রভাব সমন্বিত। বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, গোষ্ঠগান প্রভৃতি লোকগীতি তাঁর বহু সঙ্গীতে প্রভাব-বিস্তারী। এসব লোকগীতির মধ্যে আবার বাউল গানের ভাবাদর্শ-ও তাঁকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শৈশব-কৈশোর থেকেই কবির সঙ্গে লোকগীতির পরিচয় ঘটে। তাঁর সংগীত-শিক্ষাতেও লোকগীতির বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষণীয়।

'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থে-র' 'বাউল' নামাঙ্কিত একটি কবিতায় বাউলের যে মূর্তি মেলে তা রীতিমতো সজীব। শুধু মূর্তিই নয়, তিনি

ঘরছাড়া বাউলের মতোই প্রাণের দোসরের সন্ধানও করেছেন, 'দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন সুদূরে, / ঘরছাড়া মোর ভাবনা-বাউল বেড়ায় ঘুরে' / (দোসর : শিশু ভোলানাথ) ; রোমান্টিক সুদূর পিয়াসা এখানে 'বাউলিয়া' ভঙ্গিতে দ্যোতিত, স্মরণযোগ্য, 'শেষসপ্তক' কাব্যগ্রন্থের ১৩ সংখ্যক কবিতাটিতে বিখ্যাত একটি বাউল গানের পংক্তিও সংযোজিত। সদর দরজায় এসে বাউলের গাওয়া গান 'অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়' (মূল রূপটি : 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়') শুনে 'অবুঝ মন' জীবনের গভীর সত্য উপলব্ধি করেছে।

কুমুদরঞ্জনের একটি কবিতার নাম 'বাউল'। এছাড়া তাঁর 'একতারা' কাব্যের 'নীড় ভ্রষ্ট' কবিতায় বাউল গানের প্রভাব বিদ্যমান ; অন্বেষণ-ব্যাকুল কবি চিত্ত আক্ষেপ-কাতর,—'মন পাখি তাই কাঁদিয়া ফিরিছে / আকুল অতল আকাশে'।

বাউল বেহিসাবী, বাউল প্রমত্ত। 'ত্রিযামা'-র 'বাউল প্রেম' কবিতায় প্রথম যৌবনের প্রণয়-উচ্ছল দিনগুলির কথা স্মরণ করেন, বিগত-যৌবন কবি যতীন্দ্রনাথ। যৌবনের প্রেমকে 'বাউল প্রেম' আখ্যা দিয়ে বলেন, —'এখন বাউল প্রেমের বয়স হয়েছে'। প্রৌঢ়ত্বে নেই উন্মত্ততা, নেই বেহিসাবীপনা,--প্রৌঢ় কবির এই অভাববোধ এখানে প্রকাশিত।

যতীন্দ্রমোহনের 'ভাটিয়ালি' (মহাভারতী) কবিতাটি সুপরিচিত ভাটিয়ালি গানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'ভাটিয়ালি' গানের উপজীব্য বিষয় হ'ল প্রেম। আলোচ্য কবিতাটিও প্রেম বিষয়ক। ভাটিয়ালি গানের মতোই সে প্রেম মিলনে মধুর নয়, বিরহে-বিধুর। কবিতাটির শেষ দুটি স্তবক যেন নাগরিক ভাষায় লেখা 'ভাটিয়ালি'। রোমান্টিক প্রেমের আবহ নির্মাণেও ভাটিয়ালি গানের প্রভাব বিদ্যমান।

জীবনানন্দের কবিতায় দিনশেষের চিত্র রচনায় 'ভাটিয়ালি সুরের উল্লেখ ঘটে,--'ভাটিয়ালি সুর সাঁঝের আঁধারে দরিয়ার পারে মেশে,--' (আমি কবি সেই কবি : ঝরা পালক)।

রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতায় কর্মগীতি 'সারি'-র উল্লেখ মেলে। কখনো নদীর বর্ণনায়,—'কত মাঝিরা ধরেছে হাল, / সুখে সারি গান গায় দাঁড়ি' (নদী), কখনো বা কবির অন্তরতম দেবতা তথা বিশ্বদেবতাকে 'কর্ণধার' কল্পনা করে তাঁর আহ্বান 'সারি'-র রূপকাবরণে দ্যোতিত,— 'যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধু পারে / আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে / হয়েছে আমার চেনা, কতবার তারি সারি গানে /

নিশান্তের নিদ্রাভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে।...' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : পূরবী)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'সারি' দ্রুতলয়ের কর্মগীতি। সেদিক থেকে গভীর ভাবের বাহন রূপে, তা ঠিক মানানসই নয়।

আবার সমাজ-সংসারের অভিজ্ঞতায় যতীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে,—'দাঁড়ের আঘাতে আড়ে তাল রেখে দাঁড়িরা গাহে না সারি' (কাণ্ডারী : মরুশিখা), দাঁড়িদের 'সারি' গান গাওয়া এখানে অতীত-আনন্দের ইঙ্গিতবাহী।

পক্ষান্তরে বিপ্লব চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি সুকান্ত-র কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের অন্যতম উদ্দীপক রূপে 'সারি' গৃহীত। সাম্রাজ্য-বাদী শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আসন্ন মুহূর্তে কবির আহ্বান,—'ঘরে তোল ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখ কাস্তে, / গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে' (উদ্যোগ : পূর্বাভাস)।

নজরুলের 'সর্বহারা'-র ধীবরদের গান, 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান' প্রভৃতি কবিতায় লোকগীতির প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ-যোগ্য, নজরুলের কয়েকটি গান লোকগীতির সুরে রচিত।

যতীন্দ্রমোহনের 'চাষার মেয়ের গান' (রেখা) কবিতাটিও লোক-গীতি-র প্রভাবসমন্বিত। তাঁর 'আগমনী' (অপরাজিতা) কবিতাটি আগমনী গীতির দ্বারা প্রভাবিত। এছাড়া দেবদেবীর নাম সম্বলিত 'কীর্তন', বর্ষা-সংশ্লিষ্ট 'ভাসান', গাজনোৎসব উপলক্ষে গীত; গম্ভীরা প্রভৃতি লোকগীতির উল্লেখ আলোচ্য কালপর্বের কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায়।

জসীমউদ্দিনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'রঙিলা নায়ের মাঝি' (১৯৪৭), 'রাখালী' (১৯৩০) প্রভৃতি কাব্যে লোকগীতির প্রভাব বিদ্যমান যেমন, 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এ সোজনের বিরহানুভূতি জারি গানের মাধ্যমে প্রকাশিত। স্মরণযোগ্য, জসীমউদ্দিনের কাহিনী কাব্যগুলির নানা স্থানে সুপরিচিত লোকগীতিও সন্নিবিষ্ট।

সুদীর্ঘ প্রবাসজীবনের ফাঁকে ফাঁকে অমিয় চক্রবর্তীর কবিমানসে স্বদেশের স্মৃতি উদ্ভাসিত হয়। সে স্মৃতি গীতিপ্রাণ বাংলা দেশের, যেখানে 'গাঙে স্রোত, ভাটিয়ালি কীর্তন, দেউল, মুর্শিদার বাড়ি' (প্রবাসী : মাটির দেয়াল)।

লোকগীতির রূপরীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, ধ্রুবপদ বা ধুয়াপদ ; একটি বা একগুচ্ছ পংক্তি অবিকৃতভাবে একই গানে পুনরাবৃত্ত হলে তাকে ধ্রুবপদ বা ধুয়াপদ বলে।

আলোচ্য কালপর্বের কবিরা লোকগীতির এই রূপরীতিটি নানা উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছেন। কখনো বক্তব্যকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠার্থে, কখনো বিশেষ কোনো ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টিকরে, কখনো বা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে এ রূপরীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'-র 'নৌকাযাত্রা' কবিতায় শিশুর স্বপ্নময় রূপকথার রাজ্যে প্রবেশের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতি স্তবকান্তে বিশেষ দুটি পংক্তির পুনরাবর্তনে ব্যক্ত,—'আমি কেবল যাই একটি বার / সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার'। উল্লেখ্য, পংক্তি দুটি সর্বত্র কিন্তু অপরিবর্তিত থাকেনি। আবার 'চরকার গান'-এ ('কাব্য সঞ্চয়ন') স্বাদেশিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ দেশবাসীকে স্বাবলম্বী হবার যে আহ্বান জানান, তাতে 'দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া' পংক্তিটি প্রতি স্তবকান্তে মোট ৮ বার পুনরাবৃত্ত হয়। বিপ্লব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, গণ বিপ্লবের দিন আসন্ন প্রায়। এ বিশ্বাস গভীর থেকে গভীরতর রূপে প্রতিভাত হয়, যখন 'অগ্নিময় একটি কবিতা লেখা হবে' (একটি কবিতার জন্য অগ্নিকোণ) বলে কবি একই কবিতায় চারবার পংক্তিটির পুনরাবৃত্তি ঘটান।

২। (৫) গীতিকা: বিশ শতকের প্রথমার্ধের কাব্য-কবিতায় লোকগীতিকার প্রভাব-প্রতিফলন নিতান্তই কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য কালপর্বের কবিদের মধ্যে একমাত্র জসীমউদ্দিন ছাড়া লোকগীতিকার সুগভীর প্রভাব অন্যত্র প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কয়েকটি কাহিনীমূলক দীর্ঘ কবিতায় লোকগীতিকা পরোক্ষভাবে প্রভাবসঞ্চারী।

বাংলার অধিকাংশ লোকগীতিকার বিষয় রোমান্টিক প্রেম। এই রোমান্টিক প্রেমকে কেন্দ্র করে যতীন্দ্রমোহনের 'জটাই', (অপরাজিতা), 'জেলের ছেলে' ('নাগকেশর'), প্রভৃতি কাহিনীমূলক কবিতায় বাংলা লোকগীতিকার প্রভাব লক্ষণীয়। লোকগীতিকার মত সেখানেও প্রেম-বিরহের-দ্বন্দ্ব-ই কাহিনীর কেন্দ্রমূলে অবস্থিত। বলা বাহুল্য, কবির রোমান্টিক অনুভূতি এসব কবিতাগুলিতে লোকগীতিকার আদলে সার্থক রূপে প্রকাশিত।

কুমুদরঞ্জনের 'উজানি'র (১৯১১) কবিতাগুলিতে লোকগীতিকার ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। এ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি নিজেই কবিতাগুলিকে 'গাথা' বলে উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে পল্লীকবি জসীমউদ্দিন বিশেষভাবে স্মরণীয়। কবি তাঁর 'নকশী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' প্রভৃতি কাব্যে ব্যাপকভাবে

লোকগীতিকার অনুসারী। এসব কাব্যের ভাবই শুধু নয়, কাহিনী ও গঠন ভঙ্গিতেও লোকগীতিকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত কাব্যের নায়ক-নায়িকারা "মৈমনসিংহ গীতিকা" কিংবা "পূর্ববঙ্গগীতিকার" প্রেমমূলক পালাগুলির নায়ক-নায়িকারা যেন সহোদর-সহোদরা। স্মরণ-যোগ্য, জসীমউদ্দিন নিজে বাংলার একাধিক লোকগীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া লোক-ঐতিহ্য-চর্চার সূত্রেও তিনি লোকসমাজ ও লোক-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁর সমগ্র কাব্য-সম্ভারেই এই লোক-ঐতিহ্য-চর্চার প্রভাব লক্ষণীয়। 'নকশী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে লোকগীতিকার প্রভাব তাই সাবলীল ও স্বাভাবিক মনে হয়। লোকগীতিকার মেজাজটি তাঁর রচনায় যথাযথভাবে রক্ষিত। জসীমউদ্দিনের রোমান্টিক কবি-স্বভাব লোকগীতিকার আঙ্গিক আশ্রয়ে সফল ও চরিতার্থ।

২।(৬) **লোক ভাষার নানা দিক:** ব্যক্তিনাম, স্থান নাম, বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয়, শব্দদ্বৈত, শব্দ বিকৃতি প্রভৃতি এ পর্যায়ের অন্তর্গত।

২।(৬)[১] **ব্যক্তি নাম:** আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় লোক-ঐতিহ্য-প্রসূত ব্যক্তি-নামের প্রয়োগ বহু ক্ষেত্রেই লভ্য। সাধারণভাবে বাস্তবতা-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই কাব্য-কবিতায় এ প্রয়োগ লক্ষণীয়।

শিশুর দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ জননীর মনে হয়, তাঁর সন্তানই জগতের সেরা 'দুষ্টু', কিন্তু শিশু তার পরিচিত মহলের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে বিশেষ কোন পার্থক্য খুঁজে পায় না। আমাদের কাছে এ এক অতিপরিচিত দৃশ্য। তাই এ অতিপরিচয়ের বাস্তবতা অক্ষুন্ন রাখতে শিশুর মুখে সাধারণ-লভ্য কয়েকটি লোকনাম উচ্চারিত হয়েছে,—'**পাঁচকড়ি ঘোষ** লক্ষ্মী ছেলে, / দত্ত পাড়ার **গবাই,** / তোমার কাছে আমিই দুষ্টু / ভালো যে আর সবাই' (দুষ্টু : শিশু ভোলানাথ : রবীন্দ্রনাথ), অন্যত্র শিশু প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ শিশুর নিজেকে 'বড়' ভাবার মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাটি লক্ষ করেছেন, 'রাজমিস্ত্রী' (ঐ) কবিতায়। সেখানে শিশু বলেছে,—'আমি নই মা, তোমার শিরিশ, / আমি হচ্ছি নোটো।' বলা বাহুল্য, 'নোটো' শিশুর পরিচিত মহলের এক রাজমিস্ত্রী। এছাড়া এ কবিতাতেই '**তমিজ মিঞা'র** গোরুর গাড়ি চড়ে' যাবার কথাও পাই। 'পুনশ্চ'র 'ছেলেটা' কবিতায় অনুরূপ সূত্রে '**খোদন দাদা**', সিধু গয়লানী'র সাক্ষাৎ মেলে। 'ছড়ার ছবি-'র একটি কবিতার নাম 'বুধু'; '**বুধু**' হ'ল গায়ের মোড়ল। আবার একই সঙ্গে লৌকিক পরিবেশ চিত্রণে ও

কৌতুক রস সৃষ্টিতে লোকনামের সার্থক ব্যবহার 'ছড়া'র ৬ সংখ্যক কবিতায় দৃষ্ট হয়, —'**খেঁতুবাবুর** এঁদো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে, / **পদ্মমণি** চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে'। এছাড়া, এ কবিতায় '**ন্যাড়া** সরকার', '**নাচনমণি**', '**হড়ম বিবি**' প্রমুখ লোকনামাঙ্কিত ব্যক্তিরাও উপস্থিত হয়েছে।

পল্লীর পরিবেশ পরিস্ফুটনে কুমুদরঞ্জনের '**ছিরু**' ('উজানি'), '**নোটন**' (ঐ), '**রসিক বাগদি**' (ঐ) প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্তি-আশ্রয়ী নামকরণে লোকঐতিহ্যপুষ্ট ব্যক্তিনামের প্রভাব সুস্পষ্ট।

যতীন্দ্রমোহনের কাহিনীমূলক কবিতাগুলিতেও লোকঐতিহ্য-সৃষ্ট ব্যক্তিনাম মেলে। লৌকিক পরিবেশের বাস্তব যাথার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছেন কবি। যেমন, কাঁসাই নদীর তীরের পটভূমিকায় রচিত 'জটাই' (অপরাজিতা) কবিতায় কাহিনীর নায়ক '**জটাই**', নায়িকা '**সরম**' উভয়েই লোকসমাজেরই পরিচিত যুবক-যুবতী, তাঁর 'বন্ধুর দান' কাব্যগ্রন্থের '**নিমাই**' নামাঙ্কিত কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বলা বাহুল্য, 'নিমাই' লোক-সংস্কার-প্রসূত লোকনাম বিশেষ।

কিশোর-উপযোগী হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নজরুলের কবিতায় 'খ্যাদা নাকে' '**ন্যাদা**'-কে (খাঁদু-দাদু : ঝিঙেফুল) নাচতে দেখা যায়। যতীন্দ্রনাথের 'মরুমায়া' কাব্যগ্রন্থের 'দুঃখের পার' কবিতায় নিছক বর্ণনা-সূত্রে লৌকিক দেবতা **পাঁচু** ঠাকুরের কৃপাপুষ্ট কন্যা-সন্তান '**পাঁচী**'র নাম উল্লিখিত। আবার 'বেণু'র সঙ্গে ছন্দ সাদৃশ্যে আগত '**গেনু দাস**'-ও (বাঁশীর গল্প : মরুশিখা : ঐ) লোকসমাজেরই মানুষ।

জসীমউদ্দিনও এক্ষেত্রে লোকঐতিহ্যের অনুসারী। তাঁর সৃষ্ট '**রূপাই**', '**সাজু**' (নকশী কাঁথার মাঠ) ,সোজন, দুলী ('সোজন বাদিয়ার ঘাট'), প্রভৃতি চরিত্র-নাম বিষয়ানুগ। অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়।

২। (৬) [২] **স্থান নাম ঃ** কবিতায় বাস্তব পরিবেশ রচনা সূত্রে বহু বিচিত্র স্থান–নামেরও উল্লেখ মেলে।

শিশুর নিজ রাজ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ বীর। স্বপ্ন আর কল্পনা জগতে নিত্য নতুন তার বীরত্ব লীলার মহড়া চলে। রবীন্দ্রনাথের 'বীর পুরুষ' (শিশু) কবিতার শিশু এমনই এক স্ব-কল্পিত বীর। তার কাল্পনিক বীরত্ব-লীলা সূত্রে লোকসাধারণ প্রদত্ত স্থাননাম '**জোড়া দিঘীর মাঠে**'র অবতারণা ঘটে।

'ছড়ার ছবি'র 'জলযাত্রা' কবিতায় রকমারি স্থাননামের উল্লেখ লভ্য। যেমন, '**মহেশগঞ্জ**', '**বাদুড় ঘাটা**', '**মুন্সী পাড়া**', '**খড়কে ডাঙার**

হাট', মুখলুচরের ঘাট', 'নওয়া পাড়া', 'উজিরপুর', 'ভজন ঘাটা' 'মাখনা গাঁ', 'বাঁকা দিঘির ঘাট', প্রভৃতি। এসব স্থাননাম ব্যবহারে জলযাত্রার চলমান ছবিটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আবার কুমুদরঞ্জনের পল্লীমুগ্ধ রোমান্টিক কবিমানস 'কুনুরের' তীরে পরিভ্রমণ করে (দ্রষ্টব্য: রসিক বাগদী: উজানি)। মৎস্য শিকারের বাস্তবানুগ বর্ণনায় যতীন্দ্রনাথের 'মৎস-শিকার' (মরুমায়া) কবিতায় লোক-ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত 'রাজড়ার খাল'-এর সাক্ষাৎ মেলে। তাঁর অন্য একটি কবিতায় দেখি, 'ব্রাহ্মণের বাড়ীর সন্নিকটে 'বাগদী-পাড়া' (জীব উদ্ধার: ত্রিযামা)।

''স্মরগরল' কাব্যের (মোহিতলাল) 'প্রেম ও ফুল' কবিতার ১ম পর্বে 'ষষ্ঠী তলা-র উল্লেখ মেলে; বিষ্ণু দে-র সুবিখ্যাত 'জল দাও' (অন্বিষ্ট/১৯৫০)/ কবিতাটিতে দেখি, 'হুগলির নিস্তরঙ্গ সঙ্কী মধ্যাহ্নে 'কবির অতীতচারী মন'—দামোদর, কাঁসাই, হলদি রসুলপুরের / দূরের মাৎলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার' বানে সময়ের নিরন্তর বহমানতা অনুভব করেছে। বলা বাহুল্য, এখানে স্থান ও নদী উভয়েরই লোকঐতিহ্যানুসারী নাম গৃহীত হয়েছে।

২। (৭) [৩] বিশেষ্য: 'দাগা'—আঘাত-'সে শান্তি নেই, সে দুষ্টু নেই, / রইল শুধু এই / চিরদিনের দাগা' (চিরদিনের দাগা: পলাতকা: রবীন্দ্রনাথ); গভীর বেদনা পরিস্ফুটনে 'দাগা' শব্দটি সার্থক প্রযুক্ত। 'পৈঁঠা'—সিঁড়ি / সোপান-'বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম, একে একে / পুকুরের পৈঁঠা যায় জলে ডুবে' (বালক: পুনশ্চ: ঐ)। গ্রাম্য চিত্র বর্ণনায় এখানে লোক-শব্দটির প্রয়োগ যথাযথ। 'পাঁপ'—বাঁশের ভিতরের ফাঁপা অংশের নরম শাঁস,—'কোপ লাগলে তলদা-ঝাড়ে লম্বা পাঁপের কন্ঠ ঘেঁষে' (বাঁশীর গল্প: মরুশিখা: যতীন্দ্রনাথ)। 'সোঁতা'—স্রোত—পূবে হাওয়ায় বইল সোঁতা (ভুঁইচাপা: কুহু ও কেকা: সত্যেন্দ্রনাথ)। 'সোদর'—সহোদর—সোদর অধিক হয় (ফুল শিরণি: ঐ)। 'ঠাম'—গঠন, রূপ, —সোনার মাজা রংটি দেছে, দেছে শোভন ঠাম' (পারুল: ফুলের ফসল: ঐ)। 'আড়া'—কুটির—'কুনুরের তীরে ছোট আড়াটিতে (রসিক বাগদী: উজানি: কুমুদরঞ্জন)।

২। (৭) [৪] বিশেষণ: 'মেলা'—অনেক। শিশুমন পড়াশোনার নিয়মজালে বেশিক্ষণ বন্দী থাকতে চায় না, সে চায় মুক্তির আনন্দ। তাই পড়াশোনা থেকে ছুটি পেতে যুক্তি খাড়া করে,—'সকাল থেকে পড়েছি' মেলা (প্রশ্ন: শিশু: রবীন্দ্রনাথ)।

আদুল—নগ্ন। মুক্ত জীবনাকাঙ্খার বর্ণনায় করুণানিধানের উক্তি, —'মাঝ গঙ্গায় জাল ফেলিব / উদাস **আদুল** গায়' (বাসনা : ঝরাফুল)।

ওঁচা—নিকৃষ্ট। 'কেন ভাই রবি, বিরক্ত কর ? তুমি দেখি ষব **ওঁচা**' (ঘুমের ঘোরে : মরীচিকা : যতীন্দ্রনাথ)।

ফ্যানসা—ফেনযুক্ত। 'ফ্যানসা ভাতে' পাল্কীর গান : (কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ)।

'দড়'—দক্ষ। 'অন্যায় রণে যারা যত **দড়**' (ফরিয়াদ : সর্বহারা : নজরুল)।

২। (৭) [৫] ক্রিয়া : **'পোহাই'**—(যাপন করা অর্থে)—জেগেই **পোহাই 'রাতি'** (সহমরণ : বেণু ও বীণা : সত্যেন্দ্রনাথ)।

'ঢুঁড়ে' '(সন্ধান ক'রে)—'বনে বনান্তরে **ঢুঁড়ে**' (নূতন পথে : মরুমায়া : যতীন্দ্রনাথ)।

'চাগায়'—(জাগায়, উদ্রেক করে)—'মাজায় তোর চাগায় বাত' (অকালের পটল : ঐ)।

এছাড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দ সহযোগে ক্রিয়ার উল্লেখও লভ্য। যেমন, —তোমার খুকি **খিল খিলিয়ে** হাসে (বিম্ব : শিশু : রবীন্দ্রনাথ)। **'ঝুপ ঝুপিয়ে বৃষ্টি পড়ে'** (ছুটির দিনে : শিশু : ঐ)। 'বকুল শাখা ব্যাকুল হ'ত **টলমলাত** জুঁই (চৈতী হাওয়া : ছায়ানট : নজরুল)।

২। (৭) [৬] অব্যয় : (সম্বোধনসূচক) 'আমি বাপু ঢেকেই বসি / যেটাই মুখে আসুক না' (পরিচয় : শিশু : রবীন্দ্রনাথ)। **'বাছা রে** তোর চক্ষে কেন জল' (অপযশ : ঐ)। **'হ্যাঁ লা** ও পোড়ারমুখী' (কিশোরী : ঐ)। 'শুধাই, শুন **লো**, / কি গল্প শুনিতে চাও' (৩৩ সংখ্যক কবিতা : রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ)। 'পুরুষ কখন আপন হয় **লা**'। (প্রাচীনার প্রলাপ : মহাভারতী : যতীন্দ্রমোহন)। বল না হ্যাঁ **লো** (কলস ভরা : স্বপন পসারী : মোহিতলাল)। 'দিদি **লো** বড় জ্বালা' (ষট্পদাবলী : মরুশিখা : যতীন্দ্রনাথ)।

২। (৭) [৭] শব্দদ্বৈত : **'কানে কানে'**, **'ঘাটে ঘাটে'**, **'পথে পথে'**, **'হাটে হাটে'** (তারা : পূরবী : রবীন্দ্রনাথ)। **'ঘরে ঘরে'** (সোম : হোমশিখা : সত্যেন্দ্রনাথ)। **'হাতে হাতে'** (স্বাগত : চিরকুট : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

সহচর অনুচর প্রতিচর শব্দ ঃ

'সহচর—**'ঝাড়ামোছা'** (ফাঁকি : পলাতকা : রবীন্দ্রনাথ)। **'আলা ভোলা'**। আলা—শিথিল। (চূত মঞ্জরী : স্বপন পসারী : মোহিতলাল)। **'ইতিউতি'** (মিলনোৎকণ্ঠা : স্মরগরল : ঐ), **'লাথি ঝাঁটা'** (অবেলার ডাক : দোলন চাঁপা : নজরুল), 'জবু থবু' (সোনালি ঈগল : পূর্বলেখ : বিষ্ণু দে)।

অনুচর—**'ফাঁকি ফুঁকি'** (উপহার : শিশু : রবীন্দ্রনাথ), **'ঝগড়া ঝাঁটি'** (ঝাঁকড়া চুল : বিচিত্রিতা : ঐ), **'কাঁদাকাটা'** (কিশোরী : স্বপন পসারী : মোহিতলাল), **'চেয়ে-চিন্তে'** (বন্ধুর দান : বন্ধুর দান : যতীন্দ্রমোহন)।

প্রতিচর—**'আগুপিছু'** (মুক্তি : পলাতকা : রবীন্দ্রনাথ), **'উঁচু-নীচু'**, 'সুখ দুখ' (ঘুমের ঘোরে / ২য় ঝোঁক : মরীচিকা : যতীন্দ্রনাথ)।

২। (৭) [৮] **ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঃ**

পুট পুটে (ক্ষুদ্রার্থে)—'একরত্তি মেয়ে-র বর্ণনায় **পুটপুটে** তার ঠোঁট' (হাসিরাশি : শিশু / রবীন্দ্রনাথ)।

'ঝাঁঝাঁ' (রৌদ্রের উত্তাপ প্রকাশার্থে)—'আকাশ **ঝাঁঝাঁ** করছে', (ফাঁক : পুনশ্চ : ঐ)।

ঘড়ি ঘড়ি (অজস্র অর্থে)—'খিদের জ্বরে কচি-কাঁচা মরছে নিত্য ঘড়ি ঘড়ি' (দুর্ভিক্ষে : কুহু ও কেকা : সত্যেন্দ্রনাথ)।

ভুরভুরি (বুদ্বুদধ্বনি)—'পেটে হাসির **ভুরভুরি**' (বাঁচা চাই ; ত্রিযামা : যতীন্দ্রনাথ)।

চকচক্ (শাণিত অর্থে)—'মাজায় গোঁজা কাটারী রামকাটারী **চক চকাচক** ধার' (সোজন বাদিয়ার ঘাট : জসীমউদ্দিন)। উল্লেখযোগ্য; গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকের একস্থানে বিদ্যুতের চিত্রকল্পে দেখি, 'যবে **চক চকা চক** হানবে চিকুর'।

বন্ বন্ (আবর্তনের চিত্র রচনা সূত্রে)—'**বন্ বন্** ঘুরছে বিশ্বেরলাটু' :

খাঁ-খাঁ (শূন্যার্থে)—'গ্রাম করে **খাঁ খাঁ**' (এই আশ্বিনে : চিরকুট : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

২। (৭) [৯] শব্দ বিকৃতি—**'ছিষ্টি'** (সৃষ্টি)—সর্বত্র অর্থে গৃহীত,—"**ছিষ্টি** খুঁজে মিষ্টি নামটি '(পরিচয় : শিশু : রবীন্দ্রনাথ)। **'জোনাই'**

(জোনাকি)—'সন্ধে হলে **জোনাই** জ্বলে' (সাত ভাই চম্পা : ঐ)। **বোশেখ জষ্টি**—(বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ)—'**বোশেখ জষ্টি** মাসকে ওরা দুপুর বেলা কয়' (বৈজ্ঞানিক : ঐ)।

'ব্যাভারে' (ব্যবহারে)—'ছিঁচকে চোরের **ব্যাভারে**—('ইঁদুরের মকদ্দমা : সত্যেন্দ্রনাথ)। **'রুখু'**—রুক্ষ—'কিছু রাখিবে না রুখু' (কাশ ফুল : কুহু ও কেকা : ঐ)।

২। (৭) [১০] **বিশিষ্ট বাকভঙ্গি**–'বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে' (সাধারণ মেয়ে : পুনশ্চ : রবীন্দ্রনাথ)। '—হ'ল **হাড় জ্বালাতন**' (ঘুমের ঘোরে : ৫ম ঝোঁক : মরীচিকা : যতীন্দ্রনাথ)। '**—কপাল এমনি ফাটা**' (ইঁদুরের মকদ্দমা : সত্যেন্দ্রনাথ)। '**বুকফাটে** তাও **মুখফোটে না**' (আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে : দোলন চাঁপা : নজরুল)। '**মর গো ভাগাড়ে গিয়ে**' (সাম্যবাদী : সর্বহারা : ঐ)। '**হ্যাংলা ও পোড়ারমুখী**' (কিশোরী : স্বপন পসারী : মোহিতলাল)। 'হা রে হা রে এই আমারই **কপাল পোড়া**' (উঁরাওগান : সন্দীপের চর : বিষ্ণু দে)।

৩। বিশ্বাস-অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি :

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কাব্য-কবিতায় প্রতিফলিত বহু বিচিত্র লোক—বিশ্বাস-সংস্কার, লোক প্রথা-আচার ও লোক উৎসব-অনুষ্ঠান এ পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

৩। (১) **লোক-বিশ্বাস :** লোক-বিশ্বাস লোক সমাজ থেকে উদ্ভূত হলেও তার প্রভাব নগর সমাজেও সুবিস্তৃত; তাই বিশ শতকের আলোচ্য কবিদের কাব্য-কবিতায়ও লোক-বিশ্বাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতার তুলনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক-বিশ্বাসের প্রভাব ব্যাপকতর ছিল। কারণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে যুক্তি ও বিজ্ঞানের তুলনায় ধর্ম-বিশ্বাসই ছিল ব্যক্তির জীবনাচরণের প্রধান নিয়ন্তা। উনিশ শতকে গতানুগতিক এই সমাজ-জীবনের পালা-বদল শুরু হয়। সুদীর্ঘ-কালের ঐতিহ্য-প্রসূত বিশ্বাসের স্থানে যুক্তি ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সে যুগের অধিকাংশ কবিই ব্যক্তিগত জীবনে বহুবিচিত্র লোকবিশ্বাস-সংস্কারের

অনুবর্তী ছিলেন, যার প্রভাব তাঁদের কাব্য-চর্চাতেও প্রতিফলিত। কিন্তু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমির কালক্রমিক পরিবর্তন বিশ শতকের বাংলার সমাজে ভিন্নতর মূল্যবোধের জন্ম দিল। স্বভাবতঃই সাহিত্য জগতেও এ পরিবর্তনের প্রভাব স্বীকৃত হল। একারণেই এযুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক বিশ্বাস-সংস্কারের অবিসংবাদিত প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। এখন এযুগের কাব্য-কবিতায় লোকবিশ্বাসের প্রভাব প্রতিফলন লক্ষ করা যেতে পারে।

দিন-ক্ষণ-যাত্রা-সম্পর্কিত বহু বিচিত্র বিশ্বাস লোকসমাজে সুপ্রচলিত; রবীন্দ্রনাথের 'নারীর কর্তব্য' (প্রহাসিনী) কবিতায় এ ধরণেই একটি লোক-বিশ্বাস সহাস্য কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে। কবিতাটিতে কবি 'নারীর কর্তব্য' সম্বন্ধে কয়েকটি সরস ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছেন বলে রমণীকুলের সম্মিলিত আক্রমণের সম্ভাবনার ছদ্ম-আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন,—'বেস্পতি-বারের বারবেলা / এ কাব্য হয়েছে লেখা, / সামলাতে পারব কি ঠেলা'—। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কোনো কাজ শুরু করা অশুভজনক—এ লোকবিশ্বাসটি এখানে প্রতিফলিত।

আবার কুমুদরঞ্জনের একটি কাহিনীমূলক কবিতায় এর বিপরীত-ধর্মী লোকবিশ্বাসটি-র সন্ধান মেলে। সেখানে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান নিধিরাম তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে বলে 'বাবু'-র কাছে জানতে চেয়েছে '—বিদ্যারম্ভের দিনটি কবে ভালো' (প্রথম ভাগ: একতারা); লোকসমাজ-নির্দিষ্ট শুভ দিন-ক্ষণে বিদ্যারম্ভের লোকবিশ্বাসটি এ কবিতায় বাস্তব পরিবেশ-সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

যাত্রা-সম্পর্কিত বিচিত্র লোকবিশ্বাসও কোনো কোনো কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, সমকালীন যুগজীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে ব্যঙ্গপ্রবণ যতীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাঁচা চাই' (ত্রিযামা) কবিতাটিতে সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যিক কর্তব্যের যে তালিকাটি পেশ করেছেন, সেখানে দেখি, 'যাত্রা শুভ করতে হলে পাঁজিতে দিন বাছা চাই'। এখানে লোকবিশ্বাসের অনুসরণের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে সমাজের পশ্চাদপসারণেরই ইঙ্গিতবাহী; অনুরূপ সূত্রে কবিতাটিতে এ জাতীয় একাধিক লোকবিশ্বাসের উল্লেখ মেলে। যেমন, 'কারও ভালো হবার হলে উত্তমাঙ্গ নাচা চাই' কিংবা 'বিফল যদি হতে চাও ত পিছনে কেউ হাঁচা চাই'—এ প্রস্তাব দুটি যথাক্রমে, শরীরের বিশেষ কোনো অঙ্গের আন্দোলনে শুভ ফললাভ ও যাত্রাকালে 'হাঁচি' পড়লে অশুভ ফললাভের লোকবিশ্বাস-সঞ্জাত।

যাত্রা-সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস যতীন্দ্রমোহনের কবিতায়ও দুর্লভ নয়। তাঁর 'শুভযাত্রা' ('লেখা') কবিতাটির নামকরণেই এ জাতীয় লোক-বিশ্বাসের ইঙ্গিত লভ্য। কবিতাটিতে 'শুভক্ষণ' দেখে 'শারদীয় অবসর শেষে' কবির বিদেশ যাত্রা-র সময় নির্ধারিত হয়েছে। 'আসন্ন বিরহের কথা ভেবে কবি ও তাঁর প্রিয়া উভয়েই ব্যাকুল, কিন্তু "সূর্য অনুদয়ে যাত্রা—তারপর নাকি / পড়িবে 'অদিন', আর আধ-ঘন্টা বাকী"। এক্ষেত্রে যাত্রা-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের প্রয়োগে কবি রোমান্টিক প্রেমের তীব্র উচ্ছ্বাস প্রকাশের সুযোগ করে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আসন্ন বিরহে ব্যাকুল প্রেমের প্রকাশ অনায়াসেই নির্দিষ্ট 'আধ ঘন্টা'র সময়সীমা অতিক্রম করেছে। 'অদিনের' অশুভক্ষণেই কবির—নির্বিঘ্ন বিদেশ-যাত্রায় লোক-বিশ্বাসের পরাভব ও প্রেমের জয় ঘটেছে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেও সমকালীন বিপর্যস্ত সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ লোকবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। যাত্রাকালে টিকটিকির ডাক লোকসমাজে অশুভ সূচক। কিন্তু 'দরজায় টিকটিকি' ডাকা সত্ত্বেও কবি যাত্রা করেছিলেন বলে 'রাস্তার সামনে সাপ পড়েছিলো' (অ্যাকসিডেন্ট : অভিজ্ঞান বসন্ত), তারপর 'বাস ধরতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে 'গাড়িতে আটকালো র‍্যাপার' (ঐ) ইত্যাদি নানাবিধ বিপত্তি ঘটেছে।

আপাতদৃষ্টিতে এখানে লোকবিশ্বাসের জয় সূচিত হলেও এর অন্ত-র্নিহিত তাৎপর্য ভিন্নতর। সমস্যা-জটিল আধুনিক যুগ-জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষের অসহায়তা পরিস্ফুটনে লোকসাধারণের যাত্রা-সম্পর্কিত বিশ্বাসটির সাহায্য নিয়েছেন কবি। মনস্তাত্ত্বিক নৈপুণ্যে তিনি মানুষের সংস্কার-বিশ্বাসের উৎসাহ-উদ্ঘাটন করেছেন।

'পদাতিক' কাব্যের 'রোমান্টিক' কবিতায় সমাজ-সচেতন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমকালীন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবসায়ীর চরিত্র উদ্ঘাটনে লোক-বিশ্বাসাশ্রয়ী। সেখানে তিনি দেখলেন, 'ব্যবসায়ী মন মাহেন্দ্রক্ষণ খুঁজছে/ টিকটিকি ডাকে, বধির সে নির্বন্ধ'; লোকবিশ্বাস,—টিকটিকির ডাক অশুভসূচক। স্বার্থান্ধ ধনতান্ত্রিক সমাজের নগ্ন লোলুপতায় সমকালীন বিশ্ব বিপর্যস্ত। লোকবিশ্বাসটির অনুসরণে কবি টিকটিকির 'বধির' 'নির্বন্ধ' ডাকের মধ্য দিয়ে বিপর্যয়ের অনিবার্য রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন।

বিভিন্ন পশু-পাখিকে কেন্দ্র করে বহুবিচিত্র শুভাশুভ বিশ্বাস পৃথিবীর সব দেশের মতো বাংলার লোকসমাজেও সুপ্রচলিত। আলোচ্য কাব্য-কবিতাতেও এ জাতীয় লোকবিশ্বাস একাধিক স্থানে প্রভাব-সঞ্চারী।

'শকুন' সম্বন্ধে অশুভ বিশ্বাস নানা দেশের লোকসমাজেই প্রচলিত। কোনো কোনো কবিতাতেও 'শকুন' অশুভ শক্তির প্রতীকে পরিণত।

নজরুল যৌবনের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি উপলব্ধি করে দেখলেন, সমাজের রক্ষণশীল শক্তির নানা ষড়যন্ত্র সে অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু 'যে বান ডেকেছে প্রাণ দরিয়ায়, মাঠে ঘাটে বাটে নেমেছে ঢল, / জীর্ণ শাখায় বসিয়া শকুনি শাপ দিক্ তারে অনর্গল' [যৌবন-জলতরঙ্গ : সন্ধ্যা (১৯২৯)], তাতে যুব শক্তির গতি রোধ করা যাবে না, বলে কবির বিশ্বাস। এক্ষেত্রে 'শকুনি'-কে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতীক-কল্পনায় শকুনি-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের প্রভাব সক্রিয়।

কখনো বা অনুরূপ লোকবিশ্বাসের প্রভাব-সূত্রে 'শকুন' মৃত্যু তথা ধ্বংসের প্রতীকার্থেও গৃহীত। আন্তর্জাতিক চেতনায় জীবনানন্দ সমকালীন বিশ্বের হিংস্র, রক্তাক্ত রূপ উপলব্ধি করে লিখলেন, 'সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে আকাশে শকুনেরা চরিতেছে···' (শকুন : ধূসর পাণ্ডুলিপি)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে বিশ্ব-রাজনীতিতে যে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেয়, তারই প্রতিফলন-সূত্রে 'শকুনে'র লোকবিশ্বাসাশ্রয়ী প্রয়োগে কবিতাটিতে নবতর মাত্রা সংযোজিত।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৬-এ প্রকাশিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের এ কবিতাটিতে ১৯৩৯-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত কবির অসাধারণ দূর-দৃষ্টির পরিচায়ক। মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী রূপে শুধু 'শকুন' নয়, 'শকুনবধূ' ও জীবনানন্দের কবিতায় উড্ডীয়মান, '···তখন শকুনবধূ যেতেছিল শ্মশানের পানে উড়ে উড়ে '(ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল : ঝরা পালক)।

'পেঁচা' সম্বন্ধেও নানা দেশে বহুবিচিত্র লোকবিশ্বাস বিদ্যমান। বাংলার লোকসমাজেও পেঁচা-সংক্রান্ত নানা শুভাশুভ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। পেঁচার আবার রকম-ভেদ আছে। যেমন, 'লক্ষ্মী পেঁচা', 'হুতোম পেঁচা', 'কাল পেঁচা' ইত্যাদি। এদের মধ্যে লক্ষ্মী পেঁচা সর্বত্রই শুভ-সূচক।

শোষণ-ক্লিষ্ট দরিদ্র দেশের দুরবস্থায় ব্যথিত যতীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে,— 'এ দেশকে ফের হাসাতে হলে প্রচুর লক্ষ্মী প্যাঁচা চাই' (বাঁচা চাই : ত্রিযামা), কৌতুকময় ভঙ্গিতে পরিবেশিত হলেও উদ্ধৃত অংশটিতে কবির সুগভীর দেশপ্রীতি-ও উপেক্ষনীয় নয়। আবার সমসাময়িক গ্রাম-বাংলার রিক্ত, দুর্দশাগ্রস্ত রূপটি দেখে জীবনানন্দের আক্ষেপোক্তি—'লক্ষ্মী পেঁচা গান গাবে না কি তার লক্ষ্মীটির তরে' (১ সংখ্যক কবিতা :

রূপসী বাংলা)। এখানেও লক্ষ্মী পেচার লোকবিশ্বাসানুগ প্রয়োগ সুখ-সমৃদ্ধির ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। অনুরূপ সূত্রে 'রূপসী বাংলা' কাব্য-গ্রন্থের একাধিক কবিতায় 'পেঁচা'-সংক্রান্ত এ জাতীয় লোকবিশ্বাস প্রতিফলিত।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী বিষ্ণু দে ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় বণিক শ্রেণীর মানস-আকাঙ্ক্ষা চিত্রণেও পেঁচা-কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাসটির প্রয়োগ করেছেন,—'নব অভিসারে চলেছে রে ভাই, / রাত জেগে পেঁচা ভরেছি খাতাই, / লক্ষ্মী চাই' (জন্মাষ্টমী : পূর্বলেখ ১৯৪২); বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি কবির ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবটি এখানে গোপন থাকে নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'পেঁচা' লোকসাধারণের মানসলোকে অশুভের প্রতীক রূপেও প্রতিভাত। এ সূত্রে একাধিক কবিতায় 'পেঁচা'-র উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন, যুগযন্ত্রণার ভারে অবসন্ন জীবনানন্দ দেখলেন, যখন ক্লান্তি, মৃত্যু পরিপার্শ্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তখনই "পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে / এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে / মাঠের মুখের পরে" (অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি); এ কবিতায় পেঁচা অশুভ তথা মৃত্যুর বার্তাবাহী।

ঘরের চালে পেঁচা বসা লোকসাধারণের কাছে অশুভজনক। জীবনানন্দের কবিতায় গতানুগতিক জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার বর্ণনায় দেখি, মৃত্যুর পূর্বে "খড়ের চালের পরে' শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার, / পুরানো পেঁচার ঘ্রাণ,···"(মৃত্যুর আগে : ঐ)। খড়ের চালে পেঁচার 'ডানা সঞ্চার'-এ মৃত্যুর সংকেত লক্ষ করা যায়।

মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী, সমাজ-সচেতন কবি বিমল চন্দ্র দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রাম-বাংলার বুকে 'লাখ লাখ' মানুষের মৃত্যু দেখে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। গ্রাম বাংলার এ নিদারুণ বিপর্যয়ে শাসক শ্রেণীর নির্বিকার ভূমিকায় তাই কবির ক্ষোভ প্রকাশিত,—'ওঠে কর্কশ ক্রেঙ্কার ধ্বনি কাল-পেচকের ডাক / ধনতান্ত্রিক সভ্যতা তবু শবাসনে নির্বাক' (ধূমাবতী : দ্বিপ্রহর এবং অন্যান্য কবিতা)। 'কাল পেচক' এখানে দুর্ভিক্ষ জনিত বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী।

প্রসঙ্গত, বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে (১৯২৩) এ সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রতিফলন স্মরণযোগ্য। সরস্বতী পূজার দিন নীলকন্ঠ পাখি দেখলে বিদ্যালাভ হয়, —এ লোকবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে হরিহর অপুকে সরস্বতী পূজার দিনই নীলকন্ঠ পাখি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল।

বঙ্গপ্রেমী সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মহিমা-বর্ণনে এ লোকবিশ্বাসের অনুসারী,—'সেই তো রে নীলকন্ঠ পাখি / মুক্তি সুখের বার্তা আনে / ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি' (গান : কুহু ও কেকা)।

বঙ্গদেশের লোকসমাজে 'ঘুঘু' প্রেম ও উর্বরতার প্রতীক। 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থের 'ঘুঘুর ডাক' কবিতায় মোহিতলাল এ লোকবিশ্বাসের প্রয়োগে অপূর্ব রোমান্টিক প্রেমের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন,—'বিধবা স্বপন-সুখে ঘুঘুর ডাকে উলুধ্বনি শোনে'। প্রেমের অভাবজনিত বেদনাও এখানে সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়েছে। কখনো 'ঘুঘুর আলাপ' অতীত প্রেমের স্মারক, —'থেকে থেকে ঘুঘুর আলাপ / কত কথা মনে আনে' (মাছ ধরা : রেখা : যতীন্দ্রমোহন)।

চাতক পাখি সম্বন্ধে লোকসমাজে বহু বিচিত্র 'মিথ' প্রচলিত। লক্ষণীয়, এসব মিথের পেছনে রয়েছে লোকবিশ্বাস ;—চাতক চির তৃষ্ণার্ত। বৃষ্টির জল ছাড়া সে অন্য জল পান করে না। তাই তার ডাক 'ফটিক জল' ধ্বনিরূপে লোকশ্রুতিতে প্রতিধ্বনিত। আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় নানা স্থানে তৃষ্ণার্ত চাতকের এই আবেদন শ্রুতিগম্য।

মুক্ত জীবনের রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষায় করুণানিধানের 'বাসনা',— "মাঝ গঙ্গায় জাল ফেলিব উদাস আদুল গায়ে, / গাঙচিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে / উড়বে ভাঙ্গা পাড়ের বাঁকে, / ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল' মেঘের ছায়ে ছায়ে" (বাসনা : ঝরাফুল)। সত্যেন্দ্রনাথের একাধিক কবিতায় এ লোকবিশ্বাসটির সাক্ষাৎ মেলে। যেমন,-গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের চিত্র-কল্প রচনায়,— 'ফটিক জল'—'ফটিক জল / চাতক ফুকারে সবিষাদ' (আকুল আহ্বান : বেণু ও বীণা)।

বিভিন্ন পশুকে কেন্দ্র করেও লোকসমাজে নানা শুভাশুভ বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। যেমন, বিড়াল সম্বন্ধে লোকসমাজে মিশ্র বিশ্বাস সুপ্রচলিত। 'বিড়াল' হ'ল শিশুর মঙ্গলকারিণী ষষ্ঠী দেবীর বাহন। সুতরাং বিড়াল মারলে ষষ্ঠী দেবী ক্ষুব্ধ হন ; এতে শিশুর অমঙ্গল সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ লোকবিশ্বাসটি পরিহাস সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথের অগ্রনিহত 'ইঁদুরের মকদ্দমা' কবিতাটিতে লভ্য ; সেখানে কবির সতর্কবাণী উচ্চারিত,—'বিড়াল যে মারে বংশ থাকে না তার'। সুপ্রচলিত আর একটি লোকবিশ্বাস,— মৃত্যুর সঙ্গে কালো বিড়ালের গভীর যোগসূত্র বিদ্যমান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎস তাণ্ডবলীলায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যুতে ব্যথিত ও বিচলিত জীবনানন্দের মনে হ'ল—প্রেম, সৌন্দর্য, স্বপ্নচারিতা,

এসবই সুদূর অতীতের বিষয়, তাই সে সব সত্যোপলব্ধির কথা। 'কফিনে জড়ানো মিশরের ম্যমি কালো বিড়ালকে বলে' (মনোবীজ : মহাপৃথিবী)। 'মিশরের ম্যমি' মৃত ও প্রাচীন, তার সঙ্গে কালো বিড়ালের এ যোগ বিড়াল-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসেরই প্রভাব-প্রসূত।

শুভাশুভ লোকবিশ্বাসের আরো কয়েকটি দিকের পরিচয় নেওয়া যাক। ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথির চাঁদ দেখা বাংলার লোকসমাজে নিষিদ্ধ। লোকবিশ্বাস,—ঐদিন চাঁদ দেখলে ব্যক্তির জীবন দুর্ভাগ্য-কবলিত হয়; অহেতুক কলঙ্ক রটে ঐ নির্দিষ্ট দিনের চাঁদ 'নষ্টচন্দ্র' নামে অভিহিত।

যতীন্দ্রনাথের 'মরুমায়া'-র একটি কবিতার নামই 'নষ্টচন্দ্র'। কবিতা-টিতে জগত ও জীবন সম্পর্কে কবির প্রতিবাদী চেতনা চাঁদ-সম্পর্কিত উক্ত লোকবিশ্বাসটির আবরণে প্রতিভাত। কবিতাটির প্রথমাংশে সাধারণ মানুষের 'নষ্ট-চন্দ্র' দর্শনে অনিচ্ছার মনোভাব জ্ঞাপিত। কবি কিন্তু নাস্তিকতাবশে 'অপকলঙ্কের—সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করে লোক রীতি অগ্রাহ্য করলেন। শুরু হ'ল কবির বিড়ম্বনা, 'তারপর থেকে রটে বিধিমতে অপকলঙ্ক মোর'। পরিশেষে, কবির মার্জনা ভিক্ষা,—'শপথ তোমার, এ জীবনে আর চাঁদে চাহিব না ভাই / নাস্তিক হয়ে নিস্তার ছিল, বুঝেছি অসংশয়, / নশচন্দ্রের দর্শন কভু ফসকে যাবার নয়'। মনে হতে পারে, দুর্ভাগ্য পীড়িত কবি ঐ লোকবিশ্বাসের সমর্থক। কিন্তু তা সত্য নয়। সামাজিক নানা অপপ্রচারের প্রতি কবির ক্ষোভ, লোকবিশ্বাসটির প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে অননুভূত থাকে নি।

লোকসমাজে ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাসী। কোনো কোনো কবিতায় লোকবিশ্বাস-সম্ভূত 'ভূত-প্রেতের' উল্লেখও মেলে। সমকালীন যুগজীবনের বিকৃত, নিঃস্ব রূপ পরিস্ফুটনে জীবনানন্দের 'লঘু মুহূর্ত' (সাতটি তারার তিমির) কবিতাটিতে 'শাকচুন্নী'র আবির্ভাব ঘটে,'— এইখানে চায়ের আমেজে নামায়েছে তারা এক শাকচুন্নীকে', এ যুগের বিধ্বস্ত, বিকৃত রূপটি এ কবিতায় 'শাকচুন্নী'র রূপকাশ্রয়ে বিধৃত।

লোক সমাজের বিশ্বাস,—কখনো কখনো গভীর রাতে প্রেতাত্মার অমোঘ আহ্বানে কোনো কোনো মানুষ প্রায় অচেতন অবস্থায় ঘর ছাড়ে ও অপঘাতে মারা যায়। একে 'নিশির ডাক' বলে। 'নিশির ডাকে'র আকর্ষণ নিয়তির মতোই অপ্রতিরোধ্য। তাই সে ডাকে সাড়া দেওয়া মৃত্যুরই সামিল।

কোনো কোনো কবিতায় এ লোকবিশ্বাসটিও প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যেমন, মোহিতলালের 'শেষ শিক্ষা' (স্মরগরল) কবিতায় প্রেমের অনিবার্য আকর্ষণের ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে 'নিশির ডাক'-এর প্রয়োগ দেখা যায়। প্রেমের স্বরূপ-সন্ধান করতে গিয়ে কবির মনে হয়েছে,—'প্রেম কি নিশির ডাক— গাঢ় ঘুমে গূঢ় জাগরণ'।

আবার 'নিশির ডাকে'র লোকবিশ্বাসানুসারী প্রয়োগও লভ্য। বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দেখেছেন, "যেন সব নিশি ডাকে চলে গেছে নগরীকে শূন্য ক'রে দিয়ে" (একটি কবিতা : সাতটি তারার তিমির)। সমগ্র বিশ্বের বিধ্বস্ত রূপটি এখানে কবির আন্তর্জাতিক চেতনায় ধরা পড়েছে।

'বৈতরণী' স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবাহিত পুরাণ-কল্পিত নদী। লোকমানসে এ নদী মৃত্যুর প্রতীক। একাধিক কবিতায় 'বৈতরণী'র ব্যবহার লোকবিশ্বাসানুগ। বিশেষত, বিষ্ণু দে-র কবিতায় 'বৈতরণী'র বহুল ব্যবহার দেখা যায়। 'চোরাবালির' (১৯৩৭) 'ক্রেসিডা' কবিতায় 'কালো কল্কির দিন'-এ কবির আশঙ্কা,—'ভ্রান্তি আমার নিয়ে যায় যদি বৈতরণীর পার, / ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেব উপহার'। 'বৈতরণী' এখানে লৌকিক বিশ্বাসাশ্রয়ী মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী। আবার সুবিখ্যাত 'ঘোড় সওয়ার' ('চোরাবালি') কবিতায় 'বৈতরণী' মুক্তির ইঙ্গিতবাহী,—কবির আকাঙ্খিত বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার'-এর শৌর্য বীর্য পরিস্ফুটনে 'বৈতরণী'র উল্লেখ,—'সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে, / নিঃশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে, / তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার'।

৩। (২) লোকসংস্কার : লোকবিশ্বাস যখন ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখনই তাকে লোকসংস্কার বলে। লোকজীবনে তো বটেই, নগর জীবনেও এর আধিপত্য কম নয়। স্বভাবতই বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রটিও সম্পূর্ণত লোকসংস্কার-বর্জিত থাকে নি। রবীন্দ্রনাথের 'ছড়ার ছবি'-র 'দেশান্তরী' কবিতায় দেখি, 'আকালের দিনে' পুত্র গ্রাম ছেড়ে কাজের সন্ধানে যাত্রা করেছে,—'দূর শহরে একটা কিছু যাবেই যাবে জুটে, / এই আশাতেই লগ্ন দেখে ভোরবেলাতে উঠে / দুর্গা বলে বুক বেঁধে সে চলল ভাগ্য-জয়ে— / মা ডাকেন পিছুর ডাকে অমঙ্গলের ভয়ে'। উদ্ধৃতাংশটিতে তিনটি লোক-সংস্কার-এর উল্লেখ মেলে। প্রথমত, লগ্ন দেখে যাত্রা করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত যাত্রাকালে মা ডাকলে অবশ্য অমঙ্গল হয় না।

তবু 'দুর্গা' বলে যাত্রারম্ভ করা-ও লোকসংস্কারের পর্যায়ভুক্ত; তৃতীয়ত, যাত্রা পাছে অশুভ ও ব্যর্থ হয়, সেই 'অমঙ্গলের' ভয়ে মা পিছু ডাকেন নি। লক্ষণীয়, এই তিনটি লোক-সংস্কারের মূলে একটিই উদ্দেশ্য বিদ্যমান তা হ'ল, দেশান্তর যাত্রা শুভ বা সফল করে তোলা। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, লোকসংস্কারের প্রভাব লোকসাধারণের মনের গহন প্রদেশে অবস্থিত বলেই 'আকালের দিনে' গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়া সম্ভব হলেও গ্রামীণ মানুষের পক্ষে দীর্ঘকালের ঐতিহ্য-পুষ্ট লোকসংস্কারগুলি অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি।

যাত্রা-সম্পর্কিত অনুরূপ লোকসংস্কার যতীন্দ্রমোহনের 'শুভযাত্রা' ('লেখা') কবিতাতেও লভ্য। সেখানে নৌকা যাত্রার পূর্বে 'মাঝিগণ দিল সাড়া দুর্গা দুর্গা বলি'-এ চিত্র বাস্তবসম্মত। জসীমউদ্দিনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যে বৃষ্টি-কামনায় গ্রাম্য রমণীর 'মানত' লোকসংস্কারেরই অন্তর্গত। 'দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়'—এ আশায় গ্রাম্য রমণীর প্রতিশ্রুতি,—'নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি' / বৃষ্টিকে জীবন্ত সত্তারূপে কল্পনা করে (Animan বা সর্বপ্রাণবাদের প্রভাবজাত) তাকে তুষ্ট করার প্রয়াসটি বাস্তবানুগ।

আবার 'নৌকাযাত্রা'-কে নিরাপদ করে তুলতে কবির 'সোজনবাদিয়ার ঘাটে' কাব্যের নায়িকা দুলীকে 'সিঁদুর-তেল,' 'দূর্বা ধান' ও 'গুয়াপান' সহযোগে নৌকা বরণ করতে দেখা যায়। নৌকাযাত্রার পূর্বে এ 'নৌকাবরণ' লোকঐতিহ্য-প্রসূত-সংস্কার বিশেষ।

ভূতের উৎপাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য 'রাম নাম' উচ্চারণের লোকসংস্কারটিও কোনো কোনো কবিতায় গৃহীত। কাহিনীমূলক একটি কবিতায় দেখি, গাছের মধ্য থেকে শিশুর কান্না শুনে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত; কাহিনীর নায়ক জোলার ছেলে এ রহস্য উদ্ঘাটনে এগিয়ে গেলে উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে 'রামনাম করতে লাগল কেউ কেউ——' (মালোর মেয়ে : জাগরণী : যতীন্দ্রমোহন)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অশুভ আত্মার হাত থেকে জোলার ছেলেকে রক্ষা করতেই এ 'রামনাম' উচ্চারণ।

যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেই লোকসাধারণ দেবতার রোষ-উদ্ভূত বলে মনে করে। তাই কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে সে প্রথমে দেবতার সন্তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এ কারণেই ভূমিকম্প হলেই ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে ওঠে। বলা বাহুল্য, শঙ্খধ্বনি শান্তির সূচক। সুকান্ত-র কবিতায় এ সংস্কারটি নবতর মাত্রা-সংযোজনে সার্থক

হয়ে উঠেছে। স্বদেশ-চেতনার আলোকে কবি দেখলেন, সত্যের অপমৃত্যু ও মিথ্যার অবিসংবাদিত আধিপত্য। ক্রুদ্ধ কবি-মানস উপলব্ধি করেছে যে, সকলের অজ্ঞাতেই বৃহত্তর আন্দোলনের পটভূমিটি প্রস্তুতপ্রায়। আসন্ন এ বিপ্লবে 'মিথ্যার দায়ভাগী'দের পতন অনিবার্য, কারণ 'কখনো কেউ কি ভূমিকম্পের আগে / হাতে শাঁখ নেয়—' (বিক্ষোভ : ঘুম নেই), অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আসন্ন এমন বিপ্লব সম্বন্ধে সচেতন নয় বলে কবির বিশ্বাস।

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের অভাব বোঝাতে লোকসমাজে নেতিবাচক শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। সেক্ষেত্রে 'বাড়ন্ত' বলার সংস্কারই সুপ্রচলিত। এটি সুভাষণ পর্যায়ভুক্ত। একটি কবিতায় দেখি, মজুতদারের কাছে নিরন্ন এক ব্যক্তি চাল ধার করতে চেয়েছে এই বলে,--'ঘরে আমার চাল বাড়ন্ত / তোমার কাছে তাই, / এলাম ছুটে, আমায় কিছু / চাল ধার দাও ভাই' (খাদ্য সমস্যার সমাধান : মিঠেকড়া : সুকান্ত)। বাস্তবানুগ সংলাপ-সৃষ্টিতে লোকসংস্কারটির যে সুপ্রযুক্ত তাতে সন্দেহ নেই।

৩। (৩) যাদুবিশ্বাস ও যাদুসংস্কার : বিশ্বের সবদেশের লোকসমাজেই যাদুবিদ্যার অহবিস্তর প্রভাব অনস্বীকার্য। যাদুবিদ্যা-প্রসূত বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে সাধারণ লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার বহু ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত। যাদুবিদ্যার জগতটি গভীর রহস্যময় ও রোমহর্ষক। স্বপ্রকৃত পদ্ধতিতে অভীষ্ট লাভের প্রয়াস যাদুবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যাদু-নির্ভর বহু বিচিত্র বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে লোকসাধারণের ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সক্রিয়। লোকসমাজে যাদুবিশ্বাস ও যাদুসংস্কারের সর্বাতিশয়ী প্রভাব আলোচ্য কালপর্বের বাংলা কাব্য-কবিতাতেও প্রসারিত।

রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'-র ভূমিকা কবিতাটিতে গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির পরিচায়নে 'ভোজবাজি' তথা যাদুবিদ্যার কুহক মায়ার দিকটি নির্দেশ করেছেন।

'বশীকরণ' সংক্রামক যাদুবিদ্যার পর্যায়ভুক্ত। বিচিত্র মন্ত্র ও বস্তু সহযোগে এই ধরনের যাদুক্রিয়াবলে অন্য ব্যক্তিকে স্ব-বশে আনা সম্ভব—এ যাদুবিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত। করুণানিধানের রোমান্টিক প্রেমচেতনায় মনে হয়েছে, তাঁর মানসপ্রিয়ার অপূর্ব প্রেমবলে তিনি বশীভূত; এ যেন যাদুকরীর বশীকরণ মন্ত্রের অনিবার্য ফল,--'যাদুকরীর ফুলের তোড়া মন্দবিষে ভরা, / বশীকরণ মন্ত্রগীতি সর্বদুখ হরা' (মোহিনী :

শতনরী : ১৯৪৮), প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তি এখানে 'বশীকরণ মন্ত্রের' উল্লেখে প্রকাশিত।

মোহিতলালের একটি কবিতায় 'কৃষ্ণ-যাদু' বা Black Magic-এর প্রভাব লক্ষণীয়। সেখানে বেদুইনেরা স্বীকার করেছে, 'শত্রু-নিপাত না করে আমরা ভিজাই না চুল / খুলি না গিরা' (বেদুইন : স্বপনপসারী)। আগেই 'চুল' ভিজিয়ে ফেললে বা 'গিরা' খুললে 'শত্রু নিপাত' সম্ভব হবে না—এ বিশ্বাস ও সংস্কার স্পষ্টতই যাদু লক্ষণাক্রান্ত।

বিষ্ণু দে সমকালীন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেরণাদায়ী প্রেমের অভাব উপলব্ধি করে দেখলেন, নাগরিক সমাজের অন্তঃসারশূন্য বাধ্যতামূলক গতানুগতিক দিনযাপনই এর কারণ। নগর জীবনের আপাত-ঐশ্বর্যময়তা তাঁর কাছে যাদুবিদ্যার মায়াময় ইন্দ্রজালের মত এক মস্ত প্রহসন রূপে প্রতিভাত। তাই তাঁর আক্ষেপ, 'ভরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে, / গ্রামাফোন সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে বিচিত্র সজ্জায়'। (শিখণ্ডীর গান : কথকতা : চোরাবালি)। আবার যাদুবিদ্যার নানা অনুষঙ্গের রূপকাশ্রয়ে এ যুগের সামাজিক বিশৃঙ্খলার চিত্র পরিস্ফুটনের প্রয়াস বিমলচন্দ্রের 'মনন সাগর দোলা' কবিতাটিতে পরিলক্ষিত হয়। কবির মনে হয়েছে, যাদুবিদ্যার প্রকোপে এ সমাজের সব কিছু 'লণ্ডভণ্ড' হয়ে গেছে। এ সূত্রে কবিতাটিতে 'ভানুমতী', 'হাড়ের ভেল্কি' প্রভৃতি যাদুবিদ্যার অনুষঙ্গগুলির সাক্ষাৎ লভ্য।

৩। (৪) লোকাচার-লোকানুষ্ঠান : লোকসমাজে সুপ্রচলিত বহু বিচিত্র প্রথা, আচার, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। লোকসমাজে সুপ্রচলিত এসব আচার-অনুষ্ঠানকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়,—(১) জীবনবৃত্ত-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান ও (২) বর্ষবৃত্ত-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান।

৩। (৪) [১] **জীবনবৃত্ত-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান :** শিশুর জন্মের পর-মুহূর্ত থেকেই তাকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়াস সব সমাজেই লক্ষণীয়। লোকসমাজও নানা বিচিত্র বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে শিশুর মঙ্গলার্থে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। 'আঁতুর বন্ধন' এজাতীয় একটি লোকাচার। সাধারণত বাসগৃহ থেকে স্বতন্ত্র একটি গৃহে তার সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে শিশুর জননী কয়েকটি দিন বাস করে। একেই 'আঁতুর বন্ধন' বলে, আর ঐ গৃহটি আঁতুরঘর' বা 'সূতিকাগৃহ' নামে পরিচিত হয়। বাসগৃহ থেকে সূতিকাগৃহের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার লোকাচারটি

যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। পঞ্চাশোত্তীর্ণ কবি 'সীমাহারা ঐ আকাশে মুক্ত হাওয়ার' মাঝে প্রাণের গভীর সুর উপলব্ধি করে সংসার-মুক্তি কামনা করেছেন। এর ফলে সংসার তাঁর কাছে বাসগৃহের ও সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্ত জীবন সুতিকা-গৃহের রূপকে প্রতিভাত। সংসারে আবদ্ধ কবি তাই মুক্ত জীবনের সঙ্গে সংসারের দূরত্ব পরিস্ফুটনে লিখলেন, 'সুতিকা ঘর রয় না যেমন গৃহবাসের ঘরে' (পঞ্চাশোর্ধে : মহাভারতী), তেমনি তিনিও সংসার ত্যাগ করে বনবাসে গিয়ে শেষের পরিচয় লাভ করবেন।

ব্যক্তি জীবনে 'বিবাহ' একটি নূতন পর্যায়ের সূচক। সব দেশের লোকসমাজেই বিবাহ-প্রথা-সংশ্লিষ্ট বহু বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত। আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে এসব লোকাচারে লোকসাধারণের সুদীর্ঘকালের আশা-আকাঙ্খা আবেগ-অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যাবে। হিন্দু বিবাহ প্রথা-সংশ্লিষ্ট অন্যতম প্রধান স্ত্রী-আচার 'গাত্রহরিদ্রা' বা 'গায়ে হলুদ' সম্বন্ধেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য। মোহিতলাল তাঁর 'বিস্মরণী'র 'শিউলির বিয়ে' কবিতায় শিউলি ফুলের বর্ণনায় এ লোকাচারটি গ্রহণ করেছেন। শিউলি ফুলের পীতবর্ণ বৃন্তটি দেখে সৌন্দর্যপিপাসু কবির মনে হয়েছে, 'বিয়ের ফুল ফোটার আগেই' শিউলির যেন 'গায়ে হলুদ' হয়েছে। বলা বাহুল্য, শিউলি ফুল প্রস্ফুটনের রূপকার্থে 'বিয়ের ফুল ফোটা'-র লোক-বিশ্বাসটিও এখানে প্রযুক্ত।

করুণানিধানের 'শেষ বাসরে' ('ঝরাফুল') কবিতায় রোমান্টিক প্রেমের আবহনির্মাণে বিবাহ-সংক্রান্ত বহুবিধ লোকাচারের প্রয়োগ মেলে। কবিতাটিতে দাম্পত্য-প্রেমের মাধুর্য পরিস্ফুটনে কবি বিবাহ দিনের স্মৃতি-চারণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'মধু-পরিহাস-রস-উচ্ছল বাসর রাতি'-ই শুধু নয়, বিবাহ-সংশ্লিষ্ট আরও নানা লোকাচার-লোকানুষ্ঠান উল্লিখিত। যেমন,—'মনে পড়ে সেই 'কনকাঞ্জলি' পিতার হাতে, কিংবা 'পা-দুটি ডুবায়ে দুধে-আলতায় বধূর বেশে' ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য, কনকাঞ্জলি হল, জামাতার হাতে পিতার কন্যা দানের লোকাচার বিশেষ ; এছাড়া স্বামীগৃহে প্রবেশের পূর্বে নববধূর 'দুধে আলতায়' পা ডুবানোর লোকা-চারটিও সুপ্রচলিত।

বিবাহের রাত্রে বর-বধূসহ রমণীগণের আনন্দোৎসবে রাত্রি জাগরণের অনুষ্ঠান লোকসমাজে 'বাসর' নামে সুপরিচিত। কখনো, জ্যোৎস্না-লোকিত রাত্রিকে মোহিতলালের মনে হয়, 'বিবাহ দেখিনি দেখিনু বাসর

বসেছে ঘর / গাঁটছড়া বাঁধা বধূর মুখখানি কি সুন্দর' (চাঁদের বাসর : স্মরগরল) লক্ষণীয়, শুধু বাসর-ই নয়, প্রসঙ্গত বরবধূর গাঁটছড়া বাঁধার লোকাচারটিও এখানে অনুসৃত। লোকাচারের রূপকাবরণে জ্যোৎস্নার এ অপূর্ব শোভা বর্ণনায় কবির রোমান্টিক মানসটিও প্রতিফলিত। 'শবসঙ্গীত' (বিস্মরণী) কবিতাটিতে দার্শনিক দৃষ্টিতে মৃত্যুকে কবি জীবনের সঙ্গে মরণের বিবাহ রূপে কল্পনা করেছেন। এ সূত্রেও এ কবিতায় 'বাসর'-এর উল্লেখ মেলে।

সমকালের বন্ধ্যা, রিক্ত, হতাশ্বাস রূপচিত্রণে বিষ্ণু দের কবিতাপংক্তিও স্মরণ করা যেতে পারে,—'চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া / এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া' (ঘোড় সওয়ার : চোরাবালি)। সৌন্দর্যময় রোমান্টিক কল্পলোকের প্রতীকরূপে বাসরের এই প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। এছাড়া বিবাহ-সংক্রান্ত নানা লোকাচারের উল্লেখ অন্যত্রও লভ্য। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'ছড়া-র ৬ সংখ্যক কবিতায় 'গায়ে হলুদ' বা সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল' কাব্যগ্রন্থের 'কুঞ্জকেলি' কবিতায় 'বাসর' বর্ণনা সূত্রে উল্লিখিত।

জীবনবৃত্তের শেষ পর্যায় মৃত্যু। মৃতের সৎকার ও মৃতের আত্মার শান্তিকামনাদিঅবলম্বনে পৃথিবীর সব দেশের লোকসমাজেই নানাবিধ প্রথা-আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত। বাংলার লোকসমাজেও মৃত্যু-কেন্দ্রিক বহুবিধ লোক-প্রথা আচার-আচরণাদি সুদীর্ঘকাল থেকেই পালিত হয়ে আসছে; যার প্রভাব এসময়ের কাব্য-কবিতায় প্রতিফলিত। লোকসমাজে প্রচলিত এসব মৃত্যু-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানাদি লোকসমাজের ধর্মানুগত্য, যাদু-বিশ্বাস ও যাদুসংস্কারের অনতিক্রম্য প্রভাব-পুষ্ট।

স্বামীর মৃত্যু হলে হিন্দু রমণীদের যাবতীয় আয়তি-চিহ্ন পরিত্যাগ করার রীতি বাংলার লোকসমাজেই শুধু নয়, নগর সমাজেও দেখা যায়। যতীন্দ্র-নাথের 'সদ্যবিধবা' ('ত্রিযামা') কবিতায় এ লোকাচারটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। সমকালের কবিদের গতানুগতিক কাব্যচর্চায় বীতশ্রদ্ধ যতীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গোক্তি,—'সদ্য-বিধবা কবিতার আজ / শাঁখা ভাঙা উৎসব' প্রতিভাহীন কবিদের কাব্য-চর্চার রূপকার্থে 'সদ্য বিধবা'র 'শাঁখা ভাঙা'-র চিত্রকল্প-রচনায় কবির শিল্প-দক্ষতা অনস্বীকার্য।

আবার প্রচলিত অর্থেও যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় অনুরূপ লোকা-চারের দৃষ্টান্ত লভ্য। তাঁর একটি কাহিনীধর্মী কবিতায় দেখি, দারিদ্র্য-গ্রস্ত পিতা 'পিলেবোঝাই করা শ্মশান মুখো' বরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছে। যার অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ,—'দুটি মাসও না ফুরাতেই

তাই, / সদ্য লোহা ভাঙতে হল সিঁথার সিঁদুর মুছতে হ'ল হায়' (গৌরী : বন্ধুর দান)। অর্থাৎ গৌরীর স্বামীর মৃত্যু হল। আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার চিত্র এখানে লভ্য। দরিদ্রতা হেতু এমন অজস্র গৌরীকে অকাল-বৈধব্য বরণ করতে হয়--এ ইঙ্গিত কবিতাটিতে পরিস্ফুট। শুধু তাই নয়, এককালে বাঙালী-সমাজে প্রচলিত বাল্য বিবাহ প্রথার উল্লেখও এ কবিতায় পাওয়া যায়। 'আট বছরের মেয়ে' গৌরীর বিবাহ যার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'সহমরণ' (বেণু ও বীণা) কবিতাটি সবিশেষ স্মরণযোগ্য। এক সময় স্বামীর মৃত্যু হলে মৃত স্বামীর সঙ্গে সদ্য বিধবাকে অনুমৃতা হতে হত। এর মূলে ছিল স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা। নিষ্ঠুর অমানবিক এই প্রথার বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ কবি 'সহমরণ'-এর যে করুণ চিত্র রচনা করেছেন, তাতে শুধু প্রথা নয়, নানা লোকাচারও বিদ্যমান। যেমন, 'গুঁড়িয়ে শাঁখা সবাই মিলে / চিতায় মোরে বসিয়ে দিলে / বাজল কতক শাঁখ'। যে রমণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তার 'শাঁখা' গুঁড়িয়ে দেওয়া রক্ষণশীল সমাজের পাশবিক নিষ্ঠুরতার পরিচয়বাহী।

সধবা অবস্থায় মৃত্যু হলে মৃতা রমণীকে যাবতীয় আয়তি চিহ্নে সাজানোর লোকাচার বাঙালী হিন্দু সমাজে প্রচলিত। যতীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় সাধারণ অর্থেই লোকাচারটি পালিত হয়েছে,--বিবাহের দীর্ঘ ষাট বছর পরে অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে 'রাঙা শাড়ী সিন্দুর আলতায়- / চৌদোলে গেল সত্তরা'। (বিচ্ছেদ : ত্রিযামা)।

৩। (৪) [২] বর্ষবৃত্ত-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান : বছরের বিভিন্ন সময় বাংলার লোকসমাজে নানা উৎসব-অনুষ্ঠান পালিত হয়। এসব উৎসব-অনুষ্ঠানের উৎসে রয়েছে মূলত লোকসমাজের ধর্মানুগত্য। এদের সঙ্গে যাদুবিশ্বাস ও যাদুসংস্কারেরও গভীর যোগ।

আলোচ্য পর্বের কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্য-ভুক্ত উৎসব অনুষ্ঠানাদির প্রভাব-প্রতিফলন বিরল-দৃষ্ট নয়। যেমন আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠেয় লোক-উৎসব 'রথযাত্রা'-কে কেন্দ্র করে কুমুদরঞ্জনের 'চণ্ডালী' (উজানি) কবিতায় একনিষ্ঠ ভক্তির অমিত শক্তি ও কবির মানবিকতাবোধ প্রকাশিত। সেখানে ভক্তের দল রথ টেনে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলেও এক বৃদ্ধা চণ্ডালীর স্পর্শে অনড় রথ গতিলাভ করেছে। বলা বাহুল্য, একনিষ্ঠ ভক্তির বলেই চণ্ডালীর পক্ষে এ অসম্ভব কাজ সম্ভবপর হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা যেখানে ব্যর্থ সেখানে 'চণ্ডালী'-কে জয় করে কবি উদার মানবিকতারই প্রতিষ্ঠা

করেছেন। অন্যত্র রথের দিনে পুরীর জগন্নাথদেব দর্শনের জন্য সাধারণ মানুষের তীব্র ব্যাকুলতার রূপকাবরণে দাম্পত্য জীবনে স্বামীর সঙ্গে নারীর মিলনাকাঙ্ক্ষার রূপটি সুপরিস্ফুট; কবির 'একতারা' কাব্যগ্রন্থের 'উৎকন্ঠিতা' কবিতায় তিন বছর বাদে কুলীন স্বামীর সঙ্গে মিলনের আশায় স্ত্রী হয়েছে 'উৎকন্ঠিতা'। মিলন-পিয়াসী বিরহী নারীর এ ব্যাকুলতা দেখে কবির মনে হল, "...হয় না আধ ব্যাকুলতার হেরিতে জগন্নাথে / 'পুরীর' পথে রথেরো দিনো কেহ"।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় 'রথের দিন'-টিকে কেন্দ্র করে শিশুর নিজেকে বড় বলে ভাবার মনস্তত্ত্বটি ভাষা-রূপ লাভ করেছে। সে প্রমাণ করতে চায় যে, সে আর ছোটটি নেই, তাই তার ঘোষণা,—'রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়। একলা যাব, করব না তো ভয়'—(ছোটোবড়ো : শিশু)।

যতীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে জগত-জীবনের নিরন্তর স্রোতোধারায় 'রথ-যাত্রা' প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত। 'রথযাত্রা'-কে কেন্দ্র করে মানবজাতির উদ্দেশ্যে কবির মহামিলনের উদাত্ত আহ্বান উচ্চারিত,--বিশ্ব কাঁপায়ে চলেছে রে আজ বিশ্বরাজার রথ / ধনী গৃহস্থ শিশু বয়স্থ--আয় সবে ছুটে আয়— / জগৎনাথের রথের যাত্রা তোরি দ্বার দিয়ে যায়'। (রথযাত্রা: নাগকেশর)। এছাড়া করুণানিধানের 'বেণু' (ঝরাফুল) কবিতায় 'রথ' উপলক্ষে মেলার উল্লেখ লভ্য।

লোকউৎসব লোকসমাজের সংহতির প্রতীক। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আয়োজিত 'রাখী বন্ধন' উৎসবে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এ উৎসব সমগ্র ভারতবর্ষেই পালিত হয়। পারস্পরিক রাখীবন্ধনের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্কটি মধুর ও গভীরতর করে তোলাই এ উৎসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। রাখী-বন্ধনের এই 'রাখী' কখনো কবিতায় রোমান্টিক প্রেমের স্মারক। কবিপ্রিয়ার কাছে কবির প্রশ্ন,--'রাখীর রাঙা সুতো / বাঁধন দিয়েছিনু হাতে, / আজ কি আছে সেটি সাথে' (৪০ সংখ্যক কবিতা : উৎসর্গ / ১৯১৪ : রবীন্দ্রনাথ)। উল্লেখযোগ্য কবির স্ত্রী-বিয়োগের বেদনা এখানে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় কাব্যরূপ লাভ করেছে।

কার্তিক মাসের প্রতি সন্ধ্যায় ঘরের চালে 'আকাশ প্রদীপ' জ্বালিয়ে রাখার লোকাচারটি বাংলায় সুপ্রচলিত। লোকবিশ্বাস,--এই আকাশ প্রদীপের আলো মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার স্বর্গলাভে সহায়ক। রবীন্দ্র-নাথের 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থটির নামকরণে এই লোকাচারটি গৃহীত। এ কাব্যের মূল সুর অনুধাবনেও এই নামকরণে লোকঐতিহ্যের প্রভাব

অনুভূত হয়। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় কবি বিগত দিনের স্বপ্ন-কল্পনার পুনরাগমনের বাসনা প্রকাশ করেছেন।

মৃত আত্মার শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো লোকসমাজে জলে জ্বলন্ত প্রদীপ ভাসিয়ে দেবার লোকাচার প্রচলিত। কবির 'ছড়ার ছবি'র 'আকাশ প্রদীপ' কবিতাটিতে এ লোকাচারটি প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সেখানে এক মাতৃহারা বালিকা তার মৃতা জননীর মর্তে প্রত্যাবর্তনের আশায়,--'আলোর নৌকায় ভাসিয়ে দিল আকাশ পানে চেয়ে, / মা যে তাহার স্বর্গে গেছে এই কথা সে জানে / ওই প্রদীপের খেয়া বেয়ে আসবে ঘরের পানে'। উল্লেখযোগ্য, লোকাচারটি অবলম্বনে এ কবিতায় মাতৃ-বিয়োগের করুণ মূর্ছনা সৃষ্ট।

'নবান্ন' বাংলার লোকসমাজে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব। নতুন ফসলের আনন্দে কৃষিজীবী মানুষের প্রাণের স্ফূর্তি এ উৎসবকে আনন্দ-মুখর করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, 'নবান্ন' একটি আন্তর্জাতিক উৎসব। পৃথিবীর সব দেশেরই কৃষক সমাজ এ জাতীয় উৎসব ভিন্ন নামে, ভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করে থাকে। রাশিয়ার 'রাদুনিৎসা', আমেরিকার 'থ্যাংকস্ গিভিং' ইত্যাদি লোকউৎসব তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অগ্রহায়ণ মাসে বাংলার লোকসমাজে 'নবান্ন' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতার নানা স্থানে নবান্ন উৎসবের বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে যতীন্দ্রনাথ প্রতারিত, লাঞ্ছিত, শোষিত মানুষজনের অসহায়তা ও বেদনা পরিস্ফুট করেছেন। চারপাশে যখন 'ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রাণে শুভ নবান্ন আজ, / পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব বন্ধ মাঠের কাজ' (নবান্ন : মরুমায়া), তখন কবি নিদারুণ প্রতারিত হয়ে নিরানন্দে কালযাপন করেন। কারণ, উৎসবের পূর্বরাতে তাঁর ক্ষেতের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সুদীর্ঘকালের কঠোর শ্রম হয়েছে ব্যর্থ। ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলার অক্ষমতায় কবির দীর্ঘশ্বাসে গ্রামবাংলার লাঞ্ছিত, প্রতারিত, শোষিত দরিদ্র কৃষককুলের চিরকালের-বেদনা বিধৃত। 'নবান্ন' উৎসব অবলম্বনে কবি যেন এই বেদনারই বাণীরূপ দান করেছেন।

বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা, দেশে দুর্ভিক্ষ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ইত্যাদি বিপর্যয়ে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু দের কবি মানসকেও আলোড়িত করেছে। বিশ্বের এই বিপর্যয়কে কবি যুগের ফসলের প্রতীকে গ্রহণ করলেন,--'শুনেছি অমানা মন্দ, তবু তো সে

অমান্য উৎসবে / আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল, পেনসনের ঘর ! / চাষীরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে। / তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু মন্বন্তর। ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।' (আইসায়ার খেদ : সন্দীপের চর)।

সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এ লোক-উৎসবটি শ্রেণীহীন শোষণ-মুক্ত সমাজের প্রতীকে পরিণত। কবির বিশ্বাস, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনেই সেই সমাজ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব, আর সে আন্দোলনের দিনও সমাগত। তাই 'মাঠে ক্লান্তি নেই, অসংখ্য লাঙল। নবান্নকে ডাকে।' (স্বাক্ষর : চিরকুট)।

পরাধীন দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি উপলব্ধি করে সাম্যবাদী কবি সুকান্ত ধনতন্ত্রের শোষণ-ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করলেন। তিনি দেখলেন, দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করেই ধনিক শ্রেণীর পরিপুষ্টি, আনন্দোল্লাস। নবান্নের রূপকাবরণে আর্থ-সামাজিক এ চিত্রটি শিল্পরূপ লাভ করেছে, কবির খেদোক্তি,—'কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে' (খবর : ছাড়পত্র) দরিদ্র জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতিই এখানে প্রকাশিত। আবার 'এই নবান্নে' (ঐ) কবিতায় বৃহত্তর মুক্তি আন্দোলনের ইঙ্গিত দানে 'নবান্নের' প্রয়োগ লক্ষণীয়। বিগত আন্দোলনের ব্যর্থতায় কবি আশাহত হন নি ; কিন্তু সে আন্দোলনের স্মৃতি তাঁর অন্তরে নিত্য জাগরূক। তাই যখন 'এবার নতুন জোরালো বাতাসে / জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে', তখন তাঁর অন্তরে প্রশ্ন জাগে,—'এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ'—'প্রতারিত' অর্থে এখানে দুর্ভিক্ষ-কবলিত গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষদের কথাই বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জীবনানন্দের 'অবসরের গান' (ধূসর পাণ্ডুলিপি) কবিতাটি মনে পড়ে। এ কবিতায় উল্লিখিত 'হেমন্তের উৎসব' নবান্নেরই ইঙ্গিত-বাহী। চৈত্র শেষের 'গাজন' উৎসব বাংলার লোকসমাজে সুপরিচিত। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় 'গাজন' একাধিক স্থানে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। 'মরীচিকা'-র 'শিবের গাজন' কবিতাটিতে শিবের রুদ্রমূর্তির রূপকাশ্রয়ে জগত ও জীবনের চিরন্তন অগ্নি জ্বালার ইঙ্গিত লভ্য। 'গাজন' উৎসবের নানা অনুষঙ্গও এ প্রসঙ্গে কবিতাটিতে উল্লিখিত। যেমন,—'আগুন জ্বালিয়ে সন্ন্যাসী যবে / ওই 'ফুল' খেলে ব্যোম ব্যোম রবে / পিঠ মোড়া বাঁধা খায় ওরা বুঝি / চড়ক পাক ! / থেকে থেকে বাজে ঝোঁকে ঝোঁকে / গাজুনে ঢাক'। অন্যত্র, 'ভাঙা-গড়া' (ত্রিযামা) কবিতায়

শিবের দুরন্ত রুদ্রমূর্তির অন্তরে অমিত শক্তির সন্ধান লাভ করে যতীন্দ্রনাথ তাঁকে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণে আহ্বান জানিয়েছেন। তাই শিবের প্রতি তাঁর প্রার্থনা,—'বহুদিন গত চৈতী গাজন, / মেঘে-মাঠে আজ অম্বু-বাচন, / থামাও তোমার পাগুলে নাচন / বেঁধে নাও জটাজুট'। 'গাজন' এ স্থানে আবেগময় উন্মত্ত ভাবের ইঙ্গিতবাহী।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় 'গাজন' উৎসবের 'কাঁটাঝাপে'র সন্ধান মেলে। সেখানে সন্ন্যাসীর প্রতি কবির উৎসাহ বাণী উচ্চারিত, 'মহেশ্বরে স্মরণ করে ঝাঁপ দিয়ে পড় কাঁটার কোলে' (কাঁটা ঝাঁপ : কুহু ও কেকা)।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি পরিস্ফুটনে সত্যেন্দ্রনাথ সত্যপীরের প্রসঙ্গ এনেছেন। 'সত্যপীরের প্রচার প্রথমে / মোদের বঙ্গভূমি' (ফুলশিরণি : ঐ)—এ ঘোষণায় অবশ্য বঙ্গভূমির মহিমা কীর্তনও লক্ষণীয়।

এছাড়া আলোচ্য কাব্য-কবিতায় নিছক বর্ণনাসূত্রে 'ঘেটেরা পুজা' (ইঁদুরের-মকদ্দমা : সত্যেন্দ্রনাথ), 'পুণ্য কুপুর-পুষ্পমালার ব্রত' (ঘুণু : ঝরাফুল : করুণানিধানে), 'হ্যাচড়া পুজো' (সোজনবাদিয়ার ঘাট : জসীম-উদ্দিন) প্রভৃতি লোক-অনুষ্ঠানের উল্লেখ মেলে।

৩। (৫) লোকচিকিৎসা : লোকসমাজে প্রচলিত লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতিটি দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহিত। লোকচিকিৎসা মূলত লোকবিশ্বাস ও যাদুবিদ্যানির্ভর। রোগের উৎস ও তার নিরাময় পদ্ধতি—উভয় ক্ষেত্রেই এ মন্তব্য প্রযোজ্য। অবশ্য লোকচিকিৎসার দ্রব্যগুণ-ও একেবারে অস্বীকৃত হয় নি। বহু ক্ষেত্রেই গাছ-পালার শিকড়, লতাপাতা, ফল ইত্যাদির বিচিত্র প্রয়োগ লৌকিক চিকিৎসার উপাদান। একারণে লোকচিকিৎসাকে দু-ভাগে ভাগ করা চলে,—(১) বস্তু নির্ভর, (২) যাদু নির্ভর।

আলোচ্য পর্বের বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক-চিকিৎসার প্রভাব বা উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। আধুনিক চিকিৎসার দোর্দণ্ডপ্রতাপে তা নিতান্তই বিরল লভ্য।

৩। (৫) [১] বস্তু-নির্ভর চিকিৎসা : বহু বিচিত্র বস্তু সহযোগে নানা রোগের উপশম ঘটাতে লোক-চিকিৎসার সাফল্য অনস্বীকার্য। যতীন্দ্র-নাথের কবিতায় এ জাতীয় একটি লোক-চিকিৎসার তাৎপর্যময় প্রয়োগ চোখে পড়ে। নীতিমূলক এই কবিতাটিতে সই (ফোটা ফুল) 'ব্রণ'-র যন্ত্রণা উপশমের জন্য ব্রণস্থানে 'ননী সর গুলে' দেওয়ার উপদেশ দিয়েছে (ষট্‌পদাবলী : মরুশিখা)। ফুলের পক্ষে মৌমাছির 'হুল' সহনীয় হলেও

'ব্রণে'র পক্ষে তা অসহ; তাই 'ফুল' কর্তৃক এ লোকচিকিৎসা-নির্দেশ উচ্চারিত। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সকলের সব কিছু সহ্য হয় না—এই বাস্তব সত্যটি এখানে পরিস্ফুট।

৩। (৫) [২] যাদু-নির্ভর চিকিৎসা : লোকসমাজে প্রচলিত কয়েকটি চিকিৎসা-পদ্ধতি ও তার উপাদান সাধারণ ব্যাখ্যার অতীত। এগুলি রহস্যময় যাদুবিদ্যা প্রভাবিত।

কাহিনীমূলক কাব্য 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক পরিস্ফুটনে জসীমউদ্দিন এজাতীয় একটি লোক-চিকিৎসার আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে 'পীড়ের পড়া জল, / নমুর পোলার পীড়ার দিনে হয় নি তা বিফল'। মুসলমান সাধু বা ফকির 'পীরে'-র মন্ত্রপূত জলে হিন্দু 'নমুর' পোলার পীড়ার উপশম এখানে হিন্দু ও মুসল-মানের পারস্পরিক গভীর সৌহার্দ্যমূলক আদান-প্রদান-নির্ভর সম্পর্কের ইঙ্গিতবাহী।

এছাড়া যতীন্দ্রমোহনের 'মন্তুর' (অপরাজিতা) কবিতায় 'বেদে'-দের যাদুময় লোকচিকিৎসার বিচিত্র উপকরণ লভ্য। যেমন 'শেয়ালের শিঙ' 'বাদুড়ের জিভ', 'কালো নেউলের দাঁত' ইত্যাদি।

৪। অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিক লোক ঐতিহ্যের অনুস্মৃতি :

আনন্দ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও নানা বক্তব্য এবং ভাব প্রকাশার্থে লোক-সাধারণ অনেক সময়েই অঙ্গভঙ্গি-আশ্রয়ী। লোকঐতিহ্যের এই পর্যায়কে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে,—(১) লোকনৃত্য ও (২) অন্যান্য অঙ্গভঙ্গি।

৪। (১) লোকনৃত্য : লোকসমাজের অন্যতম সাংস্কৃতিক সম্পদ লোক-নৃত্য। লোকঐতিহ্যের অন্যান্য শাখা-প্রশাখাগুলির মতো লোকনৃত্য ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম-সম্পৃক্ত। তবে ধর্ম-নিরপেক্ষ লোকনৃত্যের সংখ্যাও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'র ২৪ সংখ্যক কবিতায় কৌতুকরস-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'রায়বেঁশে' নাচের উল্লেখ মেলে। সেখানে, 'শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে / আলাপ যখন উঠল জমে 'তখন বর' 'রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে / মাথায় মারল গাঁট্টা'। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো—'রায়বেঁশে' বীরভূম অঞ্চলের সুপ্রচলিত লোকনৃত্য।

কুমুদরঞ্জনের 'বাদল সর্দার' (একতারা) কবিতাটিতেও রায়বেঁশে নৃত্য পরিবেশিত --"গ্রামেতে আসে কত যুবক পালোয়ান। নাচে যে 'রায়বেঁশে' ঘুরায় লাঠিখান"।

আবার, জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের নরম উৎসবের চিত্রে 'মাঠের নিস্তেজ রোদে' নাচের উল্লেখ-ই শুধু নেই, তার ভঙ্গিটিও চিত্রিত,— 'হাতে হাত ধরে-ধরে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে ঘুরে——' (অবসরের-গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)। লক্ষণীয়, নাচের যে ভঙ্গিটি এখানে বর্ণিত তা দলবদ্ধ লোকনৃত্য-কেই স্মরণে আনে। সেদিক থেকে এ নাচের কল্পনায় সম্ভবত 'জারি' নামক লোকনৃত্যের প্রভাব বিদ্যমান।

কোনো কোনো কবিতায় ভিন্নদেশের লোকনৃত্যেরও সন্ধান মেলে। যেমন, সিংহলী লোকনৃত্য 'ক্যাণ্ডী' রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় গভীর তাৎপর্যবাহী। এ নাচের রূপকাবরণে নটরাজের প্রলয়ঙ্করী বিপুল শক্তির দিকটি প্রতিভাত,—'সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ ; / শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ / পেরিয়ে এল মুক্তি মাতাল খ্যাপা, / হুংকার তার ছুটল আকাশব্যাপা / ডালপালা সব দুড়দাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে- / নহে, নহে, নহে - / নহে বাঁধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন ফেরা, / নহে আবেগ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা , / নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন - / আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তাপের তপন'। (ক্যাণ্ডীয় নাচ ; নবজাতক ১৯৪০)। স্পষ্টতই এখানে 'ক্যাণ্ডী' নৃত্যের প্রকাশিত শক্তির উদ্দাম রূপ কবিকে বাধা-বন্ধনহীন অগ্রগতিতে উদ্দীপ্ত করেছে।

এছাড়া ইটালীয় লোকনৃত্য টারানটেলাও কবিতায় স্থানপ্রাপ্ত। সমুদ্রের তরঙ্গ-নৃত্য জীবনানন্দের বিশিষ্ট কবি চেতনায় রহস্যময় টারানটেলা নৃত্যে পরিণত ; 'মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি / নাচিতেছে টারানটেলা-রহস্যের······' (সিন্ধুসারস : মহাপৃথিবী)। প্রাচীনকালে এই ইটালীয় লোকনৃত্যটি ছিল, রহস্যময় যাদু-নির্ভর লোকচিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট। কবিতাটিতে টারানটেলা এনেছে রহস্যময়তার অপূর্ব দ্যোতনা।

৪। (২) **অন্যান্য অঙ্গভঙ্গি :** আলোচ্য কাব্য-কবিতায় কয়েকটি স্থানে লোকঐতিহ্যানুগ নানা অঙ্গভঙ্গিও প্রদর্শিত। যেমন, দেবতার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনার সুপরিচিত লোকভঙ্গিটি হলো, নাক কান ম'লা। যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী কবিমন উপলব্ধি করেছে, ভক্তির নামে ভণ্ডামিতেও জগৎ-স্রষ্টা সন্তুষ্ট হন। সেই ভক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে পরমভক্তের মুখে শুনি, 'ত্রিসন্ধ্যা জপি গায়ত্রী আর নাকে কানে দিই খৎ' (ভক্তির ভারে : মরুশিখা)। এ ছদ্ম-ভক্তির প্রতি কবির তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রবণ মনোভাবটি

'নাকে কানে খৎ'-এর প্রয়োগে স্পষ্ট প্রকাশিত। অন্যত্র, 'গলবস্ত্রে রমণী / প্রণতি করিছে রাজাসনে' (পাষাণ প্রতিমা : ঐ) এ চিত্রে বাংলার লোকসমাজের নারীদের দেবতা ও গুরুজনদের প্রণাম করার সুপরিচিত লোকভঙ্গিটি বিধৃত।

৫। ক্রীড়া-কেন্দ্রিক লোক ঐতিহ্যের অনুস্মৃতি ঃ

শরীর-চর্চা ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ বিচিত্র ক্রীড়ার সৃষ্টি করেছে। লোকসমাজেও অনুরূপ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বহু বিচিত্র ক্রীড়ার সন্ধান মেলে। অবশ্য শরীর চর্চা ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও একাধিক লোকক্রীড়া ধর্মবিশ্বাস-সম্ভূত। সামগ্রিক বিচারে লোকক্রীড়াগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়,—(১) গৃহ-আশ্রয়ী (in door) ও (২) বহির্মুখী (out door)।

নাগরিক ক্রীড়া সমূহের প্রাধান্য হেতু লোকক্রীড়ার আসর এযুগে ক্রমসংকুচিত। এ কালপর্বের কাব্য-কবিতাতেও তাই লোকক্রীড়ার ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো কোনো কবিতায় অবশ্য লোকক্রীড়ার যৎসামান্য উল্লেখ মেলে।

৫।(১) **গৃহ-আশ্রয়ী লোকক্রীড়া ঃ** গৃহের অভ্যন্তরেই এ জাতীয় লোকক্রীড়ার আসর বসে। স্ত্রী-সমাজে গৃহ-আশ্রয়ী লোকক্রীড়ার প্রাধান্য লক্ষণীয়। এ জাতীয় কোনো কোনো ক্রীড়া ছড়া-সংশ্লিষ্ট। ক্রীড়া আশ্রিত সুপরিচিত একটি ছড়ার অংশ বিশেষের বিশিষ্ট প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মেলে। 'জন্মদিনে'-র ২০ সংখ্যক কবিতায় মেঘগর্জনের ধ্বনি-চিত্র রচনা করেন কবি—'আকাশে আকাশে যেন বাজে, / আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে'। 'আগডুম-বাগডুম' গৃহাশ্রয়ী লোকক্রীড়া-সংশ্লিষ্ট একটি ছড়ার অংশ বিশেষ। মোহিতলালের 'স্বপনপসারী'র 'কিশোরী' কবিতায় বর্ণনা সূত্রে কিশোরী রাধারাণীর 'পুতুল-খেলা'র উল্লেখ লভ্য। আবার রিক্ত, আনন্দহীন গ্রাম বাংলার বর্ণনায় 'কড়ি-খেলা'র প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কবিতায় অপূর্ব করুণ মূর্ছনা সৃষ্টি করেছে। শ্রী-মণ্ডিত গ্রামবাংলা আজ বিগত-শ্রী, সেখানে 'কড়ি খেলিবার ঘর মজে গিয়ে গোখুরার / ফাটলে হারায়' (২১ সংখ্যক কবিতা : রূপসী বাংলা)। আনন্দ-অবসরের প্রতীকার্থে গৃহীত 'কড়ি খেলার ঘর' যুগের বিষন্নতায় অধুনা অবলুপ্ত হয়েছে বলে কবি অনুভব করেছেন।

৫। (২) বহির্মুখী লোকক্রীড়া : এ জাতীয় লোকক্রীড়ার আবেদন ব্যাপকতর। কারণ অধিকাংশ বহির্মুখী লোকক্রীড়ার অধিক সংখ্যক লোকসাধারণ অংশ গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক লোক-ক্রীড়া-ও দুর্লভ নয়। কোনো কোনো কবিতাতেও তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন, 'ঘুড়ি ওড়ানো' ও লাট্টু ঘোরানো'-র উল্লেখ একাধিক কবিতায় লভ্য। সেদিক থেকে যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'র 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটিতে লাট্টুর প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। লাট্টুর ঘুরপাক ও পরিশেষে তার পরিত্যক্ত অবস্থার চিত্রে কবি মানব জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। সেখানে লাট্টুর ঘূর্ণনের সজীব চিত্রটি স্মরণযোগ্য,—'বন্-বন্-বন্ ঘুর-ঘুর-পাক চিতেন কেতেন সোজা ; / লাট্টু বলিছে, "হায়-হায়-হায়! ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা। / জীবন যে আসে ফুরায়ে," ----। শুধু তাই নয়, জীবনের উপযোগিতা নিঃশেষ হলে তা যেমন মূল্যহীন হয়ে পড়ে, তেমনি খেলা শেষে ছেলেরা 'ফাটা-লাট্টুটা ছুঁড়ে' ফেলে দিল দূরে কণ্টক বনে'।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় কৈশোরের বর্ণনায় লাটিমের ঘূর্ণন চোখে পড়ে,—'লাটিম যখন পড়ে চিতেন হয়ে / কেমন করে সুতোর ফাঁসে তুলবে তার হাতে' (রাখাল : বন্ধুর দান)। আবার অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বিশ্বজগতের চক্রাবর্তনের গূঢ় সত্য লাট্টুর ঘূর্ণনে প্রতীকী রূপ লাভ করেছে। তাঁর মনে হয়েছে, 'বন্-বন্ ঘুরছে বিশ্বের লাট্টু' (উদ্ভট : মাটির দেয়াল)।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় 'ফড়িং' পরীর ছেলেদের 'বিনিসুতোয়' ওড়ানো 'ঘুড়িতে রূপান্তরিত,—'পরীর ছেলের বিনিসুতে যবে ওড়ায় ফড়িং ঘুড়ি' (কৃষ্ণকেলি : ফুলের ফসল)। এ কল্পনায় কবির রোমান্টিক রূপদর্শিতা অনুভব করা যায়।

'ডাংগুলি' বাংলার লোকসমাজে পরিচিত একটি লোকক্রীড়া। কিন্তু পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সুকান্তর কবিতায় 'ডাংগুলি' বিশিষ্টার্থে গৃহীত। নিরস্ত্র পরাধীন ভারতবাসীর উপর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির নিষ্ঠুর অত্যাচারের ব্যঞ্জনাধর্মী বর্ণনায় দেখি, ডাংগুলি খেলা নয়, গুলির সঙ্গে খেলা, / রক্তে রাঙানো পথে দুপাশে ছেলের মেলা" (আজব লড়াই : মিঠে কড়া)।

'কানামাছি খেলা' কখনো জীবনে বিভ্রান্ত হওয়ার ইঙ্গিতবাহী রূপে ব্যবহৃত ; 'দুখবাদী বন্ধুর প্রতি' যতীন্দ্রমোহনের প্রশ্ন, 'চোখ থেকে তবু মধু ছেড়ে কেঁদে ঘুরে না কি কানামাছি' (দুখবাদী বন্ধুর প্রতি : মহাভারতী)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কানামাছি' খেলায় একজনের চোখ বাঁধা থাকে। এখানে দুঃখবাদী বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর জগত ও জীবন সম্পর্কে পক্ষপাত-মূলক দৃষ্টির প্রতি যতীন্দ্রমোহনের কটাক্ষবাণী উচ্চারিত। শ্রম-কেন্দ্রিক লোকক্রীড়া, নৌ-বাইচের উল্লেখও কবিতায় মেলে। অবশ্য ছন্দের খাতিরে বাইচ 'বাচ'-এ পরিণত,—'ছেলের দল তালের ডোঙায় কেউ বা খেলে বা'চ, / কেউ বা শুধু সাঁতার কাটে, কেউ বা ধরে মাছ। (কাজলা দীঘি : পাঞ্চজন্য : যতীন্দ্রমোহন)। এছাড়া জসীমউদ্দিনের 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' কাব্যে 'মহরম' উপলক্ষে লাঠি খেলার বর্ণনাও পাওয়া যায়।

৬। শিল্পবস্তু-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি :

দৈনন্দিন কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যেও লোকসাধারণ জীবনের নানা ক্ষেত্রে শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াসী। কখনো নিত্য প্রয়োজনীয় কখনো বা বস্তুগত প্রয়োজন-নিরপেক্ষ বস্তুকে অবলম্বন করে তার এ প্রয়াস সুপরিস্ফুট। শিল্পবস্তু-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের এই পর্যায়ে এ মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রয়োজনগত বিচারে লোকসমাজ-সৃষ্ট শিল্পবস্তুগুলি দু'ভাগে বিভক্ত--(১) নিত্য প্রয়োজনীয়, (২) মনোরঞ্জনী।

৬। (১) নিত্যপ্রয়োজনীয় : দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য শিল্পবস্তুর উল্লেখ আলোচ্য কাব্য-কবিতায় প্রায় বিরলদৃষ্ট হলেও অলক্ষিত থাকে নি। যেমন, 'ময়ূর পঙ্খী' 'নৌকা', 'নকশী কাঁথা' ইত্যাদি।

ময়ূরের দেহের বিশেষ অংশের সাদৃশ্যে নির্মিত সম্মুখভাগ বিশিষ্ট নৌকা 'ময়ূর পঙ্খী' নামে সুপরিচিত। বিমলচন্দ্র ঘোষের 'দ্বিপ্রহর' কবিতায় তা প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে সুখসমৃদ্ধের প্রতীকে পরিণত। রূপকথার রূপকে সমকালের বিগত-শ্রী মূর্তিটি এ কবিতায় বিধৃত,—'দূর সমুদ্রে ময়ূর পঙ্খী ভাসিয়া গেছে / মনে নেই কবে, পড়ে আছে শুধু শূন্য খেয়া / রাজার দুলাল চ'লে গেছে একা রাত্রি কাঁদে / সোনোকুশী মাঠে জনা-রণ্যের কাঁপিছে ছায়া'। 'ময়ূর পঙ্খী'-র সাক্ষাৎ কুমুদরঞ্জনের 'এক-তারা'র 'রাধানাথ' কবিতাতেও লভ্য।

'নকশী কাঁথা' বাংলার লোকসমাজের উল্লেখযোগ্য 'শিল্পসম্পদ'। পল্লীর রমণীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিল্প-মনস্কতাও 'নকশী কাঁথা'য় প্রতিভাত। জসীমউদ্দিনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্য নামে এ শিল্পবস্তুটির প্রভাব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,

জসীমউদ্দিন 'নকশী কাঁথা'—বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এছাড়া কাব্য মধ্যেও একাধিক স্থানে নকশী কাঁথার বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন কাব্যের নায়িকা বিরহিনী সাজু একস্থানে কাঁথায় নিজ জীবনের চিত্র বুনে তৃপ্তি লাভের প্রয়াসী।

(৬) [২] **মনোরঞ্জনী :** নামকরণেই এ পর্যায়ের শিল্পবস্তুগুলির চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। উদাহরণ-স্বরূপ, মাটির পুতুল, ফুলদানি, শোলার পাখি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যের 'ভিতরে ও বাহিরে' কবিতাটিতে 'পুতুলে'র প্রয়োগ তাৎপর্যমণ্ডিত। কবিতাটিতে দেখি, 'জগৎ-মায়ের অন্তঃপুরে'র বাসিন্দা খোকার জগতটি রঙীন স্বপ্ন-কল্পনাময়। সে এক অসম্ভবের রাজ্য, যেখানে সমস্ত কিছুই মহা মূল্যবান। কিন্তু 'জগৎ-পিতার বিদ্যালয়ে' বাস্তবের একচ্ছত্র আধিপত্য। সেখানে শিশুর স্বপ্ন-কল্পনার পথ অবরুদ্ধ। বস্তুগত প্রয়োজনের নিরিখে সেখানে যাবতীয় বস্তু ও বিষয়ের মূল্যায়ন, তাই 'ভাঙা পুতুল গড়ায় ভুঁয়ে / সকাল বেলা, / যেন তারা কেবল শুধু / মাটির ঢেলা'। এ নিষ্ঠুর সত্য কিন্তু শিশু-মন বিশ্বাস করে না। রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার পারস্পরিক দ্বন্দ্বচিত্র পরিস্ফুটনে 'ভাঙা পুতুলে'-র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রসঙ্গত, করুণানিধানের 'রেণু' ('ঝরাফুল') কবিতায় রথের মেলার 'শোলার পাখি'-টি স্মরণযোগ্য।

৭। লিখন বা অঙ্কন-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অনুস্মৃতি :

লোকসাধারণের শিল্প চেতনার অপূর্ব প্রকাশ লোকঐতিহ্যের এ পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রেই এ প্রকাশ যাদুসমন্বিত। বিশ শতকের আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতায় লিখন বা অঙ্কন-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের প্রভাব প্রতিফলন আদৌ সুবিস্তৃত নয়।

'আলপনা' বাংলার লোকসমাজের নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। স্ত্রী-সমাজ অঙ্কিত এই 'আলপনা'র চিত্র-বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। আলপনা-অঙ্কনে লোকসমাজের ধর্ম বিশ্বাসও ক্রিয়াশীল।

আলোচ্য কাব্য-কবিতার নানা স্থানে 'আলপনা'র উল্লেখ থাকলেও প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের বিচারে রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যাগত' (মহুয়া) কবিতাটি স্মরণযোগ্য। এ কবিতায় কবি অন্তরে তাঁর অন্তরতম জীবন দেবতার

প্রত্যাবর্তন অনুভব করেছেন। এত দিন কবি কেমন করে তাঁর জীবন দেবতার পুনরাগমনের প্রত্যাশায় কাল যাপন করেছেন তার বর্ণনায় পাই, ...'প্রতিদিন মোর দেহলিতে। আঁকিয়াছি আলিপনা, / প্রতি সন্ধ্যা বরণ ডালিতে / গন্ধ তৈলে জ্বালায়েছি দীপ'। 'আলিপনা' এখানে আবাহনের ইঙ্গিতবাহী।

জসীমউদ্দিনের কাব্যে কন্যাদানের বর্ণনায় 'লতা ফুল আঁকা আম-কাঠালের পিঁড়ি'-ও (সোজন বাদিয়ার ঘাট) উল্লিখিত পিঁড়িতে আঁকা 'লতাফুল' বিশেষ বিশেষ 'মোটিফ'। তবে এ কবিতায় এদের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই।

'উল্কি' হ'লো অঙ্গচিত্র বিশেষ। বিশ্বের নানা স্থানে আদিম কাল থেকেই উল্কি পরার প্রচলন আছে। বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম ও যাদুবিদ্যার অমোঘ প্রভাবযুক্ত 'উল্কি' অঙ্কনে লোকসাধারণের সৌন্দর্য-মনস্কতার দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়।

কখনো মরুভূমির 'সফেদ বালি'র বুকে বেদুঈন-দের তাঁবু কবি-কল্পনায় 'উল্কির দাগ'-এ পরিণত,-'শাদা হাতে যেন উল্কির দাগ' (বেদুঈন : স্বপন পসারী : মোহিতলাল)। 'শাদা হাত', 'সফেদ বালি'র এবং উল্কির দাগ প্রকৃতপক্ষে তাঁবুর উপমান রূপে গৃহীত। এ কল্পনায় মোহিতলালের অপূর্ব রূপ দক্ষতা অনস্বীকার্য।

অন্যত্র, এই 'উল্কি' আবার শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিশেষ ইঙ্গিতময়। নবযুগ আনয়নে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বান,-'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ? / কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে, / লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা-' (সকলের গান : পদাতিক)। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কবি বৃহত্তর বিপ্লবের ক্ষেত্রে জনসাধারণের পারস্পরিক যোগাযোগের গুরুত্ব অনুভব করে 'লাল উল্কি'-কে সংগ্রামের গোপন সংকেতে রূপান্তরিত করেছেন।

উপসংহার ঃ

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিফলন বিশ্লেষণে দেখা গেল, এ যুগের বাংলা কাব্য-কবিতাও বহুক্ষেত্রে লোকঐতিহ্যের প্রভাব-পরিপুষ্ট। লক্ষণীয়, কবিদের লোকঐতিহ্য-চর্চা ও প্রীতি, গ্রামবাস ইত্যাদি বিশেষ কয়েকটি সূত্র ছাড়াও সুদীর্ঘ উত্তরাধিকার

সূত্রেও এ কালপর্বের একাধিক কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব প্রতিফলিত। কবিদের লোকঐতিহ্যাশ্রয় অনেক ক্ষেত্রেই সহজাত বলে মনে হয়। এইসব বিচার বিশ্লেষণে লোকঐতিহ্যের অন্তর্গত বাক্-কেন্দ্রিক সৃষ্টির অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, লোকবিশ্বাস, লোক সংস্কার ও যাদু শক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাবও সুপরিস্ফুট। উল্লেখযোগ্য, আর্থ সামাজিক কাঠামোটি উপলব্ধি করে কবিরা সমগ্র সমাজ ও বৃহত্তর জনগণের কথা ভেবেছেন; অধিকাংশ সময়েই তাঁদের এ ভাবনা কাব্য-কবিতার লোকঐতিহ্যাশ্রিত। সুতরাং বলা যায়, কবিদের সামগ্রিক সমাজ দৃষ্টিই আলোচ্য কালপর্বের কাব্য-কবিতায় লোকজীবনচর্যার প্রভাব-প্রতিফলনের অন্যতম প্রধান কারণ।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

মানব-সমাজের বিকাশের ধারা পর্যালোচনায় দেখা যাবে, লোক-সমাজের আধারেই নগর-সমাজের উদ্ভব। উৎপাদনী শক্তির ক্রমবিকাশ আদিম মানবসমাজে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, নগর-সমাজের উদ্ভব তারই ক্রমপরিণতি। নগর-সমাজের উন্মেষ-পর্বে তাই লোকসমাজের সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগ পর্যন্ত সে সম্পর্কের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি ছিল অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। আধুনিক যুগে তা ক্রমেই প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠলো। বিভিন্ন ও বিচিত্র কারণে লোকসমাজের সঙ্গে নগর সমাজের ব্যবধান হ'লো দূরতর।

উনিশ শতকের বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার সংস্পর্শে ও রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আর অর্থনৈতিক কারণে লোকসমাজের সঙ্গে নগর-সমাজের সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান লক্ষ করা যায়। কিন্তু লোকজীবনের সঙ্গে নগর-জীবনের সম্পর্ক বিশ্বের কোনো দেশে কোনো কালেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। আর্থ-সামাজিক কারণেই লোকসমাজের সঙ্গে নগরজীবনের অপরিহার্য যোগ আজও বিশ্বের সর্বত্রই লক্ষণীয়। বাস্তব জীবনের নানা ক্ষেত্রে তো বটেই, নগর-সমাজের অভ্যন্তরেও লোকজীবন-চর্যার প্রভাব-প্রতিফলন আজও অব্যাহত।

বাংলার নগর-সমাজ সম্পর্কেও এ সত্য প্রযোজ্য। কালের বিবর্তনকে অস্বীকার না করেও বাংলার নগরজীবন লোকঐতিহ্যের দ্বারা নানাভাবে পুষ্ট, সমৃদ্ধ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত। নগর-সমাজ-সৃষ্ট সাহিত্যও লোকঐতিহ্যের প্রভাব-নিরপেক্ষ থাকে নি। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ-কাঠামোর ভিন্নতার কারণেই আধুনিক যুগের তুলনায় সে যুগের সাহিত্যে লোকজীবন-চর্যার আধিপত্য ব্যাপকতর।

উনিশ শতকে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলার শিক্ষিত মহলে এক বিপুল আলোড়ন দেখা যায়। এ সময় শিক্ষার ক্রমপ্রসার, বৃহত্তর বিশ্ব-সভ্যতার সঙ্গে যোগ ও স্বাদেশিকতা-বোধের উদ্বোধন ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির অভিঘাত একদিকে এদেশের তরুণ শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করে, অন্যদিকে দেশের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে। দেশের অতীত

ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। শুরু হয় দেশীয় ঐতিহ্যের নতুন মূল্য নির্ধারণ। স্বভাবতই লোকঐতিহ্যের প্রতিও শিক্ষিত-সমাজের একাংশের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেও লোক-ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হয়। কাব্য-কবিতা যার ব্যতিক্রম নয়।

বিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতার ধারাতেও এ লোকঐতিহ্য-প্রীতি অব্যাহত। ছড়া, প্রবাদ, রূপকথা প্রভৃতি বাক-কেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের অন্তরে সুদীর্ঘকালের অলিখিত ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন রূপ ও ভাব প্রকাশের অমিত শক্তি উনিশ শতকেই অনুভূত হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতার প্রেরণায় বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কাব্য-কবিতাতেও লোকঐতিহ্যের নানাবিধ উপাদান-উপকরণ গৃহীত হয়।

বাংলা কাব্য-কবিতার সুসমৃদ্ধ ভাণ্ডারে রোমান্টিককতার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য অনস্বীকার্য। আলোচ্য রোমান্টিক কালপর্বের কবিরা অনেক সময়ই রোমান্টিক আবহ রচনায় লোকঐতিহ্যের শরণস্থ হয়েছেন। বাংলার লোকায়ত জীবন অবলম্বনে রোমান্টিক অতীতচারিতাও এসব কাব্য-কবিতায় দেখা যায়।

বিশ শতকে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এলো এক বিপুল পরিবর্তন। বিশ্ব-যুদ্ধের নগ্ন, হিংস্র, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে প্রচলিত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দেখা দিল, নিদারুণ বিপর্যয়। এছাড়া অভূতপূর্ব বহুবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মার্কসীয় দর্শনের উদ্ভব ও কোনো কোনো দেশে তার সাফল্য সমগ্র বিশ্বের মানবসমাজে এক নতুন যুগের সূচনা করল। এ প্রসঙ্গে সমকালীন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও দেশে দেশে দুর্ভিক্ষ-ও উল্লেখযোগ্য।

এ সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিটিও আবর্তসঙ্কুল। একদিকে গান্ধীজীর অহিংসবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটিত; সাম্যবাদী রাজনীতি ও দর্শনও এযুগে ক্রমপ্রসারিত। এসব কারণে দেশের বৃহত্তর জনসমাজ আলোড়িত, আন্দোলিত। স্বভাবতই এই সমস্ত আন্দোলনে লোকসাধারণ এক বৃহৎ শক্তিরূপে প্রতিভাত হ'ল। দেশের যে কোনো বৃহত্তর আন্দোলনে তাদের অপরিসীম গুরুত্ব অনুভূত হল। 'সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে / ওরা কাজ করে'—শ্রমজীবী মানুষজন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির যাথাযথ্য আলোচ্য কালপর্বের অধিকাংশ কবিই অনুভব করলেন। এ সূত্রেও এ যুগের কাব্য-কবিতার নানা স্থানে লোকঐতিহ্যানুস্মৃতি লক্ষণীয়।

আবার মার্কসীয় দর্শনে উদ্‌বুদ্ধ বিশ শতকের প্রথম ভাগে আবির্ভূত কোনো কোনো কবি শ্রেণীহীন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ নিলেন। তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলেন। এদের কবিতায় লোকজীবনচর্যার নানাবিধ উপাদান-উপকরণ গৃহীত হ'ল।

বিপর্যস্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমিকায় পাশ্চাত্যে নবোদ্‌ভূত কাব্যাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ বিভিন্ন কাব্যান্দোলনের প্রভাব বিশ শতকের তৃতীয় দশকে আবির্ভূত কবিদের কবিতায় অনস্বীকার্য। এরই ফলে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকঐতিহ্যও এঁদের কাব্য-কবিতায় নবতর মাত্রা-যোজনায় ব্যবহৃত। শুধু তাই নয়, সমকালীন বিশ্বে মানুষের নিরাশ্বাস স্থিতিবোধহীন জীবন-যাপন ও তার বিমূর্ত বিচ্ছিন্নতাবোধকে কাব্য-রূপদানে এই সব কবিরা বহুস্থানে লোক-জীবনের শরণস্থ হয়েছেন। বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে আবির্ভূত কবিদের কাব্য-চর্চায়ও এ প্রভাব সঞ্চারিত।

যন্ত্রসভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব আধুনিক যুগজীবনকে যান্ত্রিক করে তুলেছে। এ যুগের কবিরা সেই যান্ত্রিক অবরুদ্ধ জীবন থেকে তাই কখনো কখনো কাব্য কবিতায় সহজসরল লোকজীবনের আশ্রয়-পিয়াসী।

আলোচ্য কবিরা বহু ক্ষেত্রে লোকঐতিহ্যাশ্রয়ে কাব্যরসসৃষ্টিতে সার্থক হয়েছেন। কিন্তু কবিতায় লোকঐতিহ্যের সর্বস্তরের উপাদান-উপকরণে ব্যবহার তাঁরা কেউই করেন নি। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিরল ব্যতিক্রম। সুদীর্ঘকালব্যাপী তাঁর কাব্যচর্চায় লোকঐতিহ্যের সমস্ত শাখার উপাদান-উপকরণই লভ্য। অবশ্য লোকঐতিহ্য-সহায়তায় কবিতায় নবতর মাত্রা যোজনায় যতীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দের কৃতিত্বও কম নয়।

লোকঐতিহ্য চিরচলিষ্ণু। সাহিত্যে তার প্রভাব-প্রতিফলনও যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কাব্য কবিতাতেও তাই লোকঐতিহ্যের প্রভাব-প্রেরণা অব্যাহত। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কবির রচনাতেই শুধু নয়, পরবর্তীকালের কবিদের কাব্য-বিশ্লেষণেও এর সমর্থন মিলবে। এ প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের কবিতা স্মরণযোগ্য।

বলা বাহুল্য, কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের কাব্য-কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রভাব-সূত্রও পরিবর্তিত।

পরিশিষ্ট

বিশ শতকের প্রথম ভাগের আলোচিত কবি ও কাব্যের তালিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)

'শিশু' (১৯০৩), 'খেয়া' (১৯০৬), 'কথা ও কাহিনী' (১৯০৮), 'স্মরণ' (১৯১৪), 'উৎসর্গ' (ঐ), 'বলাকা' (১৯১৬), 'পলাতকা' (১৯১৮), 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২), 'পূরবী' (১৯২৫), 'মহুয়া' (১৯২৯), 'বনবাণী' (১৯৩১), 'পরিশেষ' (১৯৩২), 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩), 'বীথিকা' (১৯৩৫), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৬) 'শ্যামলী' (১৯৩৬), 'খাপছাড়া' (১৯৩৭), 'ছড়ার ছবি' (ঐ), 'প্রান্তিক' (ঐ), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'প্রহাসিনী' (ঐ), 'আকাশ প্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (ঐ), 'সানাই' (ঐ), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪২), 'ছড়া' (ঐ), 'শেষলেখা' (ঐ)।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭–১৯৫৫)

'বঙ্গমঙ্গল' (১৯০১), 'প্রসাদী' (১৯০৪), 'ঝরাফুল' (১৯১১), 'শান্তিজল' (১৯১৩), 'ধানদূর্বা' (১৯২০), 'রবীন্দ্র আরতি' (১৯৩৭)।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮–১৯৪৮)

'লেখা' (১৯০৬), 'রেখা' (১৯১০), 'অপরাজিতা' (১৯১৩), 'নাগকেশর' (১৯১৭), 'বন্ধুর দান' (১৯১৮), 'জাগরণী' (১৯২২), 'নীহারিকা' (১৯২৭), 'মহাভারতী' (১৯২৮), 'পাঞ্চজন্য' (১৯৪১)।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২–১৯২২)

'সবিতা' (১৯০০), 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'হোমশিখা' (১৯০৭), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'মণি-মঞ্জুষা' (১৯১৫), 'অভ্র আবীর' (১৯১৬), 'হসন্তিকা' (১৯১৭)।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২)

'দেবেন্দ্র মঙ্গল' (১৯১২), 'স্বপন পসারী' (১৯২১), 'বিস্মরণী' (১৯২৬), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত গোধুলি' (১৯৪১)।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০)

'শতদল' (১৯০৬), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'উজানি' (ঐ), 'একতারা' (১৯১৪), 'বীথি' (১৯১৬), 'বনমল্লিকা' (১৯১৯), 'নূপুর' (১৯২১), 'রজনীগন্ধা' (১৯২২), 'অজয়' (১৯২৭), 'তূণীর' (১৯২৮), 'চূণকালি' (১৯৩০), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮)।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)

'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০), 'সায়ম' (১৯৪১), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮), 'নিশান্তিকা' (১৯৫২)।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'দোলন চাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (ঐ), 'প্রলয় শিখা' (ঐ), 'ছায়ানট' (ঐ), 'পূবের হাওয়া' (১৯২৫), 'সাম্যবাদী' (ঐ), 'চিত্তনামা' (ঐ), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'সিন্ধু-হিন্দোল' (ঐ), 'ঝিঙে ফুল' (১৯২৮), 'সাত ভাই চম্পা' (ঐ), 'জিঞ্জীর' (ঐ), 'চক্রবাক' (১৯২৯), 'সন্ধ্যা' (ঐ), 'নতুন চাঁদ' (১৯৪৫), 'মরুভাস্কর' (১৯৫০)।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

'ঝরাপালক' (১৯২৮), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৯)।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৮)

'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'দূরযানী' (১৯৪৪)।

জসীমউদ্দিন (১৯০৪–১৯৭৬)

'নকসী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯), 'রাখালী' (১৯৩৩), 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' (১৯৪১), 'রঙিলা নায়ের মাঝি' (১৯৪৭), 'এক পয়সার বাঁশি' (১৯৪৮)।

বিষ্ণু দে (১৯০৯–১৯৮৩)

'চোরাবালি' (১৯৩৭), 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' (১৯৪১), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৪), 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭), 'পূর্ব লেখ', 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০)।

বিমল চন্দ্র ঘোষ (১৯১০–১৯৮২)

'দক্ষিণায়ন' (১৯৪১), 'উলুখড়' (১৯৪৩), 'দ্বিপ্রহর' ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪৬)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯–   )

'পদাতিক' (১৯৪০), 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'চিরকুট' (১৯৪৯)।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬–১৯৪৭)

'ঘুম নেই' (১৯৪৮), 'ছাড়পত্র' (১৯৪৯), 'মিঠেকড়া' (১৯৫১), 'পূর্বাভাস' (১৯৫৫)।